অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

"তুমি এ রকম ঢিমে তেতালা বাজালে চলবে না। তীব্র বৈরাগ্য দরকার। পনেরো মাসে এক বৎসর করলে কি হয়? তোমার ভিতরে যেন জোর নেই। শক্তি নেই। চিড়ের ফলার, আঁট নেই, ভ্যাদ-ভ্যাদ করছে। উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো। এ জন্মে না হোক পর জন্মে পাব—ও কি কথা? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নেই। তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব, এখনই পাব—মনে এই রকম জোর রাখতে হয় বিশ্বাস রাখতে হয়। ও দেশে চাষীরা সব গরু কিনতে গিয়ে গরুর ল্যাজে আগে হাত দেয়। কতকগুলো গরু আছে, ল্যাজে হাত দিলে কিছু বলে না, গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে—অমনি তারা বোঝে সেগুলো ভালো নয়। আর যে গুলোর ল্যাজে হাত দেওয়া মাত্র তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে, অমনি বোঝে এইগুলো খুব কাজ দেবে। সেই-গুলোর ভিতর থেকে পছন্দ করে নেয়। ম্যাদাটে ভাব ভালো নয়। জোর নিয়ে এসে বিশ্বাস করে বলো, তাঁকে পাবই পাব, এখনই পাব—তবে তো হবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম প্রকাশ
৬ই ফাল্গুন ১৩৬৩
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
ছবি ও প্রচ্ছদপট মুদ্রক
গসেন এণ্ড কোম্পানি
৭।১ গ্র্যাণ্ট লেন
কাগজ সরবরাহক
রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সনস্ লিঃ
৩২এ ব্রেবোর্ন রোড
ব্লক
রূপমুদ্রা লিমিটেড
৪ নিউ বউবাজার লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট

সুলভ সংস্করণ পাঁচটাকা
শোভন সংস্করণ সাতটাকা

॥ ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ॥

তুমি কি সুন্দর, আর, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

মাত্র এইটুকু তো বিষয়। তা নিয়েই জগৎসংসার তোলপাড়। তা নিয়েই যত সাহিত্য কাব্য ধর্ম আর দর্শন। এত কথা বলা হল তবু কিছুই বলা হল না। কত কালে কত দেশে আরো কত কথা বলা হবে, তবু ঘুরে-ফিরে সেই এক কথাই বলা : তুমি কি সুন্দর, আর, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার সৌন্দর্যও ফুরোয় না আমার আনন্দও ফুরোয় না।

ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বিজ্ঞানের জয় হোক। যেন শেষ পর্যন্ত মানুষ বলতে পারে ঈশ্বরই মহত্তম বিজ্ঞান। উদ্ভিদবিদ্যায় পারঙ্গত হয়ে সমস্ত তত্ত্বতথ্য বিশ্লেষণ করার শেষে যেন বলতে পারি, ফুল, তুমি সুন্দর, আর, তোমার গন্ধে আমি আনন্দিত। আমার চোখে তুমি সুন্দর এ আমি বোঝাই কি করে? আর, এত সব বস্তুনিষ্ঠার পরেও কি জানতে পারলাম কোথায় লুকোনো তোমার গন্ধটুকু?

ঈশ্বর আমাদের ফাউ, সমস্ত বাঁধাবরাদ্দের উপর উপরি-পাওনা। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কি তার উপরি-পাওনা ছাড়ে? কলকাতায় এলে গড়ের মাঠটা কোন না একবার দেখে যায়। ময়রার দোকানে জিলিপি খাচ্ছ তো খাও, রাজভোগটাও আস্বাদ করো। তোমার সমস্ত জৈব রোমাঞ্চের ঊর্ধ্বে এ আরেক রোমাঞ্চ। এ কে ছেড়ে যাবে? আমরা তো ছাড়তে আসিনি, ঠকতে আসিনি। ষোলো আনা পাওনা-গণ্ডা আদায় করে নেব।

ঈশ্বরকে ডাকলে কি হয়? মাথায় শিঙ বেরোয় না লেজ গজায়? কিছু হয় না। বুকটা মাঠ হয়ে যায়। অনুভূতির ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হয়। নিখিলের প্রতি অপার প্রেমে অপার করুণায় প্রসারিত হতে পারি।

যাকে বলো মানবতাবাদ তাই ঈশ্বরত্ব।

রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ও উপনিষৎ থেকে অনেক কাহিনী এই বইয়ে তুলে ধরেছি ঈশ্বরপ্রসঙ্গকে রমণীয় করবার জন্যে। কিন্তু এ আমি কার স্তবরচনা করব, কার ব্যাখ্যাবর্ণনা? এ আর কিছু নয়, নিজের বাকশুদ্ধি, লেখনশুদ্ধি, মননশুদ্ধির

আয়োজন। এক দুই গুনে কি আর অন্ত পাব? তাই রূপে গুণে রসে প্রেমে শুধু মধুরের আরতি করে যাই।

"এক দুই গনইতে অন্ত নাহি পাই,
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই॥"

অচিন্ত্যকুমার

৪র্থ খণ্ড

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
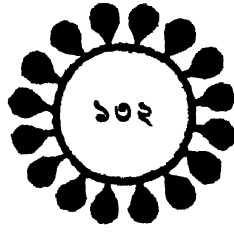
'যে অসুখ হয়েছে, কারু সঙ্গে কথা কওয়া চলবে না।' মুখ গম্ভীর করে বললে ডাক্তার সরকার। তার পর মুখে একটু হাসি টানলে : 'তবে আমি যখন আসব কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবেন।'

শুনতে মধুময় লাগে। কথা তো নতুন নয়, বলাটি নতুন। সেই একের কথাই অনেক ভাবে বলা। একটুও লাগে না একঘেয়ে।

আপনিও এ-সব কথা শোনেন? আপনি তো ঘোরতর বৈজ্ঞানিক। যুক্তিবাদী। বাস্তবপন্থী।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের এম-ডি, নাম-ডাক-ওয়ালা ডাক্তার, হঠাৎ হোমিয়োপ্যাথির দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু যার মধ্যে সত্য আছে একবার বুঝেছে তাকে শত অসুবিধে সত্ত্বেও ছাড়তে কখনো রাজী নয়। শুধু অসুবিধে? দস্তুরমত উৎপীড়ন। তার সহযোগী য়্যালোপ্যাথ ডাক্তারেরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। নানা উপায়ে লাগল তার বিরুদ্ধতা করতে। দুর্নাম রটাতে। কিন্তু দমবার পাত্র নয় সরকার।

মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভা হচ্ছে। বক্তা মহেন্দ্র সরকার। মুক্তকণ্ঠে হ্যানিম্যানের গুণকীর্তন করছে। সহগামী ডাক্তাররা তো সব হতভম্ব। বিজ্ঞানের মান-ইজ্জৎ সব যে ধূলিসাৎ করে দিল। অসম্ভব! বক্তৃতা বন্ধ করো। বিজ্ঞানের অপমান সইতে পারব না আমরা। ও নিজে না বন্ধ করে, মুখ চেপে ধরো কেউ।

'চুপ করো।' গর্জে উঠল য়্যালোপ্যাথের দল। 'নইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব হল্ থেকে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সভার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার সরকার। দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে বললে, 'যদি কেউ বার করে দিতে চায় তো দিক কিন্তু আমি আমার সত্যকে প্রকাশ করে যাব।'

সত্যকে প্রকাশ করে যাব। যা বুঝেছি যা জেনেছি তা বলতে পেছপা হব না। শুধু বলে যাব না, করে যাব। দেখিয়ে যাব। নিজেও প্রকাশিত হব।

কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে এত মজা কিসের?

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আপনি যে এখানে তিন-চার ঘণ্টা ধরে রয়েছেন। এ কেমন কথা! আর রুগী নেই আপনার? তাদের চিকিৎসা করতে হবে না?'

'আর ডাক্তারি আর রুগী!' গভীর নিশ্বাস ফেলল সরকার। 'যে পরমহংস হয়েছে আমার সব গেল!'

সকলে হেসে উঠল।
আমার সব গেল! দাঁড় গেল, দড়া গেল, হাল গেল, পাল গেল, এবার ভেসে পড়লাম নদীতে।
ঠাকুর বললেন, 'এ নদীর নাম কর্মনাশা। এ নদীতে ডুব দিলে মহা বিপদ। কর্মনাশ হয়ে যায়। সে ব্যক্তি আর কোনো কর্ম করতে পারে না।'
তবে ডাক্তার কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? শুধু কারণ-পরম্পরাই দেখে না, জগৎকারণ-কেও খোঁজ করে? প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের বাইরে আছে কি কোনো অপ্রমেয়? ঘটনা-পুঞ্জের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোনো মূল শক্তি?
শিবনাথের বন্ধু বিয়ে করেছে এক বিধবাকে। বউটির ভারি অসুখ। সংস্থান নেই যে ভালো চিকিৎসা করে। ওহে শিবনাথ, একটা কিছু সুরাহা হয়?
দীনতারণ বিদ্যাসাগর। শিবনাথের হাতে চিঠি দিল সরকারকে, যদি দয়া করে দেখ একবার বিনা পয়সায়। আদর্শ পালনের জন্যে লাঞ্ছিত হচ্ছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে-যুঝে নিয়েছে শেষ রোগশয্যা।
একবার নয় বার-বার যেতে লাগল সরকার। কিন্তু কই, ভালো হচ্ছে কই মেয়েটি? রোজ সকাল-বিকাল শিবনাথ আসছে ডাক্তারের কাছে। রুগীর অবস্থা বলছে, ব্যবস্থা নিচ্ছে। চলো আরেক বার দেখি। আরেক বার ওষুধ পালটাই। কিন্তু কই, এত চেষ্টা, এত আয়াস, সুফল ফলছে কই? হায়, সে সুফলবৃক্ষের নাম কি?
বউটির মৃত্যুর একদিন আগে শিবনাথ গিয়েছে ডাক্তারের কাছে। রাত প্রায় দশটা। অবস্থা খারাপ, তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে পড়েছে। নতুন একটা কিছু অষুধ দিন। বড্ড ছটফট করছে।
দেব। কিন্তু অষুধের জন্যে শিশি এনেছ?
শিশি আনতে ভুলে গিয়েছে শিবনাথ। কোনো দিন ভুল হয় না, কি সর্বনাশ, আজই এই সঙিন মুহূর্তে এমন একটা ভুল হয়ে গেল?
ডাক্তার নিজের বাড়িতে খোঁজ করলে। কিন্তু যেমনটি দরকার পাওয়া গেল না একটাও। শিবনাথ ছুটে বেরিয়ে গেল। কোনো ডাক্তারখানা থেকে যদি কিনতে পায়! রাত অনেক হল। তা হোক। শিশি একটা যোগাড় হবে না?
শিশি নিয়ে ফিরল যখন শিবনাথ, অনেক-অনেক মূল্যবান সময় অপব্যয় হয়ে গেছে। ডাক্তার ক্লান্ত সুরে বললে, 'এরই জন্যে মনে হচ্ছে বউটি বাঁচবার নয়। যদি বাঁচবার হত, তোমার শিশি আনতে ভুল হয় কেন? আর আমার ঘরেই বা পাওয়া যায় না কেন একটা?'
'কিন্তু এই তো এনেছি যোগাড় করে।'
'যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত দামী সেখানে এতটা সময় অনর্থক নষ্টই বা হয় কেন? কোন ওজরে? শিবনাথ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পারলুম না বাঁচাতে!'
ম্লান হয়ে গেল শিবনাথ। বললে, 'আপনিও যদি এই কথা বলেন আমরা যাই কোথায়?'
ডাক্তার চমকে উঠল। 'কেন, কি বললুম আমি?'

'আপনি ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক। আপনিও যদি ভাগ্য বা নিয়তির উপর নির্ভর করে থাকেন তাহলে আমাদের উপায় কি?'

'অনেক দিন ধরে ডাক্তারি করছি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেল। কিন্তু প্রতিনিয়তই এই সত্যটাকেই উপলব্ধি করছি, আরেকটা কোনো শক্তি সমস্ত প্রাণিজীবনকে চালনা করছে। যতই ওষুধ-বিষুধ দিই ছুরি-কাঁচি চালাই আমরা কিছু নয়, শুধু ঢিল ছুঁড়ছি অন্ধকারে। যার মৃত্যু নিশ্চিত কোন ডাক্তার তাকে রক্ষা করে?'

'তাহলে ডাক্তারি ছেড়ে দিন।' ঝাঁঝিয়ে উঠল শিবনাথ। 'সবাইকে বলুন ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকে শান্ত হয়ে।'

'তা কেন? অন্ধকারে আছি বলেই তো বেশি করে হাতড়াতে হবে, বেশি করে আঁকড়াতে হবে। ফলাফল থাক আরেকজনের হাতে, তবু আমরা বীর, আমরা লড়াই করে যাব। সত্য খুঁজতে-খুঁজতে ধরে ফেলব সেই সত্যস্বরূপকে।'

ঠাকুর বললেন অনুনয় করে, 'এই অসুখটা ভালো করে দাও। তাঁর নামগুণ গান করতে পাই না।'

নারদ বললেন, আহা, তোমরা কী সুনির্মল, যেহেতু হরিনাম কীর্তনে তোমাদের অনুরাগ। আগে তিমিরহনন করেই সূর্যের উদয় তেমনি তোমাদের মনের অন্ধকার নাশ করে নামতপন তোমাদের রসনার আকাশে উদিত হয়েছেন।

যদি অন্তর্বাহিকে সমুজ্জ্বল করতে চাও তবে তোমার জিহ্বারূপদ্বারে রামনামমণি-রূপ দীপ স্থাপন করো। বায়ুর সাধ্য নেই সে দীপকে বাধা দেয়, সে দীপকে নেবায়। বায়ু মানে সংসারঝটিকা।

প্রহ্লাদ বললে, হে নৃসিংহ, যে সকল সাধু আনন্দান্বিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম গান করছে তারাই সর্বজীবের অকৈতব বন্ধু। নিরুপাধিক বান্ধব।

মন্ত্রে-তন্ত্রে কত স্খলন-পতন ঘটছে। মন্ত্রে স্বরভ্রংশ হচ্ছে, উচ্চারণে ভুল হচ্ছে। তন্ত্রে হচ্ছে আচারভ্রংশ, নিয়মের ব্যতিক্রম। সমস্ত ছিদ্র ও ন্যূনতা নামকীর্তনই পূরণ-মোচন করে। ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব কিছুই পড়ে দরকার নেই তোমার, তুমি শুধু হরিনাম করো। সর্বার্থসাধক সর্বতীর্থাধিক হরিনাম।

আর বিষ্ণুদূতেরা বললে যমদূতদের, 'হে কৃতান্তকিঙ্করগণ! এই অজামিল কোটি-কোটি পাপ করেছিল বটে কিন্তু যে মুহূর্তে হরিনাম উচ্চারণ করেছে তখন আর সে পাপী নয়। হরিনামই পরম স্বস্ত্যয়ন। পরম মোক্ষপ্রদ।'

কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ এই অজামিল। দাসীসংসর্গে কুলভ্রষ্ট হয়েছে। হেন পাপ নেই যে করেনি। ধর্মপত্নীকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। দাসীগর্ভে অনেকগুলি পুত্র হয়েছে; কোন খেয়ালে কে জানে, সর্বকনিষ্ঠের নাম রেখেছে নারায়ণ। বড় ভালোবাসে ছেলেটাকে। নাওয়ায়-খাওয়ায়, কোলে-পিঠে করে খেলা দেয়। ছেলের অস্ফুট মধুর কণ্ঠ নকল করে নারায়ণ-নারায়ণ বলে ডাকে।

বুড়ো বয়সে অজামিলকে কাল গ্রাস করতে এসেছে। বাচিক মানসিক ও কায়িক—তিন রকম পাপেই পাপী ছিল বলে তিন-তিনটে যমদূত এসে হাজির। ঊর্ধ্বরোম বক্রানন বিকটমূর্তি পুরুষ তিনজন। পাশ দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে, ভীতত্রস্ত হয়ে

অজামিল তাকাতে লাগল চারদিকে। অদূরে খেলছিল নারায়ণ, তারই নাম ধরে ডেকে উঠল অজামিল। নারায়ণ, নারায়ণ!

আর যায় কোথা! চোখের পলকে চারজন বিষ্ণুদূত এসে উপস্থিত। চতুরক্ষর নারায়ণ, তাই বিষ্ণুদূত চারজন। এসেই হাঁক দিল, 'কোথায় নিয়ে যাও একে? যদি বাঁচবার ইচ্ছে থাকে, ছেড়ে দাও অজামিলকে। পথ দেখ।'

'কে তোমরা?' হুমকে উঠল যমদূতেরা। 'ধর্মরাজের শাসনে বাধা দাও, কী স্পর্ধা তোমাদের? তোমরা দেখতে তো মনোহর, অভিনববয়স, চতুর্ভুজ। পদ্মপলাশনেত্র, কিরীটকুণ্ডলধারী। তোমাদের আকৃতি দেখে তো সুশীল-শিষ্ট বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু এ তোমাদের কি দৌরাত্ম্য? দুরাচার পাপীকে যমালয়ে নিয়ে যেতে দেবে না? তোমরা কে? কার লোক? তোমাদের তো কই দেখিনি।'

দণ্ড্যাদণ্ড্য জ্ঞান নেই কারা এই হীনমতি? বিষ্ণুদূতেরা বললে, 'যদি তোমরা ধর্ম-রাজের আজ্ঞাবহ, ধর্মের স্বরূপ ও প্রমাণ কি তা আমাদের বলো।'

'যা বেদবিহিত তাই ধর্ম। যা বেদনিষিদ্ধ তাই অধর্ম। জানো এই পাপাত্মাকে?' যম-দূতেরা নির্দেশ করল অজামিলকে। 'পরিণীতা পবিত্রা ভার্যাকে এ ত্যাগ করেছে। পিতামাতাকে ত্যাগ করেছে। দাসীর প্রতি কামাসক্ত হয়েছে। চিরজীবন উল্লঙ্ঘন করেছে শাস্ত্রবিধি। অধর্মার্জিত অর্থে পোষণ করেছে পরিবার। আত্মকৃত পাপের নিষ্কৃতির জন্যে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করেনি। তাই একে দণ্ডপাণির কাছে নিয়ে যেতে এসেছি। সেই ধর্মাধিকরণে জীব দণ্ড দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়।'

'অহো কি দুঃখ! ধর্মদর্শীদের সমাজে প্রবেশ করেছে অধর্ম।' বিষ্ণুদূতেরা বললে, 'অজামিল শত-শত পাপ করেছে সত্য কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করেনি এ সত্য নয়।'

'নয়?'

'না। অন্তিম কালে, হোক তা বিবশ অবস্থা, পরমস্বস্তিপ্রদ শ্রীহরির নাম করেছে। ব্রতযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত পাপের ক্ষয় করে মাত্র, কিন্তু শ্রীহরির নাম পাপ প্রবৃত্তির মূল উৎপাটন করে। তার চেয়েও আরো বেশি করে। অন্তরে শ্রীহরির গুণরাশি উপলব্ধি করিয়ে দেয়। যেমনি অজামিল মৃত্যুকালে প্লুতস্বরে শ্রীহরির নাম নিয়েছে, বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে সমস্ত পাপ। সুতরাং একে ছাড়ো, ওকে আর নিয়ে যেতে পারবে না যমালয়ে।'

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকঃ পাতকী জনঃ॥"

পাপহরণ বিষয়ে হরিনামের যত শক্তি আছে, পাতকীজনের সাধ্য নেই সে পরিমাণ পাপ করে।

"একবার হরিনাম যত পাপ হরে,
পাপীদের সাধ্য নাই তত পাপ করে।"

যমদূতেরা ছেড়ে দিল অজামিলকে। মৃত্যুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলে। পূর্ব-দুষ্কৃত

স্মরণ করে ঘোর অনুতাপ হল অজামিলের। আমাকে শত ধিক, কি দুষ্পরাজেয় পাপই না আমি করেছি! কিন্তু কি আশ্চর্য, পাপবদ্ধ অবস্থায় যেই নারায়ণকে ডাকলাম শোভনদর্শন দেবদূতেরা এসে আমাকে মুক্ত করে দিল। কোথায় গেল তারা, আর কি তাদের দেখতে পাব না? এবার থেকে যতচিত্তেন্দ্রিয় হয়ে থাকব। অবিদ্যা-বন্ধন ছিন্ন করে আত্মবান ও সর্বপ্রাণীর সুহৃদ হব। অহং মম বোধ আর রাখব না মিথ্যাপদার্থে। ভগবানের কীর্তন দ্বারা দেহ-মন বিশুদ্ধ করে অর্পিতচিত্ত হব, সমাহিত হব। ইন্দ্রিয়দের বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করে মন যুক্ত করব আত্মায়, শ্রীহরির পাদপদ্মে।

বিষ্ণুদূতেরা দেখা দিল আবার। এবার স্বর্ণবিমান নিয়ে এসেছে। অজামিলকে তুলে নিয়ে গেল শ্রীপতির সুখধামে।

'জপ করা মানে নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা।' সেদিন ঠাকুর বলছিলেন দেবেনকে। 'একমনে নাম করতে-করতে, জপ করতে-করতে তাঁর দেখা মেলে। শেকলে-বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডোবানো আছে, আরেক দিক তীরে বাঁধা। শিকলের একেকটি পাব ধরে-ধরে এগিয়ে গিয়ে শেষে ডুব মেরে শিকল ধরে-ধরে যেতে-যেতে পৌঁছুনো যায় কড়িকাঠে। তেমনি জপ করতে-করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।'

আসল কথা হচ্ছে, ডোবো।

> 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন!
> তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবি রে প্রেমরত্ন ধন।'

তাই সরবে নাম করতে পারছেন না বলে ঠাকুরের দুঃখ। ওগো অসুখটি ভালো করে দাও।

'নাম করতে না পারলে কি হয়?' বললে ডাক্তার, 'ধ্যান করলেই হল।'

'সে কি কথা!' ঠাকুর আপত্তি করলেন। 'আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে কখনো ঝালে কখনো অম্বলে কখনো ভাজায়। আমার কখনো পূজা, কখনো জপ, কখনো ধ্যান, কখনো নামগুণগান। কখনো বা নৃত্য।'

'আমিও একঘেয়ে নই।' বললে ডাক্তার।

আমার অনন্ত পথের অদ্বিতীয় যে বন্ধু তিনিও তো বহুবিচিত্র।

কিন্তু এ আমার কি হল? রাত তিনটে থেকে ঘুম নেই, শুধু পরমহংসের ভাবনা। সকালে উঠেও সেই পরমহংস। বলছে মাস্টারকে, 'তোমরা জানো না, আমার য়্যাকচুয়েল লস্ হচ্ছে। রোজ দু-তিনটে কল-এ যাওয়াই হচ্ছে না। তারপর নিজেই রুগীদের বাড়ি যাই। আপনি গেলে আর ফি নেই। বলো, আপনি গিয়ে কি ফি নেওয়া যায়?'
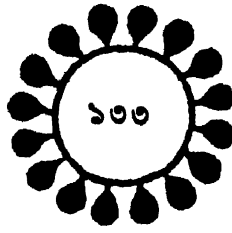
ডাক্তার তো জুটেছে কিন্তু সেবা করবার লোক কোথায়?

কেন, আমরা আছি। ভক্তের দল এগিয়ে এল। দিনের পর দিন রাত জাগব। যখন যা করবার তাই করব প্রাণ ঢেলে। বুকের রক্ত দিতে হয় তাতেও পেছপা নই।

কিন্তু রুগীর পথ্য তৈরি করবে কে? কে তাতে মেশাবে তার মমতার কোমলতা? অনুরাগের স্বাদগন্ধ? আরোগ্য প্রার্থনার মাধুর্য?

'ও গোপাল, ভালো করে খাও। ছোলা দিয়ে শাক ভাজা হয়েছে, ওটি আগে মুখে দাও।' দক্ষিণেশ্বরে অঘোরমণি কত দিন এসে খাইয়েছে ঠাকুরকে। 'বড়ি দিয়ে ঝোল আরেকটু দেবে?'

'কে রেঁধেছে বলো তো?' ঠাকুর জিগগেস করেন খেতে-খেতে।

'স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধেছেন।'

কে লক্ষ্মী যেন চেনেন না ঠাকুর।

'বৌমা গো বৌমা।'

'সবই যদি বৌমার রান্না, তুমি তবে খাওয়াবে কবে?'

'কার সঙ্গে কার তুলনা।' অঘোরমণি বিহ্বল গলায় বললে, 'আমার বৌমার হাত-ধোয়ানি জলেই অমৃততুল্য রান্না হয়।'

কে এই অঘোরমণি? বলরাম বোসের বাড়িতে একদিন বলছেন ঠাকুর : 'কামারহাটির বামনি কত কি দেখে! গঙ্গার ধারে একলাটি এক বাগানে নির্জন ঘরে থাকে আর জপ করে। গোপালের কাছে শোয়।' বলতে-বলতে চমকে উঠছেন : 'কল্পনা নয়, সাক্ষাৎ। দেখলে গোপালের হাত রাঙা। সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ায়, মাই খায়, কথা কয়। নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে।'

আমার গোপাল ধন-দৌলত চায় না, ভোগ-বিলাস চায় না, সামান্য একটু ক্ষীর-সর পেলেই সে খুশি। বড়জোর মাথার একটা বালিশ। কটা নেহাত জংলি ফুল।

অসুখ শুনে একটি ভক্ত-মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছেন শরৎ মহারাজ। কামারহাটির বাগানে একা-একা থাকেন, একটু গিয়ে তাঁর দেখাশোনা করো। তার পর শুনতে পাচ্ছি সে বাড়িতে নাকি নানারকম শব্দ, ছাদের উপর, দরজা-জানলায়। রুগ্ন একা মানুষ, ভয় না পান শেষকালে!

সাহসিকা মেয়ে পিছু হটল না। কিন্তু তাকে দেখে আপত্তি করল অঘোরমণি। 'এখানে কেন এলি? ভীষণ কষ্ট পাবি যে। আমার ভয়ই বা কি, ভাবনাই বা কি।

আমার তো গোপালই আছে। শোন বাপু, এখানে যখন এসেছিস, এখানে কিন্তু নানান রকম আছে। শব্দ-টব্দ শুনলেই কিন্তু জপে বসে যাবি, আসন ছাড়বিনে—'
জপ আর আসন। একটু নিষ্ঠা আর অভিনিবেশ। একটি সঙ্কল্প আর উন্মুখতা।
বাগবাজার বৃন্দাবন পালের গলি থেকে দুটি মেয়ে এসেছে অঘোরমণির কাছ থেকে দীক্ষা নিতে।
ওরে আর লোক পেলিনে? আমার কাছ থেকে দীক্ষা?
স্বামীজী এলেন এগিয়ে। বললেন, 'তা জানি না। ওদেরকে তোমার কাছে উৎসর্গ করে দিচ্ছি। তুমি গোপালের মা।'
'বাবা, আমি কাঙাল ফকির—কিছুই জানি না। আমি কি দেব? বউমা—বউমাও তো নেই এখন এখানে। তবে কী হবে?'
'তুমি কি যে-সে?' বললেন স্বামীজী, 'তুমি জপে সিদ্ধ। তুমি পারবে না তো কে পারবে? বলি, কিছু না পারো তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে দাও। তোমার তো সব হয়ে গেছে। তোমার আর ও মন্ত্রে কি দরকার।'
তথাস্তু। মেয়ে দুটির কানে নাম দিয়ে দিল অঘোরমণি।
এবার তবে গুরুদক্ষিণা দাও।
ষোলো আনা পূর্ণ করে দুটি টাকা দিতে গেল মেয়ে দুটি। গোপালের মা বলে উঠল, 'ওগো মনপ্রাণ যে দেবার কথা।' শেষে বলল গম্ভীর হয়ে, 'শোনো, নাম নেওয়া হেলা-ফেলার জিনিস নয়। অন্তত দশ হাজার জপের পর আসন ছাড়বে। হলেও বেরুবে না, মলেও বেরুবে না।' মানে সংসারে কেউ জন্মালো বা মরলো খেয়াল করবে না। নাম করে যাবে।
এই দেখ না গোলাপ-মাকে। ওর পুজো-আচ্চা নেই। সটান বসে গেল জপের আসনে। আর কে ওকে টলায়। কে আর ওকে সরায় ওর আনন্দকেন্দ্র থেকে।
পবিত্রতাই আসন। আর ব্যাকুলতাই নাম।
ঠাকুর বললেন, 'নামের মাহাত্ম্য খুব আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাকলে কিছু হবার নয়। ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হওয়া চাই। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু মন রয়েছে কামকাঞ্চনে তাতে কিছু হবে না। তাই নাম করো, সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন অনুরাগ হয়, যেন দেহসুখ মানযশের প্রতি টান কমে যায়।'
ছোট্ট ঘরটি গঙ্গার জলে ধুয়ে-মুছে খটখটে করে রাখে অঘোরমণি। নিজের হাতে-পায়ে খাটা-খাটনি করে। একটি সিকেতে মুড়ি বাতাসা নারকেল নাড়ু রাখে, কখন গোপালের খিদে পাবে কে জানে! ডালাকুলো, শিল-নোড়া কোন জিনিসটা না লাগে শুনি। দাঁত মাজবার গুল, খাবার পর দুটি মশলা, জোয়ান বা ধনের চাল, ছেঁচা একটু পান পেলে খাই গোপালকে ভোগ দিয়ে। শরৎ মহারাজকে লক্ষ্য করে বলে উঠল একদিন : 'বলি হ্যাঁ শরৎ, লোকে বলে সংসার ত্যাগ করব! তারা কি পাগল? এই শরীরটাই তো একটা প্রকাণ্ড সংসার। বঁটি কাটারি হাতা-খুন্তি, মেথি পাতা কালো জিরে, কি না হলে চলে বলো দেখি? সব গোপালের সংসার।'.

অসুখে ভুগছে, নিজের শরীরের দিকে ইঙ্গিত করে বলছে, 'গোপাল বড় কষ্ট পাচ্ছে।'

সারাদিনই এই গোপালের সঙ্গে স্নেহালাপ, কখনো বা শাসন গর্জন। ছেলে অন্ধকার থাকতেই গঙ্গায় নেমে হুলস্থূল শুরু করেছে। উঠে আয় উঠে আয় বলছি—শাসনের সুরে চেঁচাচ্ছে অঘোরমণি। রাত পোহায়নি এখনো, কেউ এখন জলে নামে? অবাধ্য ছেলে কথা না শুনলে মা তখন আর করে কি। কাঁদতে বসে। ওরে লক্ষ্মীধন আমার, উঠে আয়। কাক কোকিল ডাকুক, চারদিক ফরসা হোক, তখন নাইয়ে দেব। ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপাই ঝুড়লে যে তোর অসুখ করবে।

এক-একদিন ভাত ঢাকা পড়ে থাকে, খেতে বসে না অঘোরমণি। বিকেল হয়ে আসে, তবুও না। সে কি, গোপালের আজ কি হল? বেলা পড়ে গেল, খাবে না, খিদে পায়নি? কোথায় দুষ্টুমি করছে কে জানে, অঘোরমণি বলে উদাসীনের মত। এ কি খেয়াল, একি দুরন্তপনা। আপনি আসনে বসে তাকে একবার ডাকুন। বলে সেই সেবিকা মেয়ে। খেলা ভুলে ছুটে আসবে দুষ্টু গোপাল।

আসনে বসল অঘোরমণি। চোখ বুজল। বললে, গোপাল বলছে আজ আর সে নিজের হাতে খাবে না, তাকে খাইয়ে দিতে হবে।

গরাস পাকিয়ে-পাকিয়ে অঘোরমণিকে খাইয়ে দিল সেবিকা।

তেমনি কে আমাকে খাইয়ে দেবে?

ভক্তরা ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করল, শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে আসি এখানে।

'কিন্তু সে কি এখানে এসে থাকতে পারবে?' প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

পুরুষদের বাসা, চারদিকে পুরুষের ভিড়, সেখানে সেই লজ্জাপটাবৃতা বাস করতে পারবে সর্বক্ষণ?

সেই নহবতখানায় রাত তিনটের সময় ওঠেন। স্নান সেরে নেন। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে জপে বসেন। সেদিন হয়েছে কি, যথারীতি উঠেছেন শেষ রাত্রে। সঙ্গে গৌরী-মাকে নিয়েছেন। কখনো মেয়ে, কখনো সঙ্গী, কখনো পরিহাসসরসা সখী। জলের কাছে সিঁড়িতে কালো মতন ঢিপি মতন কি-একটা পড়ে আছে তার উপরে মা পা রেখেছেন অলক্ষ্যে। পা রেখেই চমকে উঠেছেন, ভয় পেয়ে উঠে পড়েছেন দু সিঁড়ি। তাঁকে জড়িয়ে ধরল গৌরীমা। কি, কি হল?

'কুমীর গো!'

'কে বললে কুমীর?' গৌরীমা বললে রঙ্গ করে, 'ও শিব। তোমার চরণ পরশ পাবার জন্যে শব হয়ে পড়ে আছে।'

'রাখ তোর রঙ্গ। আমি বলে ভয়ে মরি। কি সর্বনাশ, একেবারে কুমীরের উপর গিয়ে পড়েছিলুম।'

'তোমার আবার ভয় কি। তুমি অভয়া—তুমি শুভাবহা, অমিয়ময়ী লাবণ্য প্রতিমা।'

'তাঁকে গিয়ে সব বলো।' ভক্তদের বললেন ঠাকুর। 'সব কথা জেনে-শুনে সব দিক বুঝে-সুঝে সে যদি আসতে চায় তো আসুক।'

আসতে চায় তো আসুক। অন্তরের অনুচ্চারিত সুরটুকু ঠিক শুনলেন শ্রীমা। মনে

আছে, পানিহাটির উৎসবে শ্রীমা যাবেন কিনা ঠাকুরের সঙ্গে একটি ভক্ত-মেয়ে জিগগেস করতে এসেছিল ঠাকুরকে, আর ঠাকুর বলেছিলেন, ওর ইচ্ছে হয় তো চলুক। যাননি শ্রীমা। বুঝেছিলেন, যদিও যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, ঠাকুরের সমর্থনের স্পর্শটুকু যেন এসে লাগছে না ঠিক-ঠিক। যেন অশ্রুত একটি সুর বলছে তাঁর কানে-কানে, কি হবে গিয়ে ঐ ভিড়ের মধ্যে, চাই না যে তুমি যাও, তুমি যেয়ো না। কিন্তু এবার? এবারও ভিড়, ভক্ত পুরুষদের অবিরাম আনাগোনা। এবারও আসবেন কি না-আসবেন শ্রীমা'র উপরেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু সেই না-শোনা সুরটি কী বলছে তাঁর কানে-কানে? বলছে, তুমি এস, তুমি এস। হে কষ্টহারিণী, হে আরোগ্যদাত্রী, তুমি এস আমার রোগশয্যার শিয়রে।

চলে এলেন মা।

ঠাকুর বললেন, 'ও খুব বুদ্ধিমতী।'

যখন যাননি পানিহাটিতে তখনো। যখন চলে এলেন শ্যামপুকুরে তখনো।

তুমি বুদ্ধি ও বিদ্যা। তুমি উজ্জ্বলতা ও নির্মলতা। তুমি অম্লানলক্ষ্মী। পীযূষবাদিনী।

সেই একটি মেয়ে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। তুমি অসাধ্যসাধক আমার একটি উপকার করো। ঠাকুর তাকালেন চোখ তুলে। আমার স্বামীকে অলক্ষ্মীতে ধরেছে, তাকে যাতে বশে আনতে পারি তাই করে দাও।

'মা গো, এ বিদ্যে আমার জানা নেই। ঐখানে যে সাধুমায়ী থাকেন তাঁর কাছে যাও।' ঠাকুর নহবতখানার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'তিনি ইচ্ছে করলেই দুঃখ দূর করতে পারেন তোমার।'

ঠাকুর বলেছেন, আর কি। মেয়েটি গিয়ে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে।'

কী হয়েছে?

মেয়েটি বললে যা বলবার। আপনিই বুঝবেন নারীর প্রাণের কঠিন যন্ত্রণা। শুধু বিচ্ছেদের কষ্ট নয়, অপমানের কষ্ট। আপনিই এর বিহিত করুন। ত্রাণ করুন আমাকে। আমার স্বামীকে।

'আমি সামান্য নারী, আমি কি জানি।' বললেন শ্রীমা ।

ছলনা কোরো না মা, ঠাকুর বলে দিলেন তুমিই সর্বব্যথাপ্রশমনী। সংসারদাবদাহে তুমি অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারা। নইলে কি ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন তোমার দুয়ারে। তুমি পদ্মদলায়তলোচনা দয়াঘনা, মা হয়ে তুমি যদি মেয়ের মুখের দিকে না চাইবে তো কোথায় যাব? কোন দুয়ারে মাথা ঠুকব?

'তোমায় যিনি পাঠিয়েছেন তুমি তাঁর কাছেই ফিরে যাও।' বললেন শ্রীমা, 'দৈবশক্তি তাঁরই করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছামাত্রই সব মঙ্গল হয়। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো।'

মেয়েটি আবার এসে দাঁড়াল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'সাধুমায়ী ফিরিয়ে দিলেন

আমাকে। বললেন যা ওষুধবিষুধ সব তোমার হাতে। তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই পারেন না। তুমি ইচ্ছে করলেই সব করে দিতে পারো। যে হারিয়ে গেছে তাকে আনতে পারো ফিরিয়ে।'
মৃদু-মৃদু হাসলেন ঠাকুর। চাপাগলায় বললেন, 'শোনো, সাধুমায়ী ভারি চাপা। কাউকে সহজে ধরা দিতে চান না। তুমি তাঁর কাছে গিয়েই শরণাগত হও। তাঁকে সামান্য ভেবো না, তিনি সকলের চাইতে বড়।'
মূঢ় চোখে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।
'আমি যা বলছি ঠিকই বলছি। তুমি তাঁকে গিয়েই ধরো। তাঁর কৃপা হলেই আশা পূর্ণ হবে তোমার! দুঃখের রাত ভোর হবে।'
একবার এখানে আরেকবার ওখানে। এ কেমনতরো কথা। তার মানে আমি হত-ভাগিনী, কোথাও আমার ঠাঁই নেই। যার ঠাঁই নেই সে যাবে কোন দুয়ারে।
আর কোন দুয়ারে! যার কেউ নেই তারও যে একজন আছে তার কাছে।
তার কাছেই গেল শেষ পর্যন্ত। বললে, 'মা আমায় ফিরিয়ে দিও না। ঠাকুর কি কখনো ভুল বলতে পারেন? তিনি বললেন, তুমি তাঁর চেয়েও বড়। ফাঁকি দিও না মা। তুমি দয়া করলেই মনের সাধটি মিটে যায়।'
মেয়ের কান্নার কাছে হেরে গেলেন মা। প্রসাদী ফুল-বেলপাতা দিলেন তাকে। বললেন, 'এ নির্মাল্যে সমস্ত কিছু নির্মল হোক। তুমি শান্তি পাও।'
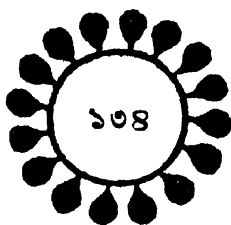
'মশায়, কি হলে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়?' একজন ভক্ত জিগগেস করল ঠাকুরকে।
'মন সব কুড়িয়ে এনে জড়ো করো এক জায়গায়, এক লক্ষ্যে।' বললেন ঠাকুর, 'শুকদেবের কথা আছে, পথে যাচ্ছে যেন সঙিন চড়ানো। আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, শুধু ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এরই নাম যোগ।'
মনের প্রত্যক্ষের বিষয় ঈশ্বর।
'কিন্তু সে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের।' বললেন ঠাকুর।
শুদ্ধ মন কাকে বলে?
যে মনে বিষয়াসক্তির লেশমাত্র নেই। নেই কামকাঞ্চনের কুয়াশা।

'প্রত্যক্ষ করতে হলে দূরবীণ চাই।' বললে মাস্টার। 'ঐ দূরবীণের নামই যোগ।'
'কর্মযোগ আর মনোযোগ। যোগ মোটামুটি এই দুই রকম।' বললেন ঠাকুর, 'তুমি চাষ করবার জন্যে নালা কেটে খেতে জল আনছ কিন্তু আলের গর্ত দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। নালা কেটে জল আনা তবে বৃথা। সব শ্রম পণ্ডশ্রম।'
নালা কেটে জল আনাটি কর্মযোগ আর আলের গর্ত দিয়ে জল যাতে না বেরিয়ে যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখাটি মনোযোগ।
'চিত্তশুদ্ধি হলে বিষয়াসক্তি গেলেই ব্যাকুলতা আসবে। তোমার অন্তরের প্রার্থনা পৌঁছুবে ঈশ্বরের কাছে। টেলিগ্রাফের তারে অন্য জিনিস মিশেল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের খবর পৌঁছুবে না।'
যোগ কি? চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। নদীর এক দিকে চর পড়লে অন্য দিকে ভাঙন ধরে। বিষয়-বাসনার স্রোত রুদ্ধ হলেই অমৃতবাসনার স্রোত বাড়তে থাকে। সংসারাভিমুখিতা রুদ্ধ হলেই দেখা দেবে ঈশ্বরাভিমুখিতা। বাহ্যগতি রুদ্ধ হলেই শুরু হবে অন্তর্গতি। তেমনি নিরোধ হলেই যোগ।
আরশুলাকে নিজ বিবরে নিয়ে গিয়ে তাকে মৃদু-মৃদু দংশন করে ভ্রমর, মৃদু-মৃদু গুঞ্জরব শোনায়। ভ্রমরের ভয়ে আরশুলা সারাক্ষণ ভ্রমরের ধ্যান করে। ধ্যান করতে-করতে তার চিত্তবৃত্তি ভ্রমরাকারে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। তৎস্বরূপত্ব পেয়ে বসে। তেমনি যোগীরাও নিরুদ্ধাবস্থায় এসে ব্রহ্মে লীন হয়। ঐ লয়ই যোগ।
'তুমি কে? কি চাও?' একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।
উজ্জ্বল ও আকুলতাভরা দুটি চোখ তুলে ছেলেটি বললে, 'আমার যোগসাধন করবার ইচ্ছে হয়েছে। আপনি আমাকে শেখাবেন?'
সানন্দ বিস্ময়ে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমি এখানকার খবর পেলে কোথায়? তোমার নাম কি? কোত্থেকে আসছ?'
আমার নাম কালীপ্রসাদ। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির মাস্টার রসিকলাল চন্দ্রের আমি দ্বিতীয় ছেলে। আহিরীটোলার নিমু গোস্বামীর লেনে আমাদের বাড়ি। স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। এলবার্ট হলে হিন্দুধর্মের সভা হচ্ছে। সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতা দিচ্ছেন শশধর তর্কচূড়ামণি। বক্তৃতার বিষয় হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। কদিন ধরেই হচ্ছে। রোজ শুনছি। সাংখ্যদর্শনের পর শুরু হল পতঞ্জলির যোগসূত্র। শুনছি আর মন মেতে উঠছে। সাধ হয়েছে যোগাভ্যাস করব। জলখাবারের পয়সা জমিয়ে একখানা যোগসূত্র কিনলাম। কিবা সংস্কৃত জানি, কতটুকু বা বুঝি ওর অর্থ-মর্ম। তাই একদিন সাহস করে গেলাম চূড়ামণি মশায়ের বাড়ি। আমাকে পাতঞ্জলদর্শন পড়াবেন? চূড়ামণি মশায় তো অবাক। বললেন, বাবা, আমার সময় কোথায়? তুমি কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে যাও। বোলো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। গেলাম বেদান্তবাগীশের বাড়ি। বেদান্তবাগীশ বললেন, স্নানের আগে চাকর যখন আমার গায়ে তেল মাখাবে তখন যদি উপস্থিত থাকতে পারো একটু-আধটু শেখাতে পারি মুখে-মুখে। তাই সই। সকালে রোজ তাঁর তেল মাখার সময়

গিয়ে হাজির হই। মুখে-মুখে মোটামুটি জেনে নিই। যোগসূত্রের পর শিবসংহিতা। যত পড়ি ততই মন ব্যাকুল হয়। কিন্তু সব শাস্ত্রেই ঐ এক কথা, যোগসিদ্ধ গুরু না পেলে একা-একা সাধন করতে গেলেই সর্বনাশ। তখন মন বড় দমে যায়, পড়াশোনা বিস্বাদ লাগে। কোথায় পাব সেই যোগগুরু? বাগবাজারের যজ্ঞেশ্বর আমার বন্ধু। তাকে বললাম আমার মনের যন্ত্রণা। সে বললে, দক্ষিণেশ্বরে যাও। সেইখানেই মিলবে এক মহাযোগী।

তন্ময়ের মত শুনছেন ঠাকুর।

দক্ষিণেশ্বর কোথায়, তাই কি আমি জানি? বাড়ির সবাইকে জিগগেস করলুম, কেউ হদিস দিতে পারলেন না। যজ্ঞেশ্বরেরও ঠিকানা জানা নেই যে সেখানে গিয়ে খোঁজ করব। যা থাকে অদৃষ্টে, বেরিয়ে পড়লুম, যেমন গিরিগুহ থেকে নির্ঝরিণী বেরোয়। উত্তরে কোথাও হবে আচমকা একটা আন্দাজ করে চিৎপুরের খাল পেরোলুম। কিসের টানে এগিয়েই চলেছি, সকাল প্রায় দুপুরে গড়িয়ে পড়ল। পথচারী একজনকে হঠাৎ জিগগেস করলুম, দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারো? সে কি কথা! রাজ্যের পথ এগিয়ে এসেছেন যে, ফিরে যান। আবার ফিরে চললুম। ঘুরতে-ঘুরতে পেলুম ঠিক দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম আপনি কলকাতায় গিয়েছেন, এ বেলা আর ফিরবেন না।

তখন কি আর করি, আপনারই ঘরের উত্তরের বারান্দায় বসে পড়লুম হতাশ হয়ে। হাঁটতে-হাঁটতে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেছে, পকেটে একটি আধলাও নেই, বাড়ির লোকদের না বলে-কয়ে এসেছি, তারা না জানি কত উতলা হয়েছে এই সব ভেবে দেহ মন নেতিয়ে পড়ল। এমন সময় দেখি, কে একটি ছেলে ছাতা-হাতে আসছে এদিকে। আপনজনের মত একেবারে আমার পাশে এসে বসল, নাম শুনলুম শশিভূষণ। এস দুজনে মিলে গঙ্গাস্নান করি, কালীবাড়ির কর্মচারীদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাদের বলে কিছু প্রসাদ সংগ্রহ করি দুজনে, তার পর স্থির হয়ে বসে একমনে শুধু ঠাকুরের কথা কই।

ক্রমে-ক্রমে সন্ধ্যে হল, বেজে উঠল আরতির বাজনা। আরতির পর রামলাল-দাদা শীতলভোগের প্রসাদ এনে দিলেন। প্রসাদ পেয়ে দু বন্ধু শুয়ে পড়লুম বারান্দায়। রাত প্রায় নটা, ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ হল। ঐ আসছেন ঐ এসেছেন ঠাকুর।

কালী, কালী, কালী—গাঢ়গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করতে-করতে ঠাকুর ঢুকলেন তাঁর ঘরটিতে উত্তরের বারান্দা পেরিয়ে। পিছনে গামছা আর বটুয়া হাতে লাটু। শশী গিয়ে বললে কালীপ্রসাদের কথা। ডাকো ডাকো, তাকে দেখিনি কখনো। রামলালকে দিয়ে ডাকিয়ে আনলেন। গড় হয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই জিগগেস করলেন, 'তুমি কে?'

নবাগত তরুণ সুদীপ্ত চোখে বললে, 'আমি কালীপ্রসাদ।'

উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ।

'কি চাই তোমার?'

নির্ভীক অথচ আকুলকণ্ঠে বললে কালীপ্রসাদ, 'আপনার কাছে যোগ শিখতে চাই।'
আশ্চর্য, একবাক্যে রাজী হয়ে গেলেন ঠাকুর। সকলেই তো ভোগ চায়, যোগ চায় কজন! কে চায় প্রশান্তবাহিতা স্থিতি, কে চায় সুধা-পণ্য!
বললেন, 'তোমার এই কাঁচ বয়েস, তোমার যোগশিক্ষার ইচ্ছে হয়েছে এ তো খুব ভালো লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে প্রকাণ্ড যোগী ছিলে, একটুখানি এখনো বাকি আছে, এই তোমার শেষ জন্ম। দেব আমি তোমাকে যোগশিক্ষা। আজ রাত যাক, কাল ভোরবেলা এস।'
রাত কি আর কাটে। বারে-বারে উঠে বসে কালীপ্রসাদ, কতক্ষণে না জানি নব প্রভাতের অরুণরঞ্জন দেখা দেবে। ঠিক সময়ে রামলালকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন ঠাকুর। নিয়ে গেলেন উত্তরের বারান্দায়। একখানি তক্তপোশ পাতা ছিল, বললেন, 'বসো, যোগাসন করে বসো।' বসল কালীপ্রসাদ।
জিভ দেখি। কালীপ্রসাদ জিভ বের করল। ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে ঠাকুর তার জিভে মূলমন্ত্র লিখে দিলেন। নিচে থেকে উপরে হাত বুলিয়ে দিলেন বুকে, ঊর্ধ্ব দিকে তুলে দিলেন শক্তি। বললেন, তুমি যাঁর প্রসাদ সেই মা-কালীর ধ্যান করো।
মুহূর্তে কাষ্ঠবৎ সমাহিত হয়ে গেল কালীপ্রসাদ।
নিষ্কল নির্মল নিরাময় শান্ত ও সর্বাতীত। বর্ণমালা অভ্যাস করেই সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্তে আনা যায়, তেমনি যোগাভ্যাস করেই পাওয়া যায় তত্ত্বজ্ঞান। বিচ্ছিন্ন বর্ণ কোনো পদবিন্যাস করতে পারে না, কিন্তু একত্র গ্রথিত করলেই কেমন বাক্য-পদ-ছন্দের আকৃতি ধরে। তেমনি সমস্ত শক্তিকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে একটি কেন্দ্রে সংলগ্ন করা একটি অর্থে আরূঢ় করার নামই যোগ।
নীরদনীল সমুদ্র সামনে পড়ে আছে, তার জল খেয়ে কি পিপাসা মিটবে? মিটবে না। বরং সেই লোনা জল যত খাবে ততই আরো বাড়বে পিপাসা! তবে উপায়? উপায় সূর্য। সূর্য সেই লোনা জল টেনে নেবে স্বতেজে, তার পর ধারাধর রূপ ধরে ধারাবর্ষণ করবে। সেই মেঘপতিত বৃষ্টির জলেই তোমার তৃষ্ণার তৃপ্তি, তোমার দাহের নিবারণ।
এই সমুদ্র হচ্ছে শাস্ত্র। তুমি নিজে থেকে এর জলপান করো তৃষ্ণানিবৃত্তি হবে না। সহস্রবর্ষ পরমায়ু পেলেও পার হতে পারবে না এই মহাসাগর। সুতরাং গুরুরূপী সূর্যকে ডাকো। সূর্যের শরণ নাও। লবণাক্ত জল টেনে নিয়ে সূর্য তোমাকে পরিচ্ছন্ন জল দেবে, তোমার তৃষ্ণাবারক মন্ত্র তোমার সিন্ধুপারক সাধন প্রণালী। সুতরাং গুরুর পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয়।
উপর থেকে নিচে কালীপ্রসাদের বুকে আবার হাত বুলিয়ে দিলেন ঠাকুর। কেটে গেল সমাধি। ফিরে এল বাহ্যজ্ঞান।
'জলে জল, অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ।' বললেন ঠাকুর, 'জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে দেখবে এই সত্যকে।' আবার বললেন, 'অনন্ত আকাশ তাতে পাখি উড়ছে পাখা মেলে। চৈতন্য আকাশ, আত্মা পাখি। পাখি খাঁচায় নেই, চিদাকাশে উড়ছে। আনন্দ আর ধরে না।'

গিয়ে হাজির হই। মুখে-মুখে মোটামুটি জেনে নিই। যোগসূত্রের পর শিবসংহিতা। যত পড়ি ততই মন ব্যাকুল হয়। কিন্তু সব শাস্ত্রেই ঐ এক কথা, যোগসিদ্ধ গুরু না পেলে একা-একা সাধন করতে গেলেই সর্বনাশ! তখন মন বড় দমে যায়, পড়াশোনা বিস্বাদ লাগে। কোথায় পাব সেই যোগগুরু? বাগবাজারের যজ্ঞেশ্বর আমার বন্ধু। তাকে বললাম আমার মনের যন্ত্রণা। সে বললে, দক্ষিণেশ্বরে যাও। সেইখানেই মিলবে এক মহাযোগী।

তন্ময়ের মত শুনছেন ঠাকুর।

দক্ষিণেশ্বর কোথায়, তাই কি আমি জানি? বাড়ির সবাইকে জিগগেস করলুম, কেউ হদিস দিতে পারলেন না। যজ্ঞেশ্বরেরও ঠিকানা জানা নেই যে সেখানে গিয়ে খোঁজ করব। যা থাকে অদৃষ্টে, বেরিয়ে পড়লুম, যেমন গিরিগৃহ থেকে নির্ঝরিণী বেরোয়। উত্তরে কোথাও হবে আচমকা একটা আন্দাজ করে চিৎপুরের খাল পেরোলুম। কিসের টানে এগিয়েই চলেছি, সকাল প্রায় দুপুরে গাড়িয়ে পড়ল। পথচারী একজনকে হঠাৎ জিগগেস করলুম, দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারো? সে কি কথা! রাজ্যের পথ এগিয়ে এসেছেন যে, ফিরে যান। আবার ফিরে চললুম। ঘুরতে-ঘুরতে পেলুম ঠিক দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম আপনি কলকাতায় গিয়েছেন, এ বেলা আর ফিরবেন না।

তখন কি আর করি, আপনারই ঘরের উত্তরের বারান্দায় বসে পড়লুম হতাশ হয়ে। হাঁটতে-হাঁটতে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেছে, পকেটে একটি আধলাও নেই, বাড়ির লোকদের না বলে-কয়ে এসেছি, তারা না জানি কত উতলা হয়েছে এই সব ভেবে দেহ মন নেতিয়ে পড়ল। এমন সময় দেখি, কে একটি ছেলে ছাতা-হাতে আসছে এদিকে। আপনজনের মত একেবারে আমার পাশে এসে বসল, নাম শুনলুম শশিভূষণ। এস দুজনে মিলে গঙ্গাস্নান করি, কালীবাড়ির কর্মচারীদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাদের বলে কিছু প্রসাদ সংগ্রহ করি দুজনে, তার পর স্থির হয়ে বসে একমনে শুধু ঠাকুরের কথা কই।

ক্রমে-ক্রমে সন্ধ্যে হল, বেজে উঠল আরতির বাজনা। আরতির পর রামলাল-দাদা শীতলভোগের প্রসাদ এনে দিলেন। প্রসাদ পেয়ে দু বন্ধু শুয়ে পড়লুম বারান্দায়। রাত প্রায় নটা, ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ হল। ঐ আসছেন ঐ এসেছেন ঠাকুর।

কালী, কালী, কালী—গাঢ়গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করতে-করতে ঠাকুর ঢুকলেন তাঁর ঘরটিতে উত্তরের বারান্দা পেরিয়ে। পিছনে গামছা আর বটুয়া হাতে লাটু। শশী গিয়ে বললে কালীপ্রসাদের কথা। ডাকো ডাকো, তাকে দেখিনি কখনো। রামলালকে দিয়ে ডাকিয়ে আনলেন। গড় হয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই জিগগেস করলেন, 'তুমি কে?'

নবাগত তরুণ সুদীপ্ত চোখে বললে, 'আমি কালীপ্রসাদ।'

উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ।

'কি চাই তোমার?'

নির্ভীক অথচ আকুলকণ্ঠে বললে কালীপ্রসাদ, 'আপনার কাছে যোগ শিখতে চাই।'
আশ্চর্য, একবাক্যে রাজী হয়ে গেলেন ঠাকুর। সকলেই তো ভোগ চায়, যোগ চায় কজন! কে চায় প্রশান্তবাহিতা স্থিতি, কে চায় সুধা-পণ্য!
বললেন, 'তোমার এই কাঁচ বয়েস, তোমার যোগশিক্ষার ইচ্ছে হয়েছে এ তো খুব ভালো লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে প্রকান্ড যোগী ছিলে, একটুখানি এখনো বাকি আছে, এই তোমার শেষ জন্ম। দেব আমি তোমাকে যোগশিক্ষা। আজ রাত যাক, কাল ভোরবেলা এস।'
রাত কি আর কাটে। বারে-বারে উঠে বসে কালীপ্রসাদ, কতক্ষণে না জানি নব প্রভাতের অরুণরঞ্জন দেখা দেবে। ঠিক সময়ে রামলালকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন ঠাকুর। নিয়ে গেলেন উত্তরের বারান্দায়। একখানি তক্তপোশ পাতা ছিল, বললেন, 'বসো, যোগাসন করে বসো।' বসল কালীপ্রসাদ।
জিভ দেখি। কালীপ্রসাদ জিভ বের করল। ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে ঠাকুর তার জিভে মূলমন্ত্র লিখে দিলেন। নিচে থেকে উপরে হাত বুলিয়ে দিলেন বুকে, ঊর্ধ্ব দিকে তুলে দিলেন শক্তি। বললেন, তুমি যাঁর প্রসাদ সেই মা-কালীর ধ্যান করো।
মুহূর্তে কাষ্ঠবৎ সমাহিত হয়ে গেল কালীপ্রসাদ।
নিষ্কল নির্মল নিরাময় শান্ত ও সর্বাতীত। বর্ণমালা অভ্যাস করেই সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্তে আনা যায়, তেমনি যোগাভ্যাস করেই পাওয়া যায় তত্ত্বজ্ঞান। বিচ্ছিন্ন বর্ণ কোনো পদবিন্যাস করতে পারে না, কিন্তু একত্র গ্রথিত করলেই কেমন বাক্য-পদ-ছন্দের আকৃতি ধরে। তেমনি সমস্ত শক্তিকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে একটি কেন্দ্রে সংলগ্ন করা একটি অর্থে আরূঢ় করার নামই যোগ।
নীরদনীল সমুদ্র সামনে পড়ে আছে, তার জল খেয়ে কি পিপাসা মিটবে? মিটবে না। বরং সেই লোনা জল যত খাবে ততই আরো বাড়বে পিপাসা! তবে উপায়? উপায় সূর্য। সূর্য সেই লোনা জল টেনে নেবে স্বতেজে, তার পর ধারাধর রূপ ধরে ধারাবর্ষণ করবে। সেই মেঘপতিত বৃষ্টির জলেই তোমার তৃষ্ণার তৃপ্তি, তোমার দাহের নিবারণ।
এই সমুদ্র হচ্ছে শাস্ত্র। তুমি নিজে থেকে এর জলপান করো তৃষ্ণানিবৃত্তি হবে না। সহস্রবর্ষ পরমায়ু পেলেও পার হতে পারবে না এই মহাসাগর। সুতরাং গুরুরূপী সূর্যকে ডাকো। সূর্যের শরণ নাও। লবণাক্ত জল টেনে নিয়ে সূর্য তোমাকে পরিচ্ছন্ন জল দেবে, তোমার তৃষ্ণাবারক মন্ত্র তোমার সিন্ধুপারক সাধন প্রণালী। সুতরাং গুরুর পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয়।
উপর থেকে নিচে কালীপ্রসাদের বুকে আবার হাত বুলিয়ে দিলেন ঠাকুর। কেটে গেল সমাধি। ফিরে এল বাহ্যজ্ঞান।
'জলে জল, অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ।' বললেন ঠাকুর, 'জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে দেখবে এই সত্যকে।' আবার বললেন, 'অনন্ত আকাশ তাতে পাখি উড়ছে পাখা মেলে। চৈতন্য আকাশ, আত্মা পাখি। পাখি খাঁচায় নেই, চিদাকাশে উড়ছে। আনন্দ আর ধরে না।'

যখন নিজ দেহের অন্তঃপুরে একাকী বসে তোমাকে ডাকি, তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও। আমার সামনে এসে দাঁড়ালে তোমাকে আর ডাকতে হয় না, তোমার সেই ডাক-নাম—নাম-জপও আমি ভুলে যাই। তুমিই বা তখন কোথায়! শুধু দেখি তোমার রূপ, রূপের তরঙ্গ, মাধুর্যসমুদ্রের প্রশান্তি। ডুবে যাই লীন হয়ে যাই। আমার আমি তোমার আমিতে বিভোর হয়ে যায়। শিবমূর্তির মূল ধ্যান আর থাকে না, কল্যাণাস্পদ শিবতত্ত্বে নিমগ্ন হই।

'মহীনবাবু কি টাকা-টাকা করছ!' ঠাকুর বললেন ডাক্তার সরকারকে। 'মাগ, মাগ—মান, মান। ও সব এখন ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও। একচিত্ত হও। ঈশ্বর-আনন্দ ভোগ করো।' বলতে-বলতেই ভাবাবিষ্ট হলেন ঠাকুর।

ডাক্তার বললে, 'কথা আর ভাব এখন ভালো নয়।'

কে শোনে সে কথা। ঠাকুর তাকালেন ডাক্তারের দিকে। বললেন, 'জানো, কাল ভাবাবস্থায় তোমাকে দেখলাম। দেখলাম জ্ঞানের আকর কিন্তু মগজ একেবারে শুকনো। আনন্দরসের ছিটেও লাগেনি। কিন্তু যদি একবার পাও সেই রসের সন্ধান, অধঃ-ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, হ্যাঁক-ম্যাঁক লাঠিমারা কথাগুলো আর বেরুবে না মুখ দিয়ে।'

ডাক্তার হাসতে লাগল মৃদু-মৃদু। বললে, 'একেবারে শুকনো।'

'তুমি এ সব বিশ্বাস করো না,' ঠাকুর বললেন, 'ডাক্তার ভাদুড়ী বলছিল মন্বন্তরের পর তোমার একেবারে ইট-পাটকেল থেকে শুরু করতে হবে!'

হেসে উঠল ডাক্তার। বললে, 'তাতে ক্ষতি কি। যদি ইট-পাটকেল থেকে শুরু করে অনেক জন্মের পর মানুষ হই আর এখানে আসি তাহলে আবার সেই ইট-পাটকেল থেকে শুরু।'

হেসে উঠল সকলে।
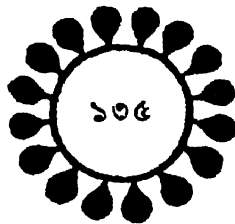
মেডিকেল কলেজের ইংরেজ ডাক্তার কোটস এসেছে ঠাকুরকে দেখতে। যদিও হোমিও-প্যাথি চলছে, একবার দেখে যেতে ক্ষতি কি।

যে প্রণালীতে সাহেবি পরীক্ষার বিধি তা এক কথায় বলা যায় আসুরিক। সরাসরি ঠাকুরের গলা টিপে ধরলেন।

যন্ত্রণায় শিউরে উঠলেন ঠাকুর। বুঝলেন ব্যাধির চেয়ে চিকিৎসাই মর্মান্তিক। তখন কি আর করা! স্বভাবজ সমাধিতে ডুবে গেলেন। এখন দেখ তোমার যত খুশি। যত খুশি কসরত করো।
সাহেবের চক্ষু স্থির! এ কি অদ্ভুত রোগী! ভূতলে অতুল শোভা এ কি নির্মল-কান্তি! রোগ দেখবে না রোগী দেখবে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে সাহেব।
কেমন দেখলে?
রোগ তো ক্যানসার, বলতে পারি সহজে। কিন্তু এ রোগী কে? সর্বলোকসুখাবহ সর্বচক্ষুস্নেহপ্রদ। এমনটি তো আর দেখিনি কোথাও। বাইবেলে পড়েছি যীশুর এমন ভাবসমাধি হত। আজ দেখলাম স্বচক্ষে। দেহবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। শরীরে যে এত কষ্ট আননমণ্ডলে যেন তার চিহ্নমাত্র নেই। কণ্টক-কষ্ট উত্তীর্ণ হয়েও যেন ফুটে আছে আনন্দপদ্ম।
যিনি মহাচিন্ময় হয়েও বৃহৎ পাষাণবৎ স্থিত, যিনি জড়ের অন্তঃস্বরূপ চৈতন্য—সাহেব যেন সেই পরমাত্মার রূপ দেখলে। ছদ্মবেশধারী রাজাকে।
ওষুধ? যেমন চলছে তেমনি চলুক। তাইতেই ভালো হবে।
চিকিৎসার ভার নিল না সাহেব। তা না নাও, তোমার প্রাপ্য ফি-টা নিয়ে যাও। হাত গুটোল সাহেব। বললে, টাকা ছুঁয়ে হাত ও মন অশুচি করতে পারব না। এ টাকাটা ওঁরই সেবায় ব্যয় হোক।
তারপর এল ডাক্তার নবীন পাল। মহেন্দ্র সরকার রোজ আসতে পারে না এত দূরে, তাই হাতের কাছে একজনকে মজুত রাখো। নবীন পাল ডাক্তার হয়েও কবরেজি করে। মন্দ কি, তার চিকিৎসাই কদিন করা যাক না।
কিন্তু সুবিধে হল না। তার বিধিব্যবস্থাও ক্লেশদায়ক।
হোমিওপ্যাথিই ভালো। তবে এবার একবার ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্তকে নিয়ে এস।
কিন্তু রাজেন্দ্র শুধু ডাক্তার হয়েই আসে না, ভক্তমূর্তিতে আসে। কখনো হাতে একটি সুগন্ধি ফুল নয়তো সুমধুর একটি ফল। কি পথ্য খেতে ইচ্ছে করে তোমার—কখনো বা সেই পথ্য। বিদ্যুন্মালামণ্ডিত এ কে মহামেঘ! গ্রীষ্মকৃশ ধরিত্রীকে কৃপাবারি-সিঞ্চনে তুষ্ট-পুষ্ট করছেন! আমার তো চিকিৎসা নয়, আমার এ ব্রত, হরিতোষণ ব্রত। আহা, দুর্বল শরীরে ঐ চটিজুতোর ভার তুমি বইতে পারছ না—মখমলের নরম চটি হলে ভালো হয়। রাজেন দত্ত মখমলের চটি নিয়ে এল। নিজ হাতে পরিয়ে দিল শ্রীপদে!
নিত্যসিদ্ধ আগুন যেমন কাঠে আবির্ভূত হয় তেমনি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর মহাভূতরূপে জন্ম নেয়। কিন্তু কে তাকে চেনে? সমুদ্রস্থ চন্দ্রকে মাছ কমনীয় জলচর মনে করে, চিনতে পারে না অমৃতপিণ্ড বলে। কৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বাস করেও যদুবংশীয়েরা চিনতে পারেনি হরিকে। শীতোষ্ণবাতবর্ষে অভিভূত আমরা, সংশয়খিন্ন বুদ্ধি আমাদের, চিনতে পারব কি তোমাকে? হে তমঃসংহর্তা বিজ্ঞানাত্মা, তোমার সর্ব-প্রকাশক প্রভাতের আলোটি কি আমাদের চোখে এসে পড়বে?
ডাক্তার সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন ওষুধ দিল রাজেন্দ্র। একটু যেন ফল

হল। ব্যথার যেন উপশম হল খানিকটা। কিন্তু সেই ফল কি চিকিৎসার, না, ভক্তির? ভক্তিই একমাত্র বলবিধায়িনী ওষধি।
কদিন পরেই আবার যে-কে-সে। ডাকো মহেন্দ্র সরকারকে।
কিন্তু অসুখের কথা কই? কেবল ঈশ্বরের কথা। সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান জেগে রয়েছেন, ফুটে রয়েছেন, ফলে রয়েছেন, সেই কথা।
'কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন,' বললেন ঠাকুর, 'তুমি আমাকে ঈশ্বর বলছ—কিন্তু তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, দেখবে এস। অর্জুন গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে। খানিক দূরে গিয়ে বললেন শ্রীকৃষ্ণ, কি দেখছ? অর্জুন বললেন, মস্ত একটা গাছ। কি গাছ? জাম গাছ। কি ফলে আছে? অর্জুন বললেন, কালো জাম থোলো-থোলো হয়ে ঝুলে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কালো জাম নয়। দেখ ভালো করে। আর একটু এগিয়ে এসে দেখ। তখন অর্জুন দেখলেন, বললেন, থোলো-থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেখলে তো? আমার মত কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে।'
ডাক্তার সরকার বললে, 'এ সব বেশ কথা।'
ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কেমন কথা?'
'বেশ।'
'তবে একটা থ্যাংক-ইউ দাও।' লোকার্তিহর হাসি হাসলেন ঠাকুর।
পরিহাসের স্বচ্ছ জলের উপর ফোটাচ্ছেন বর্ণাঢ্য ভাবপদ্ম। ঈশ্বরকথার চন্দনে স্নিগ্ধ করছেন রোগযন্ত্রণা।
কিন্তু, জানো ডাক্তার, ব্যথাটা আবার বেড়েছে।
'নিশ্চয়ই কুপথ্য করেছ।' ডাক্তার সরকার শাসিয়ে উঠল।
সকালে একটু ভাতের মণ্ড, ঝোল আর দুধ, সন্ধ্যায় আবার একটু দুধ আর যবের মণ্ড—এই তো পথ্য সারা দিনের। তার মধ্যে আবার অনিয়ম কি?
'কি, কুপথ্য করেছ, তাই—'
ঠাকুর মাথা চুলকে বললেন, 'কই না তো!'
'আচ্ছা, আজ কোন-কোন আনাজ দিয়ে ঝোল রান্না হয়েছিল?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল ডাক্তার।
'আলু কাঁচকলা বেগুন—' ঠাকুর আবার মাথা চুলকোলেন : 'দু-এক টুকরো ফুলকপিও ছিল—'
'এ্যাঁ! ফুলকপি? ফুলকপি দিয়েছ? এই তো খাবার অত্যাচার হয়েছে।' তড়পাতে লাগল ডাক্তার : 'ক-টুকরো খেয়েছ?'
'না গো এক টুকরোও খাইনি।' ঠাকুর বললেন অপরাধীর মত : 'তবে ঝোলে ছিল দেখেছি।'
'দেখেছ? তবেই হয়েছে। না খেলে কী হয়?'
'না খেলে কী হয়!' ঠাকুর অবাক হবার ভাব করলেন।
'কপি না খাও ঝোল তো খেয়েছ। ঝোলে তো কপির গুণ ছিল। তারই জন্যে তোমার হজমের ব্যাঘাত হয়ে ব্যারামের বৃদ্ধি হয়েছে।'

'সে কি গো!' ঠাকুর প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন : 'কপি খেলাম না, পেটের অসুখও হয়নি, ঝোলে একটু-কি কপির রস ছিল তাইতেই অসুখ বাড়ল? এ কিছুতেই মানতে পারব না।'

'মানতে পারবে না কেন?' ডাক্তার বসল গ্যাঁট হয়ে : 'আমার বেলায় কি হয়েছিল তবে শোনো! হোমিওপ্যাথি করি, ছোট একটুকুর শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারি না। তুমিই তো বলো, ছোট-একটুকু বীজে বিরাট বনস্পতি। সেবার আমার দারুণ সর্দি হল। সর্দি থেকে ব্রঙ্কাইটিস। কিছুতেই সারে না। কেন যে অসুখটা লেগে থাকছে বুঝে উঠতে পারছি না কিছুতেই। শেষে একদিন দেখি কি—'

ঠাকুর তাকালেন কৌতূহলী হয়ে।

'দেখি চাকর গরুকে মাষকড়াই খাওয়াচ্ছে। যে গরুটার আমি দুধ খাই সেই গরুটাকে। কি ব্যাপার? চাকর বললে, কোত্থেকে কতগুলো মাষকড়াই জুটেছে সর্দির ভয়ে কেউ খেতে চাচ্ছে না, তাই ঠেসে-ঠেসে খাওয়াচ্ছে গরুকে। হিসেব করে দেখলাম যেদিন থেকে মাষকড়াই খাচ্ছে গরু, সেদিন থেকেই আমার সর্দি।'

'তারপর কি করলে?'

'গরুর মাষকড়াই খাওয়া বন্ধ করে দিলাম, আর আমার সর্দিও সেরে গেল।'

সবাই হেসে উঠল হো-হো করে।

'কিসে কি হয় কিছু বলা যায় না।' আবার গল্প জুড়ল ডাক্তার। 'পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙরি কাশি, হুপিং কাফ। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি না। শেষে জানতে পারলুম গাধা ভিজেছিল।'

'গাধা ভিজেছিল কি গো!'

'যে গাধার দুধ খেত মেয়েটি সেই গাধা ভিজেছিল বৃষ্টিতে।'

'কি বলে গো!' ঠাকুরও রঙ্গ করলেন : 'সেই যে বলে তেঁতুলতলা দিয়ে আমার গাড়ি গিয়েছিল তাই আমার অম্বল হয়েছে।'

পড়ল আবার হাসির রোল।

'জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল।' ফোড়ন দিল ডাক্তার : 'তা ডাক্তারেরা পরামর্শ করে জাহাজের সারা গায়ে বেলেস্তারা লাগিয়ে দিলে।'

কিন্তু ঠাকুরের অসুখ নরম পড়ে না কিছুতেই।

শশধর তর্কচূড়ামণির অন্য কথা। নিজের চিকিৎসা নিজে করো। কি ছাই পরের কাছে ব্যবস্থা চাও, নিজেই নিজের ব্যবস্থা করো। তুমি নিজে ভবরোগবৈদ্য হয়ে কি করতে অন্য ডাক্তারের শরণ নিচ্ছ! হাতে যার লণ্ঠন সে টিকে ধরাবার জন্যে প্রতিবেশীর ঘরে আগুন চাইতে যায় কেন?

কি করতে হবে?

'শাস্ত্রে পড়েছি আপনার মত যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা ইচ্ছা করলেই শারীরিক রোগ আরাম করতে পারেন। যেখানটায় কষ্ট সেখানটায় মন একাগ্র করে আরামের তীব্র প্রার্থনা করলেই তা সেরে যায়। তা একবার দেখুন না চেষ্টা করে।'

'তুমি এত বড় একটা পণ্ডিত হয়ে এমন কথা বললে?' ঠাকুর আপত্তির সুরে বললেন, 'যে মন সচ্চিদানন্দে দিয়েছি তা সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের খাঁচার উপর দেব? এটা তুমি কেমন কথা বললে গো?'
সেবার এক কুষ্ঠরোগী এসেছিল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'দয়া করে যদি একবার হাত বুলিয়ে দেন তবেই আমি সেরে যাই।'
'কই আমি তো জানি না কিছু!'
'আপনাকে কিছু জানতে হবে না।' লোকটি কান্নায় লুটিয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ে। 'শুধু দয়া করে একটু হাত বুলিয়ে দিন।'
'যখন বলছ দিচ্ছি হাত বুলিয়ে। মা'র ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।' হাত বুলিয়ে দিলেন ঠাকুর।
হাত বুলিয়ে দেবার পর তখন নিজের হাতে কি অসম্ভব যন্ত্রণা! অস্থির হয়ে উঠলেন। মাকে বললেন আকুল হয়ে, 'মা এমন কাজ আর করব না।'
রোগীর রোগ সেরে গেল আর যত ভোগ নিজে টেনে নিলেন।
দেখতে পেলেন একদিন স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে এসে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। দেখলেন তার পিঠময় ঘা। এমন কেন হল?
তখন মা দেখিয়ে দিলে, যা-তা করে এসে যত লোক ছোঁয়, তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়, তখন তাদের সেই দুষ্কর্মের বোঝা নিতে হয় ঘাড় পেতে। সেই জন্যেই তো এই রোগ, এত কষ্ট।
সকলের পাপ আর তাপ জ্বালা আর যন্ত্রণা বহন করে নিয়ে যাব। আমার রোগে সকলের আরোগ্য।
নগরের প্রান্তে এসে সিদ্ধার্থ তাঁর অশ্বকে বিদায় দিলেন। দেখলেন পথের উপর কটিধৃতকাষায়পরিহিত এক কিরাত। বললেন, তোমার ঐ ছিন্ন কাষায়খানা আমাকে দাও।
সিদ্ধার্থের পরিধানে কৌষেয়। বিনিময়ে তা পাবার লোভে কিরাত তার কাষায় ত্যাগ করল। আর তথাগত কৌষেয়বাস ছেড়ে জীবরক্তকলঙ্কিত অশুচি বসন গায়ে ধরলেন।
জীবজগতের পুঞ্জিত বেদনা বহন করে চললেন বনপথে।
কৌষেয়পরা ব্যাধ চলল তাঁর পিছু-পিছু। এ কি, তুমি কোথায় চলেছ এই গহন রাতে?
ব্যাধ বললে, 'এ কী বসন তুমি পরালে আমাকে? তীরধনুক খসে পড়ছে আমার হাত থেকে। জগৎপ্রাণীকে মনে হচ্ছে আত্মজন। তুমি তোমার বসন ফিরিয়ে নাও। আমাকে দাও আমার জীর্ণ চীর।'
সিদ্ধার্থ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'ভাই তুমিই আমার সাধনার পথের প্রথম বন্ধু। জীবনবসন জীবহিংসাচিহ্নিত হয়ে আছে, অহিংসার সাধনায় এস তাকে নবীনধবল করি। কৌষেয় জীর্ণ হোক, দূর হোক হিংসাদ্বেষকলহ আর কাষায় পবিত্র হয়ে বিশ্বমানবের নির্বাণবেশ রচনা করুক।'
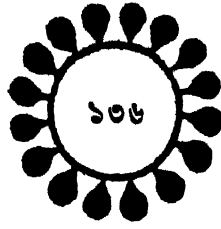
নলিনীদলসনাথ সরোবরের পারে এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। দেখলেন, হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয়—চার পর্বতের মত তাঁর চার ভাই, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, মরে পড়ে আছে। হা কুরুকুলকীর্তিবর্ধন, তোমাদের এ দশা কে করল? কাঁদতে লাগলেন আকুল হয়ে।

আমি করেছি। আমি যক্ষ। এই সরোবর আমার অধিকারে। আমার নিষেধ অমান্য করে তোমার চার ভাই জল পান করতে চেয়েছিল, তাই তাদের মেরেছি। তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তার পর চাও তো জল খাও।

নিশ্চয়ই। তোমার অধিকৃত বস্তুতে আমার অভিলাষ নেই। বললেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর কি দিতে পারব ঠিক-ঠিক? আত্মশ্লাঘা করছিনে, সাধু-পুরুষেরা আত্মশ্লাঘার নিন্দে করে থাকেন, তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, নিজের বুদ্ধি-অনুসারে তোমার উত্তর দেব।

বেশ, তবে শোনো : সূর্যকে কে ঊর্ধ্বে রেখেছে? কে সূর্যের চার দিকে বিচরণ করে? কে তাঁকে অস্তে পাঠায়? কোথায় বা তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির উত্তর করলেন : ব্রহ্ম সূর্যকে ঊর্ধ্বে রেখেছেন, দেবগণ তাঁর চারদিকে ঘুরে বেড়ান, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠান, আর তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন সত্যে।

ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি কারণে? তাদের কোন ধর্ম সাধুধর্ম? কিসে তাদের মানুষ ভাব? অসাধু ভাবই বা কেন?

বেদপাঠের হেতু তাদের দেবত্ব। তপস্যাই সাধুধর্ম। মৃত্যু মনুষ্যভাব। আর পর-নিন্দায় তারা অসাধু।

ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব সাধুভাব মনুষ্যভাব অসাধুভাবই বা কি?

অস্ত্রনিপুণতা দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব এবং শরণাগতকে পরিত্যাগই অসাধুভাব।

পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর কে? আকাশের চেয়ে উচ্চতর কে? বায়ুর চেয়ে শীঘ্রতর কে? তৃণের চেয়ে বহুতর কে?

মাতা পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর। পিতা আকাশের চেয়ে উঁচু। মন বায়ুর চেয়ে শীঘ্র-গামী। আর তৃণের চেয়ে বহুতর হচ্ছে চিন্তা।

কে নিদ্রিত হয়েও নয়ন মুদ্রিত করে না? জন্মগ্রহণ করেও কে স্পন্দিত হয় না? কার হৃদয় নেই? কে বেগে বর্ধিত হয়?

মাছ নিদ্রাকালেও চোখ বোজে না। অণ্ড প্রসূত হয়েও নিস্পন্দ। পাষাণই হৃদয়হীন। নদীই বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়।

প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমূর্ষু—এদের মিত্র কে?

প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্যা, আতুরের চিকিৎসক, মুমূর্ষুর দান।

কে সর্বভূতের অতিথি? সনাতন ধর্ম কি? অমৃত কি? সমুদয় জগতই বা কি পদার্থ?

অগ্নি সর্বভূতের অতিথি। জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম। সলিল ও যজ্ঞশেষ অমৃত। বায়ুই সমুদয় জগৎ।

কে একাকী বিচরণ করে? কে বারে-বারে জন্মায়? কে প্রধান বপনক্ষেত্র?

সূর্য। চন্দ্র। পৃথিবী।

ধর্মের, যশের, স্বর্গের ও সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?

দাস্য ধর্মের, দান যশের, সত্য স্বর্গের, শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।

কি ত্যাগ করলে প্রিয় হয়? কি ত্যাগ করলে শোক যায়? কি ত্যাগ করলে ধনী হয়? কি ত্যাগ করলে সুখী হয়?

অভিমান ত্যাগ করলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক যায়, কামনা ত্যাগ করলে ধনী হয়, আর লোভ ত্যাগ করলে সুখী।

তপঃ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি?

স্বধর্মানুবর্তিত্বই ধর্ম, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা আর অকার্য থেকে নিবৃত্তিই লজ্জা।

জ্ঞান শম দয়া ও আর্জব কাকে বলে?

তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখাভিলাষই দয়া আর সমচিত্ততাই আর্জব।

স্থৈর্য ধৈর্য স্নান ও দানের কি লক্ষণ?

স্বধর্মে নিয়তাবস্থা স্থৈর্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধৈর্য, মনোমালিন্য পরিত্যাগই স্নান আর প্রাণিরক্ষাই দান।

অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব্য এবং পৈশুন্য কি?

অজ্ঞানই অহঙ্কার, ধর্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব্য আর পরের প্রতি দোষারোপই পৈশুন্য।

সুখী কে? আশ্চর্য কি? পথ কি? বার্তাই বা কাকে বলে?

যিনি অঋণী ও অপ্রবাসী হয়ে দিবসের অষ্টম ভাগে বা সন্ধ্যাকালে গৃহে শাক পাক করেন তিনিই সুখী। প্রাণিগণ শমনসদনে যাচ্ছে প্রত্যহ তবু অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এইটেই আশ্চর্য। নানা মুনির নানা মত, ধর্মের তত্ত্ব গুহা-নিহিত, অতএব মহাজন যে পথে গেছেন তাই পথ। আর বার্তা? মহামোহরূপ কটাহে কাল জগৎপ্রাণীকে পাক করছে, সূর্য তার আগুন, দিনরাত্রি তার ইন্ধন, মাস-ঋতু তার দর্বী।

যক্ষ বললে, তুমি ঠিক-ঠিক সব উত্তর দিয়েছ। এখন শেষ প্রশ্নের জবাব দাও।

পুরুষ কে? আর সর্বধনীই বা কোনজন?
পুণ্যকর্মের ফলে মানুষের নাম স্বর্গ স্পর্শ করে ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যত দিন থাকে তত দিনই সে পুণ্যকর্মা পুরুষ বলে গণ্য। যে অতীত বা অনাগত সুখ-দুঃখ প্রিয়-অপ্রিয় তুল্য বলে মনে করে সেই সর্বধনী।
বেশ, খুশি হলাম। এখন ভ্রাতাদের মধ্যে শুধু একজনকে বেছে নাও, সে বেঁচে উঠবে।
যুধিষ্ঠির বললেন, তবে একমাত্র নকুল জীবিত হোক।
সে কি? ভীম, অর্জুন কারু প্রাণ না চেয়ে বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণ চাইলে?
ধর্মকে নষ্ট করলে ধর্মই আমাদের নষ্ট করবেন, বললেন যুধিষ্ঠির, আর রক্ষা করলে রক্ষা করবেন। কুন্তী আর মাদ্রী উভয়েই আমার জননী। উভয়ে পুত্রবতী থাকুন এই আমার অভিলাষ।
তুমি কামনায় ও কার্যে অন্তরে-বাহিরে, অনৃশংস। অতএব তোমার সকল ভাইই পুনর্জীবিত হোন।'
এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশ্নোত্তরমালিকা দেখ।
পথ কি? যত মত তত পথ।
দেবতা থেকেও বড় কে? মানুষ। মানুষ কে? যে মান-হুঁস সে। আর আমি কে? তুমি।
দয়া কি? সবাইকে ভালোবাসার নাম দয়া। চাতুরী কি? যে চাতুরীতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।
সিদ্ধ কে? পরের দুঃখে যে কাঁদে। তত্ত্বজ্ঞান কি? আত্মজ্ঞান। লাভ কেমন? ভাব যেমন।
দেহের যত্ন করবে কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করবে বলে। ঈশ্বর কে? মানুষ। কোথায় তার বৈঠকখানা? ভক্তের হৃদয়ে।
জ্ঞান অজ্ঞান কি? এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। যখন হোথা তখন অজ্ঞান, যখন হেথা তখন জ্ঞান।
বীরভক্ত কে? সংসারে থেকে যে ঈশ্বরকে ডাকে। উপায় কি? দুটি—অভ্যাস আর অনুরাগ। কার হয় না? যে বলে আমার হবে না।
তপস্যা কি? সত্য কথা। মন্ত্র কি? মন তোর মন্তোর। মায়া কি? কামকাঞ্চন। অবিদ্যা কি? যে ঈশ্বরের পথে বাধা দেয়।
গীতার অর্থ কি? দশ বার গীতা-গীতা বললে যা হয়। কার কাছে ঈশ্বর ছোট? ভক্তের কাছে। ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়, কেন না ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভক্তের কেমন স্বভাব? আমি বলি তুমি শোনো, তুমি বলো আমি শুনি।
কোথায় নিমন্ত্রণের দরকার হয় না? যেখানে হরিনাম।
ঈশ্বর আমাদের কি? আমাদের বিলেত।
আর, ইচ্ছা কি? স্বাধীন ইচ্ছা না ঈশ্বরের ইচ্ছা? ঈশ্বরের ইচ্ছা।
কলকাতার বড় আদালতের উকিল জিগগেস করল ঠাকুরকে, 'মশায়, একটি সন্দেহ

আমার যায় না। এই যে বলে ফ্রি উইল, স্বাধীন ইচ্ছে, মনে করলে ভালোও করতে পারি মন্দও করতে পারি, এটা কি সত্যি? সত্যিই কি আমরা স্বাধীন?'

'সব ঈশ্বরাধীন, সব তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা।' বললেন ঠাকুর : 'তাঁর ইচ্ছেতেই ছোট বড় সবল দুর্বল ভালো লোক মন্দ লোক। এই দেখ না বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না।' আবার বললেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয় ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রমে তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হত। পাপে ভয় হত না, পাপে শাস্তি হচ্ছে এ বোধ হত না।'

সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পুজা হচ্ছে। উঠানে ভক্ত সঙ্গে বসে আছেন ঠাকুর। ঠেসান দেওয়ার জন্যে ঠাকুরকে তাকিয়া দেওয়া হল। তাকিয়া সরিয়ে রাখলেন।

'তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসা! কি জানো অভিমান ত্যাগ করা বড় শক্ত। এই বিচার করছ অভিমান কিছু নয়, আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। স্বপ্নে ভয় দেখেছ, জেগে উঠেও ভয়ে বুক দুর-দুর করে। অভিমানও সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার এসে পড়ে কোত্থেকে। কেবল মুখভার, কেবল নালিশ, আমায় খাতির করলে না, আমাকে তাকিয়া দিল না ঠেসান দিতে।'

নদীর জল নদীতে আছে, সে জল কি আমার? বনের ফুল ফুটে আছে কাননে, সে ফুল কি আমার? জল যখন তুলে আনি কলসীতে তখন বলি আমার। ফুল যখন তুলে এনে ডালিতে সাজাই তখন বলি আমার। জল দিয়ে দাও তৃষ্ণাতুরকে, ফুল দিয়ে দাও দেবতার পুজায়। তখনই অহং সার্থক, তখনই অহং আত্মা।

আমি শরীর তুমি আত্মা। আমি রথ তুমি রথী। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। আমি গাড়ি তুমি ইঞ্জিনিয়র।

বৈদ্যনাথের দিকে ফের তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'আপনি কি বলো? তর্ক করা ভালো?'

'আজ্ঞে না। তবে তর্ক করার ভাব জ্ঞান হলে যায়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। যদি কোনো মহাপুরুষ বলে আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তবুও লোকে তার কথা নেয় না। বলে ও যখন দেখেছে তখন আমাকেও দেখিয়ে দিক। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, সেই বৈদ্যের সঙ্গে ঘোরো। তখন কোনটা কফের কোনটা পিত্তের কোনটা বায়ুর বুঝতে পারবে। আগে সুতোর ব্যবসা করো তবেই তো বুঝতে পারবে কোনটা চল্লিশ নম্বর কোনটা বা একচল্লিশ নম্বরের সুতো।'

খোল বাজছে। এবার কীর্তন শুরু হবে। গায়ক জিগগেস করছে, কি পদ গাইব? ঠাকুর বললেন, 'ওগো একটু গৌরাঙ্গের কথা কও।'

রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত কীর্তন চলল। ঠাকুর কত নাচলেন, আখর দিলেন।

সুরেন বললে, 'আজ কিন্তু মায়ের নাম একটুও হল না।'

প্রতিমার দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, 'আহা, মা কেমন আলো করে বসে আছেন। দর্শনে ভোগের ইচ্ছা দুঃখশোক সব পালিয়ে যায়। নিরাকার কি দর্শন হয় না—হয়,

কিন্তু বিষয়বুদ্ধি এতটুকু থাকলে আর হবে না। দেখ দেখি, বাইরে কেমন দর্শন করছ আর আনন্দ পাচ্ছ।'

সুরেন কারণ পান করে। একবার গিরিশ ঘোষ বসেছিল সামনে। তাকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর বললেন সুরেনকে : 'তুমি আর কি! ইনি তোমার চেয়ে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সুরেন বললে হাসতে-হাসতে, 'ইনি আমার বড় দাদা!'

কারণ খেয়ে কি হবে? কারণানন্দদায়িনীর করুণাসুধা পান করো। সহজানন্দ হয়ে যাও।

'তুমি কারণ খেয়েছ?' বলতে-বলতেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট।

প্রতিমার সামনে প্রণাম করলেন ঠাকুর। এবার যাবেন দক্ষিণেশ্বর। হাঁক দিলেন : 'ও—রা, জু—আ?'

অর্থাৎ, ও রাখাল, জুতো আছে, না হারিয়ে গেছে?
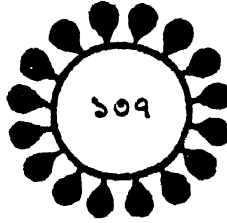
গোপালের মা ভাত রাঁধছে ঠাকুরের জন্যে। সব তৈরি, খেতে বসেছেন ঠাকুর। কিন্তু এ কি, ভাতগুলি যে শক্ত, সেদ্ধ হয়নি ভালো করে। ঠাকুর বিরক্ত মুখে বললেন, 'এ ভাত কি আমি খেতে পারি? ওর হাতে ভাত আর আমি কখনো খাব না।'

এ কখনো হতে পারে? গোপালের মা যার তিনি অঞ্চলের নিধি, যার তিনি অন্ধের নড়ি, কাঙালের কড়ি, তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? এ নিশ্চয়ই অভিমানের কথা, হয়তো বা ভয় দেখানো। ভবিষ্যতে সাবধান হোয়ো, মনোযোগী হোয়ো, তারই শাসনউচ্চারণ। দেখবে, এখুনিই মেঘ কেটে যাবে, ধুয়ে যাবে অভিমান, গোপালের মাকে ডেকে এনে করবেন কত স্নেহ-সমাদর, আবার রাঁধতে বলবেন আরেকদিন।

কিন্তু, না, অক্ষরে-অক্ষরে ফলল। কদিন পরেই অসুখ হল ঠাকুরের। দেখতে-দেখতে বেড়ে গেল অসুখ। বন্ধ হল ভাত খাওয়া। গোপালের মা'র হাতে ভাত খাওয়া ঘুচে গেল এবারের মত।

'আজ বিকেলে একবার যদু মল্লিকের বাগানে যাব।' এক ভক্তকে একদিন বললেন ঠাকুর।

কিন্তু সেদিনই দক্ষিণেশ্বরে বহু লোকের সমাগম। সারা দিন কেবল কথা আর কথা। আর সব প্রসঙ্গের শেষ আছে ঈশ্বর প্রসঙ্গের শেষ নেই। আর সব কথা বলতে

ক্লান্তি শুনতে ক্লান্তি কিন্তু ঈশ্বরকথা যে বলে যে শোনে দুই-ই অফুরন্ত। অনেক রাত্রে, যখন সবাই বিদায় হয়ে গিয়েছে, যদু মল্লিকের বাগানে যাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। আর কি স্থির থাকা যায়! তখুনি উঠে পড়লেন, চললেন হন-হন করে। ও কি, কোথায় যাচ্ছেন? যদু মল্লিকের বাগান। সে কি, এত রাতে, এই অন্ধকারে! তা হোক, বারণ শুনলেন না কারু, সটান এগিয়ে চললেন। কিন্তু যাবেন কোথায়, বাগানের গেট বন্ধ। তাতে কি, দমবার পাত্র নন ঠাকুর। বাক্য যখন একবার উচ্চারণ করেছেন তখন সত্য পালন করতেই হবে। দারোয়ানকে ডাকলেন। বললেন, গেট খুলে দাও। দারোয়ান গেট খুলে দিল। তখন বাগানের মধ্যে খানিক পাইচারি করে সুস্থির হলেন।

সুরেন মিত্তিরের বাগান থেকে ফিরছেন ঠাকুর, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমি তখন নুচি খাইনি, আমাকে একটু নুচি এনে দাও।'

লুচির থালা নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। একটু কণিকামাত্র ভেঙে মুখে দিলেন। বললেন, 'এর অনেক মানে আছে। নুচি খাইনি মনে হলে আবার ইচ্ছে হবে। হয়তো আবার আসতে হবে এখানে।'

মণি মল্লিক হেসে বললে, 'বেশ তো সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও আসতাম।'

'দেখ রাখাল বলছিল ওদের দেশে বড় জলকষ্ট।' একদিন বললেন মণি মল্লিককে : 'তুমি সেখানে একটা পুকুর কাটিয়ে দাও না কেন! কত লোকের উপকার হয়। তোমার তো অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনি তুমি নাকি বড় হিসেবী।'

বরানগরে বাগান আছে মণিলালের। সিঁদুরেপটি থেকে প্রায়ই সেখানে আসে আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে দেখে যায়। সারা পথই কি আর গাড়িভাড়া করে আসে? ট্রামে করে প্রথমে শোভাবাজার, সেখান থেকে শেয়ারের গাড়িতে বরানগর। আর বাকি পথটা কখনো পায়ে হেঁটে। অথচ অঢেল পয়সা।

পয়সার প্রতি যে টান সে টান দিতে পারো ঈশ্বরকে? কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর টান। ঠাকুর বললেন, 'তোরা আর কিছু নিস বা না নিস কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর টানটুকু নে।'

হেসে বললেন, 'টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছে করে।'

'টাকা বার করতেই অনেক হিসেব।' বললে মাস্টার : 'তবে ঐ যে বলছিলেন ত্রিগুণাতীত হয়ে সংসারে থাকা—'

'হ্যাঁ, বালকের মত।' ঠাকুর আরো সহজ করে দিলেন।

'কিন্তু বড় কঠিন। সহজ হওয়াই শক্তিমানের তপস্যা।'

স্বভাবকে লাভ মানেই সহজকে লাভ। নেব—এটা স্বভাব নয়, দেব—এটাই স্বভাব। মেঘ জল দেয়, বৃক্ষ ফল দেয়, আগুন আলো দেয়। চারদিকেই এই দেওয়ার দেওয়ালী। বিনা কারণে উৎসর্গের উৎসব। আমার চারদিকে এই উৎসব, আর আমি ম্লান স্তব্ধ ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে থাকব? আমিও মাতব এই উৎসবে। দায় নেই দান বাধ্যতা নেই বিতরণ—সেই আনন্দযজ্ঞে। আর কাউকে কিছু দিইনি, তোমাকে সর্বস্ব দিয়ে

যাব। মৃত্যু দিয়ে তৈরি তুচ্ছ উপকরণ নয়, অমৃত দিয়ে ভরা আত্মার উপঢৌকন। শুধু ধূমায়িত হব, একবারও প্রজ্বলিত হতে পারব না, এই কলঙ্ক থেকে আমাকে ত্রাণ করো। জ্বালাহীন তুষানলের মত আমাকে অবসাদধূমে আচ্ছন্ন রেখো না। আমাকে একবার তোমার জন্যে দীপ্ত হয়ে ওঠবার তেজ দাও। ত্যাগই আমার তেজ, বিসর্জনই আমার জীবনালোক।

প্রভু, আমার দোষ আর ধোরো না। তোমার তো সমদর্শন, যদি আর-কাউকে পার করে দিয়ে থাকো, দয়া করে আমাকেও পার করে নাও। তোমার খুশি তা জানি। কিন্তু আমার খুশির জন্যে তুমি একটু খুশি হতে পারো না? পূজার ঘরের ফল-কাটার যে বঁটি আর কসাইয়ের হাতে যে হিংসার খড়্গ দুই-ই এক লোহার তৈরি। কিন্তু স্পর্শমণির অন্তরে তো দ্বিধা নেই, সে ভালো-মন্দ দুটো অস্ত্রকেই সোনা করে। একই জল, নদীতে তা স্বচ্ছ নালায় তা মলিন, অপবিত্র, কিন্তু দুই-ই গঙ্গায় এসে পড়ে স্বচ্ছন্দে এবং গঙ্গায় পড়ে একই রঙে রঙিন হয়। যেমন গঙ্গার বর্ণ তেমনি ঐ নদী-নালার। তেমনি আমাকে যদি টেনে নাও তোমার মধ্যে, হই না কেন অস্বচ্ছ-অপরিচ্ছন্ন, ঠিক তোমার বর্ণে বর্ণায়িত হব। তবে কেন দয়া করবে না? কেন হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে না বলহীনকে?

আমি শুকনো মাঠ, আমার পাশেই তুমি রয়েছ জলাশয়। আগের থেকেই রয়েছ। আমার সেচের জল, আর্দ্রীকরণ উর্বরীকরণের জল। শুধু আমি অহঙ্কারের আল-বেঁধে রেখেছি বলেই তুমি ঢুকতে পারছ না। নইলে কবে ভেসে যেতাম স্নেহসিঞ্চনে, অকৃপণ ফসল ফলাতাম। তুমি এত কিছু ভেঙে-চুরে ফেলছ, আমার এই সামান্য মৃত্তিকার আল ভূমিসাৎ করতে পারো না?

এই মণি মল্লিকের বাড়িতেই, ৮১ সিঁদুরেপটি, একবার নাচলেন ঠাকুর। শুধু নিজে নাচলেন না, সকলকে নাচিয়ে ছাড়লেন। শুধু ভক্তদের নয়, যারা দেখছিল তাদেরও। আপনি মেতে জগৎ মাতায়। আপনি হেসে জগৎ হাসায়। আর সঙ্গে চিরঞ্জীব শর্মার গান, 'নাচ রে আনন্দময়ীর ছেলে'—বাম বাহু তুলে ও দক্ষিণ ভুজ কুঞ্চিত করে, বাম পা আগে ও ডান পা পিছনে রেখে ঠাকুরের সেই ভুবনস্পন্দন নাচ। এ যেন সেই 'পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।' বিশ্বতনুতে অণুতে-অণুতে যে নৃত্য চলেছে তারই স্বতোৎসার।

এই মণি মল্লিকের বিধবা মেয়ে নন্দিনী। আমাকে ইষ্টদর্শন করিয়ে দিন এই আকুল প্রার্থনা নিয়ে একদিন প্রভুর পায়ে এসে পড়ল।

'ইষ্ট? ইষ্টকে দেখতে চাও?' যেন কত সহজ এমনি নিশ্চয়ভরা চোখে তাকালেন ঠাকুর।

'হ্যাঁ, দিন দেখিয়ে।'

'বাড়িতে কোন ছেলেটিকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসো?'

'আমার ছোট্ট একটি ভাইপো আছে—তাকে।'

'তবে আর কি। পেয়ে গেছ তোমার ইষ্ট। ঐ ছোট্ট ভাইপোকেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভেবে সেবা করো।'

ভেবেছিল ঐ আঁচলধরা অনুরক্ত ছেলেটাই জীবনের বন্ধন। ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন আসলে ঐটেই মুক্তি। যেখানে বন্ধন সেখানেই মুক্তি। তোমার স্বভাবই তোমার আসন; তোমার প্রবণতাই তোমার ধ্যান। প্রাণ যা চায় তাই ঈশ্বর। সব পেলেও আবার যা চায় তাই ঈশ্বর।

ঈশ্বর আমাদের ফাউ। বাঁধাবরাদ্দের উপর উপরি-পাওনা। সমস্ত প্রাপ্তির পরিধির বাইরে মহত্তম উদ্‌বৃত্ত।

ওগো আমার একটু পালো-দেওয়া ক্ষীর খেতে ইচ্ছে করছে। কলকাতার নেমন্তন্ন বাড়িতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি। ডাক্তারদের একটু জিগগেস করো না খাওয়া চলবে কি না।

ডাক্তারদের আপত্তি নেই।

যোগীন গেল সেই ক্ষীর কিনতে। পথে যেতে-যেতে ভাবনা ধরল, বাজারের ক্ষীর খাওয়া কি ঠাকুরের পক্ষে ভালো হবে? বাজারের ক্ষীরে তো শুধু পালো নয় রয়েছে আরো কত কি ভেজাল কে জানে! তার চেয়ে কোনো ভক্তের বাড়িতে বলে সেখান থেকে ক্ষীর তৈরি করে নিই গে। কে জানে সেইটেই বা ঠাকুরের মনঃপূত হবে কিনা। তেমন কথা তো কিছু বলে দেননি ঠাকুর।

সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে চলে এল সে বলরাম বাবুর বাড়ি। এখন বলুন দেখি কি করি।

বাজারের কেনা জিনিস ঠাকুরকে খাওয়াবে, তুমি পাগল হয়েছ? বাড়িতে তৈরি করে দিচ্ছি। কিন্তু সকাল বেলাতেই তো হবে না। তুমি এ বেলা এখানে থাকো, খাওয়া-দাওয়া করো, পরে বিকেলে নিয়ে যেও তৈরি ক্ষীর। ঠাকুর খুশি হবেন ক্ষীর দেখলে।

তথাস্তু। ক্ষীর নিয়ে কাশীপুর পৌঁছুতে বিকেল চারটে।

দুপুরে খাওয়ার সময় ঠাকুর অনেকক্ষণ বসে ছিলেন ক্ষীরের জন্যে। এই আসে এই আসে করে মুহূর্ত গুণেছেন। বরাদ্দ সময় পার হয়ে গেল তবু দেখা নেই। তখন আর কি করা, রোজ যা দিয়ে খান তাই দিয়ে খেলেন শুকনো মুখে।

'কি রে এত দেরি হল কেন?'

'জ্বাল দিয়ে আনলুম বলরাম বাবুর বাড়ি থেকে।'

'তোর কি বুদ্ধি! তোকে কি তাই আমি আনতে বলেছিলুম!'

যোগীন তাকিয়ে রইল অপরাধীর মত।

'আমি তোকে বলেছিলুম, বাজারের ক্ষীর খাবার ইচ্ছে হয়েছে, বাজার থেকে কিনে আন। ভক্তদের বাড়িতে গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে তৈরি করে আনবার কি হয়েছিল?'

'বাজারের ক্ষীর খেলে আপনার অসুখ বাড়বে মনে করে—'

'আর এ খেলে বাড়বে না? দেখেছিস কেমন ঘন গুরুপাক ক্ষীর।'

অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল যোগীন।

যেমনটি বলে দিয়েছি তেমনটি করবি। যা করবি বলে বেরিয়েছিলি তার থেকে বিচ্যুত হবি না। সম্পূর্ণ করাই সম্পন্ন করা। ঠিক-ঠিক কথা ঠিক-ঠিক কাজ।

'এ ক্ষীর আমি খাব না।' বলে পাঠালেন শ্রীমাকে।
কিন্তু কত কষ্ট করে ভক্ত তৈরি করেছে, কত কষ্ট করে বহন করে এনেছে আরেকজন। সব তো তাঁরই নিবেদনে। তিনি যদি একটুও মুখে না দেন তা হলে কি করে চলে। 'সমস্তটা ক্ষীর যেন গোপালের মাকে খাওয়ানো হয়। হ্যাঁ, গোপালের মাকে। ভক্তের দেওয়া জিনিস ফেলা চলবে না। ওর মধ্যেই গোপাল আছে। ওর খাওয়াতেই আমার খাওয়া।'
সাধন আর কি? সহজ সাধন। সেই যা পড়েছিলে ছেলেবেলায় : 'সদা সত্য কথা কহিবে।' এ তো তোমার নিজের আয়ত্তের মধ্যে, এর জন্যে তো কোনো দৌড়-ঝাঁপের দরকার নেই, কোনো কাঠ-খড়ও পোড়াতে হবে না। সহজ সংসারে চলো-ফেরো আর সত্য কথাকে আঁট করে ধরে থাকো। কি হয়েছে, কি দেখেছ, কি করেছ, সব ঠিক-ঠিক বলো। এর জন্যে তো শাস্ত্র পড়তে হবে না, করতে হবে না যাগ-যজ্ঞ, যেতে হবে না তীর্থে স্নানে। শুধু সত্যবাদী হও। হও রৌদ্রে নিষ্কাশিত জ্বলন্ত তরবারি।
'যারা বিষয় কর্ম করে, আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত।'
সত্যই সাহস। সত্যই ঔজ্জ্বল্য। সত্যই পবিত্রতা।
সামান্য-সাধারণ কথায় সামান্য-সাধারণ আচরণে সত্যকে ধীরে-ধীরে আরোপ করো জীবনে। দেখবে কত বড় প্রচণ্ড শক্তির আধার হয়ে উঠেছ। রক্তের মধ্যে বিদ্যুদগ্নি বয়ে চলেছে। দেখছ পথ রোধ করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। তোমার সত্যময় জীবন সে পাহাড়কে প্রশস্ত রাজপথে পরিণত করবে।
'মাকে সব দিলুম কিন্তু সত্য দিতে পারলুম না।' বললেন ঠাকুর। 'সত্যতে থাকবে তা হলেই ঈশ্বরলাভ।'
কথা একটু কম কও। দয়া করো, একটু চুপ করে থাকো। চুপ করে থেকে অন্যের কথা শোনো। অন্য আর কোথায়। তোমার অন্তরতম। তুমি চুপ করলেই তার কথা শুনতে পাবে। শুনতে পাবে সেই গভীর গুঞ্জন।
চুপ করে থাকলে অন্তত মিথ্যে বলার হাত থেকে রেহাই পাবে। চুপ করলেই বন্ধ হবে সব ইন্দ্রিয়ের হট্টগোল। হবে পাহাড়ে বেড়ানো, হবে সমুদ্রস্নান। অনুভব করবে সব প্রবাহই জাহ্নবী, সব স্বরূপই সমুদ্র। অন্তরক্ষেত্রে কোথায় সুপ্ত শক্তির বীজটি পড়ে আছে, কুড়িয়ে পাবে। মৌনের আকাশে বহুবিততশাখায় প্রসারিত হবে সে বনস্পতি। নিজেকে নিজে আবিষ্কার করবে, হবে নিজের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অণীয়ান ও মহীয়ানকে দেখবে একসঙ্গে।
আর কিছু না পারো নির্জন পথে একা-একা হাঁটো! চুপ করে থাকো।
আর যদি কথাই কইবে, সকালে-বিকেলে হরিবোল বলো। হাততালি দাও আর হরিনাম করো।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, কথকতা করে, এসেছে ঠাকুরের কাছে। সাতাশ-আটাশ বয়স, কি নাম কে জানে, সবাই ঠাকুরদাদা বলে ডাকে। সংসার ঘাড়ে পড়েছে তাই বৈরাগ্য নিয়ে উধাও। কিন্তু মন টিকল না, আবার ফিরে এসেছে স্বস্থানে। তার মাটির কেল্লায়।

'কোত্থেকে আসছ? জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'আজ্ঞে বরানগর থেকে।'
'পায়ে হেঁটে?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
'এখানে কি দরকার?'
'আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। একটা কথা আপনাকে জিগগেস করব।'
'করো।'
'তাঁকে ডাকি অথচ মনে অশান্তি কেন? দু-চার দিন বেশ আনন্দে থাকি, তারপর আবার অশান্তি।'
'বুঝেছি।' বললেন ঠাকুর, 'ঠিক পড়ছে না। কারিকর দাঁতে-দাঁত বসিয়ে দেয়। ঠিক পড়ছে না। কোথায় একটু আটকে আছে।'
কি সুন্দর করে বললেন। দাঁতে-দাঁত বসছে না। কারিকরের হাতেই সে কারসাজি। একটুখানি সরিয়ে দাও একটুখানি বেঁকিয়ে দাও, ঠিক খাঁজে-খাঁজে লেগে যাবে। তখন জলের মত চলে যাবে ক্ষুর। তখনই সর্বশান্তি।
গঙ্গাই শুধু সমুদ্রকে চায় না, সমুদ্রেরও গঙ্গা ছাড়া গতি নেই। 'সাগরাদনপগা হি জাহ্নবী, সোঽপি তন্মুখরসৈকনির্বৃতিঃ।' গঙ্গা সমুদ্র ছেড়ে অন্যত্র যায় না, তেমনি সমুদ্রও গঙ্গার মুখরসেই আনন্দ লাভ করে।
'মন্ত্র নিয়েছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
'মন্ত্রে বিশ্বাস আছে?'
এইবার মুখে আর কথা নেই ঠাকুরদাদার। তবেই বুঝতে পারছ, কেন বসছে না দাঁতে-দাঁত। মন্ত্রের কাছেই ত্রাণ খোঁজো। নামের কাছেই প্রেম চাও। অভ্যাসের থেকেই নিংড়ে নাও অনুরাগ। অনুরাগকে দৃঢ় করো, প্রগাঢ় করো। তখনই দেখা দেবে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য তো নঙর্থক নয়, নেতিবাচক নয়। বৈরাগ্য সদর্থক, অস্তিবাচক। বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে নিবিড়ানুরাগ।
মর্কট-বৈরাগ্য নয়, তীব্র বৈরাগ্য আনো। আসক্তির চেয়েও তা বড় শক্তি। আস্পৃহার চেয়েও তা তীক্ষ্ণতর আকর্ষণ।
'জানো না বুঝি, সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া পরে কাশী গেল।' বললেন ঠাকুর। 'অনেক দিন খবর নেই। তারপর বাড়িতে একখানা চিঠি এল। লিখেছে তোমরা ভেবো না, আমার এখানে একটি কাজ হয়েছে।'
সবাই হেসে উঠল।
ঠাকুর বললেন, 'তুমি একটা গান ধরো।'
ঠাকুরদাদা গান ধরলেন। তন্ময় হয়ে শুনলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার মধ্যে গান আছে, তবে আর কি। ঐ গান ধরেই এগোও ঈশ্বরের দিকে। সংসারে থাকতে গেলেই জ্বালা, হয়তো মাগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলেকে পড়াতে পারছে না, বাড়ি ভাঙা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, মেরামতের টাকা নেই। তবু থাকো, থাকো সংসারে।

কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করো। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলেই বেশি বিপদ, সোজা গায়ের উপরেই গোলাগুলি এসে পড়ে।'
'সংসার ত্যাগের দরকার নেই?'
'কি দরকার! সাধুদের কত কষ্ট! সংসার ত্যাগ করতে যাচ্ছে একজন, তার স্ত্রী বললেন, কোন সুখে চলেছ গৃহ ছেড়ে? এই এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ এই তো আরাম, মিছিমিছি কেন আট ঘর ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে?'
'তা হলে এখন আমি কি করব?' কাতর হয়ে প্রশ্ন করলেন ঠাকুরদাদা।
'হাততালি দিয়ে সকালে-বিকালে হরিনাম করবে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলবে।''
আর, বলি আরো একটি সহজ কথা, সত্য কথা বলবে। থাকবে সত্যকে আশ্রয় করে।
সেই শুষনি শাক তোলার ঘটনাটা মনে করো। চার-চার মেয়ের মধ্যে বিষয়-আশয় সব ভাগ করে দিয়েছেন রাসমণি। যে পুকুরটা দ্বিতীয় মেয়ের ভাগে পড়েছে তাতে সেজগিন্নি স্নান করতে নেমেছে। সুন্দর শুষনি শাক হয়েছে পুকুরে। আঁচলে করে কিছু শুষনি শাক তুলে নিয়ে গেল সেজগিন্নি। সমস্ত ব্যাপারটা ঠাকুরের চোখে পড়ল। স্নান করতে এসেছিস স্নান করে যা, তা নয়, পরের পুকুরের শাক তুলে নিচ্ছিস। পরের জিনিস না বলে নিলে চুরি করা হল না? কি দরকার ছিল পরের জিনিসে লোভ করে?
বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন ঠাকুর। দ্বিতীয় মেয়েকে ডাকিয়ে আনলেন। সব কথা খুলে বললেন তাকে। এমন গম্ভীর মুখ করে বললেন, সত্যি যেন সেজগিন্নির অন্যায়ের অবধি নেই। হাসতে লাগল দ্বিতীয়া। রঙ্গ করে বললে, 'তাই তো, বড় অন্যায় করেছে সেজ। এ চুরি ছাড়া আর কি।' সেজগিন্নিও তখন সেখানে এসে উপস্থিত। সেও হাসতে লাগল। বললে, 'কত কষ্ট করে শাকগুলি তুলে নিয়ে এলুম লুকিয়ে, আর তুমি কি না তাই বলে দিলে!' 'কি জানি বাপু,' ঠাকুর গম্ভীর মুখে বললেন, 'বিষয় সম্পত্তি সব ভাগ-যোগ হয়ে গিয়েছে তখন পরেরটা না বলে নেওয়া কেন? তাই ভাবলুম যার জিনিস গেছে তাকে বলে দি, সে একটা বোঝাপড়া করে নিক।'
দু বোনে আরো হাসতে লাগল।
সব মাকে দিয়েছি, সত্য দিতে পারিনি।
একদিন হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে বলে ফেললেন ভাবাবস্থায়, 'এর পরে আর কিছু খাব না, কেবল পায়সান্ন, কেবল পায়সান্ন।'
তখন ঠাকুরের অসুখ নেই, যথাবিধি খাচ্ছেন ঝোল-ভাত। হঠাৎ এমন কথা কেন বলে বসলেন, শ্রীশ্রীমা'র বুকের মধ্যিখানটা শিউরে উঠল। তিনি বললেন, 'তা কেন? আমি তোমাকে মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেব।'
'না, না, পায়সান্ন খাব আমি।'
কিছুদিন পরেই ঠাকুর অসুখে পড়লেন। তখন ক্রমে-ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল ঝোল-ভাত। তখন শুধু মণ্ড আর দুধ, নয়তো স্রেফ দুধ-বার্লি।
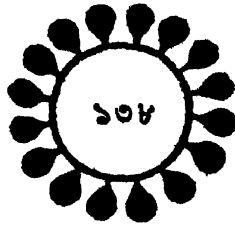
গিরিশ নিমন্ত্রণ করেছে ঠাকুরকে, যেতেই হবে তার বাড়ি।

বলরামের বাড়িতে আছেন, রাত প্রায় নটা হল, উঠে পড়লেন ঠাকুর। ওরে গিরিশের বাড়ি যাব। নেমন্তন্ন করে গিয়েছে। হ্যাঁ, এই রাত্রেই যেতে হবে।

আহা, কি সব গান বেঁধেছে বলো দেখি। কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী। যার ভেতরে এই সব গান এত সজীব অনুরাগ তার ডাকে কি সাড়া না দিয়ে পারি?

সেদিন ঠাকুরকে বললে গিরিশ, 'মশাই ছেলেবেলায় আমি কিছু লেখাপড়া করিনি তবু লোকে বলে বিদ্বান—'

বই-শাস্ত্র একটা উপায় মাত্র। ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন, 'আসল হচ্ছে খবর সব জেনে নিয়ে নিজেই কাজ আরম্ভ করে দাও।'

নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করো। সেই তো স্বাধীনতার অর্থ। নিজের ঘরে নিজের দেহের মধ্যে নিজের জীবনের মধ্যে কাজ করো। দেখাও তোমার বীরত্ব, তোমার পুরুষকার। তুমি স্বাধীন হয়েছ বুঝব কিসে যদি তুমি এখনও ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে বাস করো। শুধু পড়ে কি হবে কাজ করে দেখাও, তুমি কত বড় কারু, কত বড় শিল্পী।

'শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে?' বললেন ঠাকুর, 'অনেক শ্লোক অনেক শাস্ত্র মুখস্ত কিন্তু মন রয়েছে টাকা আর দেহসুখের দিকে। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে। শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় মরা জানোয়ার।'

বই-শাস্ত্র দেখ। পথ-পদ্ধতি জেনে নাও। তারপর বই বন্ধ করে দিয়ে বাজার করতে বেরোও। যে বাজারে আসল বস্তুলাভ।

কাজ করো। সাধন করো।

'বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি, কত কঠোর সাধন।' বলছেন ঠাকুর, 'গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে। চক্ষের জলে গা ভেসে যেত।'

'আর সকলের ধারণা, এক মুহূর্তে সব হয়ে যাবে।' মাস্টার টিপ্পনি কাটল : 'বাড়ির চারদিকে আঙুল ঘুরিয়ে দিলেই যেন দেয়াল হল।'

কি অবস্থাই গিয়েছে! কুমার সিং সাধু-ভোজন করাবে, নেমন্তন্ন করলে রামকৃষ্ণকে। অনেক সাধুর ভিড়, পঙক্তি করে বসেছে সবাই। রামকৃষ্ণও বসল এক পাশে। কেউ-কেউ পরিচয় জিগগেস করল, এ কে, কোন মতের, কই আগে তো কখনো দেখিনি। অত খবরে কাজ কি। রামকৃষ্ণ আলাদা হয়ে সরে বসল। যেই পাতায় খাবার দিল,

কারু দিকে না চেয়ে কারু জন্যে অপেক্ষা না করে সরাসরি খেতে শুরু করে দিলে। যেন অভব্য কিছু একটা করছে এমনি অবাক হবার ভাব করে কেউ-কেউ বলে উঠল : এ কেয়া রে!

এ অনন্যসাধারণ! নিজের ঢাক পিটতে রাজী নয়, একেবারে নিরহঙ্কার। পাতে খাবার পড়লে এক মুহূর্ত দেরি করতে রাজী নয়, এমনি তার সত্যপথাশ্রিত সরলতা।

রাত নটা, উঠে পড়লেন ঠাকুর।

সে কি, আপনার জন্যে খাবার তৈরি করেছি যে। বলরাম আপত্তি করল।

তাও তো ঠিক। খেয়ে না গেলে বলরাম যে কষ্ট পাবে—আবার ওদিকে গিরিশের ডাক, দেরি করবার উপায় নেই। তখন উপায়কুশল বললেন, এক কাজ করো, খাবারটা দিয়ে দাও সঙ্গে।

বোস পাড়ার তেমাথা পার হচ্ছেন, কাছেই গিরিশের বাড়ি, প্রায় ছুটে চলেছেন। পথ-টুকু পার হতেও যেন তর সইছে না।

কিন্তু এ কে, সহসা এ কে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল!

আর কে! আপনার সেই লোচনলোভনীয়! যার নাম বলতে আপনি পাগল! সেই ইন্দ্রপ্রতিম নরেন্দ্র।

পলক ফেলতে পারছেন না ঠাকুর। যেন 'পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।' কথা সরছে না মুখ দিয়ে। এরই নাম বোধ হয় ভাব। পরম প্রাপনীয়কে পেয়েও অপ্রবৃত্তি। অণুমাত্র প্রাণপবনস্পন্দেই যেন মহীয়ান স্বরূপানন্দ!

চলে গেলেন পাশ কাটিয়ে। গিরিশের ঠিক বাড়ির সমুখে আবার দেখা হল। তখন দিব্যি সহজ স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'ভালো আছ তো বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারিনি।'

একজন একটা কুয়ো খুঁড়তে আরম্ভ করল। কিছুটা খোঁড়ার পর একজন এসে বললে, এখানে খুঁড়ে কোনো লাভ নেই। নিচে কেবল শুকনো বালির স্তূপ। লোকটা জায়গা বদলালো। খানিক দূর খুঁড়েছে, আরেকজন এসে বললে, কেন পণ্ডশ্রম করছ, এখানটায় বোদা জল। আবার পিছু সরল। তোমার সময় আর পয়সার কি দাম নেই? নইলে এমন কাঁকুরে জায়গায় কি কেউ মাটি খোঁড়ে? দক্ষিণে যাও, সেখানেই মিলবে তোমার মিষ্টি জলের ঝরনা। বললে আরেকজন। হায়, দক্ষিণে এসেও আবার প্রতিবন্ধ। কি করেছেন মশাই, উত্তর ছেড়ে কি কেউ দক্ষিণে আসে?

কুয়ো খোঁড়া ভুয়ো হয়ে গেল।

কিন্তু নরেনের স্থানবদল নেই। দৃঢ় প্রত্যয়ই তার খননাস্ত্র। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই খুঁড়ছে। হোক তা রুক্ষরুক্ষ, হোক তা প্রস্তরকঙ্করাকীর্ণ, সেখান থেকেই উদ্ধার করবে সে তৃষ্ণার পানীয়। জলও আমার মধ্যে, অস্ত্রও আমার হাতে—আমাকে আর পায় কে! আমিই আত্মদীপ, আমিই জগদ্ভাতি সূর্য। গজেন্দ্র-বিক্রম আয়তবাহু মহাবীর। আকাশ পতিত, হিমাচল বিশীর্ণ, সমুদ্র শুষ্ক ও ভূমণ্ডল খণ্ড-খণ্ড হলেও উঠব না আমার ব্রতাসন থেকে। আত্মোদ্ধার করব, করব আত্মোদ্ঘাটন।

কিন্তু অবতার মানতে সে রাজী নয়। এদিকে গিরিশ অবতারবাদে নিদারুণ বিশ্বাসী। 'তোমরা দুজনে একটু এ নিয়ে বিচার করো না।' গিরিশের বাড়ি এসে বললেন ঠাকুর : 'একটু ইংরিজিতে তর্ক করো। আমি শুনি।'

বাঙলাতেই কথা হল, মাঝে-মাঝে ইংরেজির ছিটেগুলি।

'ঈশ্বর সকলের মধ্যেই আছেন।' বললে নরেন, 'শুধু একজনের মধ্যেই এসেছেন এ কখনো হতে পারে না।'

'আমারো সেই মত।' নরেনের কথায় সায় দিলেন ঠাকুর। 'তবে একটা কথা আছে। কোনো আধারে শক্তি বেশি কোনো আধারে শক্তি কম। কেউ গেড়ে পুষ্করিণী কেউ বা সায়র দীঘি। কেউ কুঁজো-কলসী কেউ বা জালা। যেখানে যত বেশি শক্তি সেখানে তত বেশি ভগবত্তা।'

গিরিশ নরেনকে লক্ষ্য করে বললে, 'তুমি কি করে জানলে তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না?'

'তিনি মনোবাক্যবুদ্ধির অগোচর। তিনি আবার একটা সীমাবদ্ধ জীব হবেন কি করে?'

হলে ভগবানের খুব ক্ষতি হয়ে যায়, তাই না? তাঁর পূর্ণতা, তাঁর অনন্ত শক্তিমত্তা, তাঁর সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপিতা বাধিত হয়? কখনোই না। জীবের প্রতি অনুগ্রহই তাঁর শরীর গ্রহণের মুখ্য কারণ।

'অবতার না হলে কে বুঝিয়ে দেবে?' বললে গিরিশ : 'মানুষকে জ্ঞানভক্তি দেবার জন্যেই তাঁর দেহধারণ। না হলে শিক্ষা দেবে কে?'

'কেন, অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।' নরেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

নরেনকে আবার সায় করলেন ঠাকুর। 'হ্যাঁ, নইলে তিনি অন্তর্যামী কেন?'

'তুমি তাঁর অচিন্ত্যশক্তির কি জানো?' এবার গিরিশ উঠল লাফিয়ে।

দুই সাধু বসে আছে গাছতলায়, সেখান দিয়ে নারদ চলেছেন বীণা বাজিয়ে। প্রভু, কোত্থেকে আসছেন, একজন জিগগেস করলে। বৈকুণ্ঠ থেকে আসছি। বৈকুণ্ঠ থেকে? ভগবান সেখানে এখন কি করছেন দেখে এলেন? নারদ বললে, ছুঁচের ছ্যাঁদার মধ্য দিয়ে হাতি-উট এধার-ওধার করছেন। তা আর তাঁর পক্ষে আশ্চর্য কি! তিনি সব করতে পারেন। বললে এক সাধু। অন্যজন বললে, গাঁজাখুরি! ছুঁচের ছ্যাঁদায় হাতি-উট গলানো স্রেফ আষাঢ়ে গল্প। নারদকে বললে, আপনি কোনো কালে বৈকুণ্ঠে যাননি মশাই।

তিনি সূর্য-চন্দ্র করতে পারবেন, সৃষ্টি-প্রলয় করতে পারবেন, শুধু একটা মানুষের ছদ্মবেশে ভূতলে অবতীর্ণ হতে পারবেন না! যেন ওটিই তাঁর হতে বারণ, আর যা তিনি হোন না করুন না। কিছু বাদ দিয়ে কিছু কেটে-ছেঁটে ছোট করে ঈশ্বরকে নেব কেন? তিনি যদি সব হতে পারেন অবতারও হতে পারবেন।

লেগে গেল তুমুল তর্ক।

শেষকালে ঠাকুর শান্তিবারি সেচন করলেন। বললেন, 'তিনি যদি দেখিয়ে দেন এর নাম অবতার, তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন তা হলে আর কাউকে

বুঝিয়ে দিতে হয় না। যেমন অন্ধকারের মধ্যে দেশলাই ঘষতে-ঘষতে দপ করে আলো হয়। সেই রকম দপ করে আলো যদি তিনি জেবলে দেন তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়, তা নইলে নয়।'

'ও ভাই হরিপদ, একটা গাড়ি ডেকে আন।' বলে উঠল গিরিশ, 'আমাকে এক্ষুনি থিয়েটারে যেতে হবে।'

'সে কি, এত রাতে?'

'উপায় নেই। কর্মবন্ধন।' গিরিশের মুখে কাতরতা ফুটে উঠল। 'এদিকে আপনি এখানে বসে, আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে থিয়েটার।'

ধিক্কার দেবার মতন ব্যাপার। কিন্তু ঠাকুর উদার প্রসন্নতায় বললেন, 'তা ঠিক আছে। এদিক-ওদিক দুদিক রাখতে হবে। জনক রাজার মত। এ-দিক ও-দিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

'একেকবার মনে হয় থিয়েটারটা ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই। ছুটি নিই ছোটাছুটি থেকে।'

'না, না, ও বেশ আছে।' ঠাকুর আবার অভয় দিলেন : 'লোকশিক্ষা হচ্ছে। অনেকের উপকার হচ্ছে।'

কিন্তু নরেনের সইল না। বিদ্রূপ করে উঠল। 'এদিকে বলছে ঈশ্বর, অবতার, আবার ওদিকে থিয়েটারে টানছে।'

'আমি কি করব, আমি পাপী, ঘোরতর পাপী—'

পাপী? এবার ঠাকুর উঠলেন হুঙ্কার দিয়ে। খবরদার, ও কথা মুখে আনবিনে। বারে-বারে পাপী-পাপী বললে পাপীই হয়ে যেতে হয়। বল আমি মায়ের ছেলে। মায়ের ছেলের আবার পাপ কি! সব ধুলো-কাদা মুছে যদি কোলে তুলে না নেবেন তবে আবার তিনি কেমন মা!

আমি পুরুষ। বীর্যস্বরূপের অনন্ত বীর্য আমার মধ্যে বর্তমান। আমি স্বস্বরূপ-বিশ্বাসী। আমি শৃগালের শিশু নই, আমি সিংহের কুমার। আমি অনন্ত শক্তির আধার, আমি দ্বিবাহু হয়েও বহুবাহু। বলো আমি দুর্বল নই, অধম নই, পাপী নই, দীন-হীন নই, আমি অকল্মষ, আমি অপাপবিদ্ধ, আমি বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির পুত্র। বারে-বারে এই মন্ত্র জপ করলেই ভগবৎশক্তি শতসর্পগর্জনে জেগে উঠবে। যে নিজেকে বলে ভীরু, কাপুরুষ, দাসত্বসেবী তার মুক্তি কোথায়? দৃঢ়ধন্বা অর্জুন হও, পাবে তবে সেই যোগেশ্বর কৃষ্ণের বন্ধুতা।

'আজ ওই শুভ্র কোলের তরে, ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে, দিয়ো না গো দিয়ো না আর ধুলায় শুতে।' তোমার কোল যতই শুভ্র হোক, আর আমার সর্ব অঙ্গে যতই মালিন্য থাক, তুমি আমার মা, আমি জানি, তুমি আমাকে কোলে তুলে নেবেই নেবে। তোমার কোলের জন্যে যখন আমার আকুলতা জেগেছে তখন নেই আর আমার মালিন্যদৈন্য নেই আর আমার ধূলিশয্যা।

হে অর্জুন, তুমি মন্মনা হও, তা যদি না পারো মদ্ভক্ত হও। তাও যদি না পারো নিষ্কাম কর্মে পূজাপরায়ণ হও। তাও যদি না পারো নমস্কার করো আমার সর্ব-

প্রকাশিত বিশ্বরূপ। তাও যদি না পারো সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমাতে শরণ নাও। হে সাগরপারলিপ্সু, আমি তোমাকে পার করিয়ে দেব।
কিন্তু কি করে চিনব তোমাকে?
আপনজন বলে অনুভব করো, চিনতে দেরি হবে না। প্রভু যে বেশেই আসুক কুকুর তাকে ঠিক চিনতে পারে। মেষশিশুকে যে খোঁয়াড়েই আটকে রাখুক, প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনলেই সে উত্তর দেবে। ঠাকুর বললেন, 'যে হয় আপনজনা নয়নে তারে যায় গো চেনা।'
ঠাকুরের কাছে করজোড়ে বসেছে গিরিশ। বলছে, 'ভগবান, আমায় পবিত্রতা দাও। যাতে কখনো একটুও পাপচিন্তা না হয়।'
'তুমি পবিত্র তো আছ।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি। তোমার যে আনন্দ।'
'আনন্দ? আজ্ঞে না।' গিরিশ বললে কাতর স্বরে, 'মন বড় খারাপ। বড় অশান্তি। তাই তো ঠেসে মদ খেলুম।'
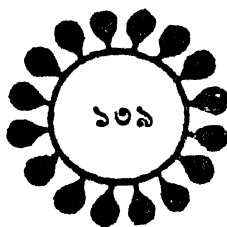
'এখানকার কথা মানতে হবে।' লাটুকে বললেন একদিন ঠাকুর।
'তবে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন।' লাটু বললে সরল মুখে।
তক্ষুনি গোপাল ঘোষের উদ্দেশে হাঁক পাড়লেন ঠাকুর: 'ওরে গোপাল, শোন লেটো কি বলে। বলে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন। এখানকার কথা কি বোঝানো যায়?'
গোপালকে সাক্ষী মানলেন ঠাকুর: 'তুই বল না, বুঝিয়ে বলবার মত এখানকার কথা?'
কোথায় ঠাকুরের কথায় সায় দেবে, তা নয়, লাটুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল গোপাল। বললে, 'সত্যিই তো। এখানকার কথা আপনি ছাড়া আর কে জানে। তাই দিন না বলে, হাটে দিন না হাঁড়ি ভেঙে।'
'এ তোমার কেমনতরো কথা! আমার দিকে না থেকে তুমি লেটোর দিকে গেলে। তুমিই বলো বিবেচনা করে এখানকার কথা কি জানিয়ে দিতে আছে?'
'এখানকার কথা জানবার জন্যেই তো আমরা সব এসেছি।' গোপাল বললে বিনত হয়ে, 'আমাদের না বললে আমরা জানব কি করে?'

হার মানলেন ঠাকুর। যিনি মধুদাতা তিনি আবার মধুপাতা। বললেন, 'এখন নয়, এখন নয়। এখানকার কথা এখন নয়। সময় হলে বুঝবে সবাই একদিন।'

জগদ্দলের গোপাল ঘোষ। সিঁথির বেণীমাধব পালের দোকান আছে চিনেবাজারে, বুরুশ-ম্যাটিং-এর দোকান, সেখানে কাজ করে। বেণী পাল ব্রাহ্ম হলে কি হয়, ঠাকুরকে মাঝে-মাঝে নিয়ে আসে তার বাড়িতে। সেখানেই প্রথম দেখে ঠাকুরকে। প্রথম দর্শন যেন মর্ম পর্যন্ত পেঁছুল না। কিন্তু আরেকবার দেখ। সমগ্রলক্ষ্যবদ্ধ হয়ে দেখ। দেখ একবার প্রাণের চক্ষু উন্মীলন করে। গভীর হতে বিচ্ছুরিত যে আনন্দময় জ্যোতি সেই আলোতে চোখ মেলে দেখ এই প্রাণের মানুষকে। পুণ্যপরিপূর্ণ পাবন-পুরুষকে। হৃদয়ের মধ্যে নাও সেই গভীরের সঞ্জীবন।

একদিন ঠাকুরের কাছে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে পড়ল গোপাল। বললে, 'অনেক দিন ধরে যাওয়া-আসা করছি আপনার কাছে, কই, একদিনও ভাবসমাধি হল না। আমার এক-দিন ভাবসমাধি করিয়ে দিন।'

'তুই ছোঁড়া তো ভারি বোকা।' ঠাকুর বললেন আশ্বাসের সুরে: 'ভাবছিস বুঝি ঐটেই হলেই সব হল! ঐটেই বুঝি সার বস্তু। শোন্ ঠিক-ঠিক ত্যাগ ঠিক-ঠিক বিশ্বাস তার চেয়ে বড় জিনিস। তাকিয়ে দ্যাখ দিকি নরেন্দরের দিকে। ও সব বড় একটা তার হয় না। কিন্তু দ্যাখ দেখি কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস!'

আর ঠাকুরের যে ভাবসমাধি হয় তাকে শিবনাথ শাস্ত্রী হিস্টিরিয়া বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। একদিন সরাসরি ধরলেন তিনি শিবনাথকে। পেটেমুখে এক হতে হবে তাই লুকোছাপা করলেন না। বললেন, 'হ্যাঁ হে শিবনাথ, তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বলো? আর বলো নাকি, আমি ও সময়টায় অচৈতন্য হয়ে যাই?' করুণামাখা হাসি হাসলেন ঠাকুর: 'তোমরা ইট-কাঠ-মাটি-টাকা এ সব জড় পদার্থে দিন-রাত মন রেখে ঠিক থাকলে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎসংসার চৈতন্যময়, তাঁকে দিন-রাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম! এ কোন দিশি বুদ্ধি তোমার?'

শিবনাথের মুখে কথা সরল না।

যে জিনিস ধুলো হয়ে যাবে তারই ধুলো ঝাড়ছি। যে কলসে ছিদ্রের অন্ত নেই তারই মধ্যে জল ভরবার দুশ্চেষ্টা করছি প্রাণপণে। ঘরকে কোথায় বড় করব, তা নয়, জিনিস জমিয়ে-জমিয়ে ঘরের জায়গা মারছি। কণ্ঠাগত প্রাণে সঙ্কুচিত হয়ে নিশ্বাস ফেলবার কায়িক অভ্যাস পালন করছি মাত্র।

জিনিসে-জায়গায় ভরপুর কোথায় আমাদের সেই পরিপূর্ণতা? প্রারম্ভ থেকে পরিণাম পর্যন্ত কোথায় সেই নিত্যনিয়ত? অমৃত যাঁর ছায়া মৃত্যুও যাঁর ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন দেবতাকে পুজো করব?

'তুমি অত নরেন্দর-নরেন্দর করো কেন?' নরেনই কিনা অভিযোগ করে। 'অত নরেন্দর-নরেন্দর করলে তোমায় যে নরেন্দরের মত হতে হবে। ভরত রাজা হরিণ ভাবতে-ভাবতে হরিণ হয়ে গিয়েছিল মনে নেই?'

বহু কাল রাজ্য ভোগ করে ছেলেদের মধ্যে তা ভাগ করে দিয়ে মহারাজ ভরত প্রব্রজ্যা নিলেন। এলেন পুলহাশ্রমে। আশ্রমের উত্তরে সরিদুত্তমা গণ্ডকী, সুরম্যসলিলা।

নদীতীরে বসে একদিন প্রণব জপছেন ভরত, অদূরে সিংহগর্জন শুনতে পেলেন। একটি গর্ভিনী হরিণী জলপান করছিল, দেখলেন, আতঙ্কে নদী পার হয়ে গেল লাফ দিয়ে। গর্ভের শাবক জলে পড়ে ভেসে চলল। কারুণ্যরসবশংবদ হয়ে রাজা হরিণশিশুকে তুলে আনলেন জল থেকে। মা'র খোঁজ করলেন, দেখলেন, নদীর পর-প্রান্তে এক গুহার মধ্যে মরে পড়ে আছে। তখন কি আর করা! হরিণ-শিশুর পালন পোষণ করতে লাগলেন, বৃক ও বাঘের থেকে রক্ষা করতে লাগলেন নিয়ত। শুধু তাই নয়, কখনো কোলে কখনো কাঁধে করে ফিরতে লাগলেন তাকে নিয়ে। শ্যামলঘন কোমল তৃণ আহরণ করে খাওয়ান তাকে হাতে করে, তার গা চুলকে দিয়ে তাকে যত না আরাম দেন নিজে তার চেয়ে শতগুণ বেশি তৃপ্তিলাভ করেন। ভোজনে-শয়নে ভ্রমণে-উপবেশনে ঐ মৃগশিশুই তাঁর সতত সঙ্গী। ভগবৎসেবার আর আগ্রহ নেই, সমস্ত নিয়ম-নিষ্ঠা শিথিল হয়ে খসে পড়ল মাটিতে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে মৃগতৃষ্ণায় কাল কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু দুরন্ত কালকে এড়াবেন কি করে? তখনো সেই মৃগচিন্তা। মৃগচিন্তা করতে-করতেই শরীর ত্যাগ করলেন। পরজন্মে হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন কাননে।

কথা যখন শুরু হয়েছে, শেষটুকুও শোনো।

হরিণজন্ম নিলে কি হবে, স্মৃতিভ্রংশ হল না ভরতের। পূর্বার্জিত আসক্তির জন্যে অনুতাপ করতে লাগলেন। কি কষ্ট, সেই ঈশ্বরপথ, সেই বীরবর্ম্ম থেকে আমি বিচ্যুত হয়েছি। কাউকে কিছু না বলে চরতে-চরতে চলে এলেন সেই পুলহাশ্রমে। একা-একা ফিরতে লাগলেন, কারু সঙ্গ আশ্রয় করলেন না। কবে মৃগত্বের অবসান হবে তৃষ্ণাপরিপূর্ণ চোখে তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

সব আগুনই নেবে। জন্মজ্বালার আগুনও নিবল একদিন। পবিত্র তীর্থসলিলে মৃগ-শরীর ত্যাগ করলেন ভরত।

তারপর?

এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেন। জাতিস্মর হয়ে জন্মেছেন, জানেন প্রাক্তন জন্মের বিষয়াসক্তির কথা, তাই জড় মূক ও বধিরের মত ব্যবহার করতে লাগলেন। বাপ অনেক চেষ্টা করল লেখাপড়া শেখাতে, ভস্মে ঘি ঢালা হল। বাপ মরলে মা-ও সহমৃতা হলেন। ভাইয়েরা দূর-ছাই করতে লাগল। খাটাতে লাগল চাকরের কাজে। বৃষের মত পুষ্ট কঠিন শরীর, মাঠে গিয়ে কাদা চটকে জমি পাট করুক। কিন্তু ক্ষেত্র সম কি বিষম এই জ্ঞানটুকু পর্যন্ত ওর নেই। কুৎসিত দগ্ধ অন্ন খেতে দাও ওকে। তাই ভরত খাচ্ছে অমৃততুল্য করে।

চোররাজ ভদ্রকালীকে খুশি করবার জন্যে নরবলির আয়োজন করেছে। যূপকাষ্ঠে বেঁধে রেখেছে এক শিশুকে। কি কৌশলে কে জানে, বাঁধন খসিয়ে পালিয়ে গেল শিশু। খোঁজ-খোঁজ, অনুচররা ছুটোছুটি করতে লাগল, বলি যোগাড় না হলে কারু ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না। অন্ধকারে খুঁজতে-খুঁজতে মিলে গেল জড়-ভরতকে। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে খেত পাহারা দিচ্ছে। এই যে এই সুলক্ষণ বলি, এটাকেই দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলো চণ্ডিকার কাছে। তথাস্তু। স্নান করিয়ে নতুন কাপড়

পরিয়ে মাল্যতিলকে অলঙ্কৃত করে কালীর সামনে বসালো তাকে অধোমুখে। জড়-ভরতের মুখে একটা কথা নেই, কাকুতি নেই। কেই বা খড়্গ, কেই বা ঘাতক, কেই বা বলি, কেই বা যূপকাঠ।

তস্কর-পুরোহিত যেই খড়্গ তুলেছে, ভদ্রকালী প্রতিমা থেকে বেরিয়ে এলেন স্ব-মূর্তিতে। সেই উত্তোলিত খড়্গ কেড়ে নিয়ে একে-একে সকল ডাকাতের শিরশ্ছেদ করলেন। রক্ত পান করে অন্তর্হিত হলেন প্রতিমার মধ্যে।

যে ব্রহ্মর্ষি পরমহংস, তার সংহার নেই।

তারপর?

আরো আছে। সেইটুকুই সার কথা।

সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজার নাম রহূগণ। শিবিকা করে যাচ্ছেন, পথিমধ্যে এক-জন বাহকের দরকার হল। ইক্ষুমতী নদীতীরে মিলে গেল ভরতকে। বলীবর্দের মত ভারবহনে সমর্থ মনে হচ্ছে, এস, পালকিতে কাঁধ দাও। ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দিল। পাছে কোনো প্রাণিহিংসা হয় সে আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে সামনে কিছুটা দেখে-দেখে পথ চলে ভরত। তাই শিবিকার সমতা রক্ষা করে চলা কঠিন হয়ে পড়ল।

রহূগণ গর্জন করে উঠল। সমান হয়ে চলছ না কেন?

প্রধান বাহক বললে, আমরা ঠিক চলেছি। এই নবনিযুক্ত লোকটাই দ্রুত চলছে না। তাই শিবিকা বিষম হয়েছে।

রহূগণ শ্লেষ করে উঠল ভরতকে। তুমি কি শ্রান্ত? তুমি স্থূলও নও, দৃঢ়াঙ্গও নও, তবে তুমি কি জরাগ্রস্ত?

ভরত কথা কইল না।

কিন্তু শিবিকা যেমন অসমান তেমনি।

তুমি কি জীবন্মৃত? রাজা আবার হুঙ্কার ছাড়ল। উপযুক্ত দণ্ড না পেলে তুমি প্রকৃতিস্থ হবে না দেখছি।

এতক্ষণে কথা কইল ভরত। বললে, রাজন, তুমি কাকে ভার বলো? কেই বা ভার-বহনে শ্রান্ত হয়? কেই বা স্থূল বা দৃঢ়? জরাই বা কি? জীবন্মৃততাই বা কার? কেই বা দণ্ড দেয়, কেই বা পায়?

ভারবাহীর মুখে এ কি কথা! তাড়াতাড়ি শিবিকা থেকে নেমে এল রহূগণ। শিবিকা-বাহক ভরতের পায়ের কাছে মাথা রেখে বললে, মহাত্মন, আপনি কে। কর্ম থেকে শ্রম হয়, বস্তুর ভার আছে, দেহের স্থূলতা-কৃশতা আছে ব্যবহারিক জগতে এই তো দেখছি চিরদিন। একে মিথ্যে বলি কি করে? কৃপা করে আমার সন্দেহের নিরসন করুন।

লৌকিক ব্যবহার নিত্যসত্য নয়। বললে জড়ভরত। এই প্রপঞ্চ ভগবানের মায়া, ভগবান ভিন্ন সমস্তই অবাস্তব।

ভগবানকে লাভ করব কি করে?

বেদাভ্যাস বা বৈদিক ক্রিয়া সূর্য-অগ্নির উপাসনা তপস্যা বা যাগযজ্ঞ—এ সব দ্বারা

ভগবানকে লাভ করা দুরূহ। সে প্রাপ্তির একমাত্র মূল্য মহতের পদধূলি। মহতের পদধূলি কুড়োও আর সে মূল্যে কিনে নাও বাসুদেবকে।

সেই মহতের পদধূলি দিতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

নরেনের কথায় খুব বিশ্বাস, তাই ভড়কে গেলেন ঠাকুর। তার কথা চিন্তা করতে গেলে তার মত হয়ে যেতে হবে অথচ সে চিন্তা উচ্ছিন্ন করাও যাচ্ছে না। মা'র কাছে গিয়ে পড়লেন। মা বললেন, ওর কথা শুনিস কেন? ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাস তাই ওর জন্যে এত আকুলি-ব্যাকুলি।

নরেনকে গিয়ে ধরলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর কথা আমি মানি না। মা বলেছে তোর ভেতর নারায়ণ দেখি বলেই তোর উপরে টান। যেদিন তা দেখতে না পাব সেদিন তোর মুখও দেখব না রে শালা।'

সেই নরেন এসে আবার শক্ত হাতে ধরেছে ঠাকুরকে। বললে, 'কেমন আপনার মা এই-বার দেখব। তাকে বলুন আপনার গলার ব্যথা সারিয়ে দিতে।'

'তোকে বলেছি না যে মন সচ্চিদানন্দে অর্পণ করেছি, তা এই হাড়মাসের খাঁচার মধ্যে আনতে পারব না।'

'ও সব কথা শুনব না কিছুতেই। বলতেই হবে আপনাকে। সন্তানের ব্যথা হরণ করে না সে কেমন জননী!'

ঠাকুর কথা ক'ন না, আবিষ্টের মত তাকিয়ে থাকেন।

'আপনি বললে নিশ্চয় শুনবেন।' নরেন আবার তাড়া দিল : 'আপনি কিছু খেতে পাচ্ছেন না এই কষ্ট আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

'ওরে ও-সব কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না।'

'আমাদের জন্যে বার করতেই হবে। শুনব না কিছুতেই।' নরেন দৃঢ়স্বরে বললে, 'যেখানে একটা মুখের কথা বললেই কষ্টের উপশম হয়, কেন আপনি বলবেন না? আপনার জন্যে বলতে বলছি না, আমাদের জন্যে বলুন, আমাদের কষ্টের লাঘবের জন্যে। যাতে অন্তত একটু খেতে পারেন তাই চেয়ে নিন। আপনি খেতে পাচ্ছেন না আর আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছি, এ কষ্ট সহনাতীত।'

ঠাকুর উঠলেন। বললেন, 'দেখি। যখন বলছিস এত করে। দেখি, বলতে পারি কিনা।'

নরেনকে একদিন ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন মা'র কাছে টাকাকড়ি চাকরিবাকরি চেয়ে নিতে। ফেরাফিরতি ঠাকুরকে আজ পাঠাচ্ছে নরেন, যাতে স্বচ্ছন্দে দুটি খেতে পারেন তার ক্ষমতার জন্যে।

মহাপ্রাণময়ী রাজরাজেশ্বরী বসে আছেন মন্দিরে। তয়া সর্বমিদং ততম্। সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে বিরাজ করছেন। তোমার কাছে কী চাইব মা!

তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা, সৌম্যতমা। তুমি অতিবিস্তীর্ণকান্তি। পর ও অপর উভয়েরই আশ্রয়। তুমিই পরমেশ্বরী। তুমিই ধারণ করছ, পালন করছ, গ্রাস করছ। তুমিই সর্বগ্রাসিনী। আমি যে মুহূর্তে অমৃতায়মান হব আমাকে তুমি তোমার সুস্বাদু আহার্যরূপে গ্রহণ করবে, গ্রাস করবে। আমি মরে অমর হব। মৃত্যুর পঙ্ক

থেকে চলেছি সেই অমৃত-অঙ্কে, আর কী চাইবার আছে? সুখেও তুমি, অসুখেও তুমি, অশনেও তুমি, অনশনেও তুমি। তুমি 'সদসৎ' হয়েও আবার 'তৎ পরং যৎ'।

আঙুল দিয়ে গলার ঘা ইঙ্গিত করলেন। বললেন, সরল শিশুর মত : 'মা, এইটের দরুন কিছু খেতে পারছি না। যাতে দুটো খেতে পারি তাই করে দে।'

মা বুঝি প্রার্থনা শুনলেন। উজ্জ্বলনয়নে হেসে কি যেন বললেন ঠাকুরের কানে-কানে।

মন্দির থেকে ফিরে চললেন ঠাকুর। নরেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে এল। 'কি, বললেন মাকে?' দীপ্তদ্রুত তীরের মতন তার প্রশ্ন।

'বললুম।'

'বললেন?' উৎসাহে প্রফুল্ল হয়ে উঠল নরেন। যখন বলেছেন, বলতে পেরেছেন, মুখ দিয়ে যখন বেরিয়েছে কথাটা তখন আর ভাবনা নেই। সুফল অনিবার্য। 'কি বললেন?'

'বললুম, কিছু খেতে পারছি না। যাতে দুটো খেতে পারি তাই করে দে।'

'শুনে মা কি বললেন?'

'তোদের সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, কেন, তোর একমুখ বন্ধ হয়েছে তো কি হয়েছে! তুই তো এদের শতমুখে খাচ্চিস। লজ্জায় আর কথাটি কইতে পারলুম না।'

নরেনের মাথাও হেঁট হল।

সে আর তার বন্ধুরা যে খাচ্ছে সেও ঠাকুরেরই খাওয়া। এক দরজা বন্ধ তো হাজার দরজা খোলা। এক তারা নিবল তো লক্ষ তারায় তাকিয়ে আছে মহারাত্রি।

তুই যে খাচ্ছিস তাইতে আমিও খাচ্ছি। তোর যে সুখ সেইটেই আমার উপভোগ। তোর যে তুষ্টি, তোর যে তৃপ্তি তাইতেই আমার চরিতার্থতা।

'রাজন, এই সংসার এক গহন অটবী।' ভরত ফের বলল রহূগণকে। 'দেহী বণিক, বুদ্ধি নায়ক। নায়ক অসতর্ক হলে ছয় ইন্দ্রিয় ছয় দস্যুরূপে পুণ্যধন লুণ্ঠন করে নেয়। কখনো গহ্বরে এনে ফেলছে কখনো বা তুলছে শৈলশৃঙ্গে। তুমিও বিচরণ করছ এই মায়াকাননে। অসজ্জিত-আত্মা অর্থাৎ অনাসক্ত হও। কৃতভূতমৈত্র হও, অর্থাৎ সর্বজীবে বন্ধুতা করো। সকল জঞ্জালশৃঙ্খল জ্ঞান-খড়্গ দিয়ে ছিন্ন করো। ভবাটবী উত্তীর্ণ হয়ে যাও।'

দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করল রহূগণ। বললে, 'মহৎকে নমস্কার, শিশুকে নমস্কার, বালককে নমস্কার, যুবককে নমস্কার। যে ব্রাহ্মণ অবধূতবেশে পৃথিবীতে বিচরণ করছে তাকে নমস্কার। তাদের সকলের অনুগ্রহে সকল রাজার কল্যাণ হোক।'

নিম-জল দিয়ে ঠাকুরের গলার ঘা পরিষ্কার করে দিচ্ছে গোপাল।

ভীষণ লাগছে। যন্ত্রণায় ঠাকুর আর্তধ্বনি করে উঠলেন।

ততোধিক যন্ত্রণা গোপালের। হাত গুটিয়ে নিল। বললে, 'তবে থাক, আর ধোয়াব না।'

সে আবার আরেক কষ্ট ঠাকুরের। তাঁর কষ্টে আর সকলে ব্যথা পাচ্ছে এ আবার

দুঃসহ। বললেন, 'না-না তুমি ধুইয়ে দাও। এই দেখ আমার আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না।'
দেহ থেকে মন উঠিয়ে নিলেন নিমেষে। গোপাল ধুয়ে দিতে লাগল। আর আর্তনাদ নেই, বিকৃতিচিহ্ন নেই, মুখমণ্ডলে অমোঘ-অনঘ প্রসন্নতা। অপ্রগল্‌ভ শান্তি।
'দুঃখ জানে শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাকো।' এই ঠাকুরের মূলমন্ত্র। এই যে কষ্টের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা দুঃখ আর শরীরের মধ্যে বোঝাপড়া, হে মন, তুমি অসম্পৃক্ত, তুমি স্পর্শদোষশূন্য, তুমি থাকো অখণ্ডিত আনন্দে। ধূমের সঙ্গে কাঠের সঙ্গে সম্বন্ধ, হে অগ্নিশিখা, তুমি অব্যাহত, তুমি সংশ্লেষলেশহীন, তোমাকে কে ছোঁয়, কে তোমাকে মলিন করে!
তাঁতেই লেগে থাকো। দুঃখের পার আছে, সুখই অপার। শরীরের শেষ আছে মনই অফুরন্ত। মরুময়ী তামসী নিশাই মায়া, দিকদিগন্তের অধীশ্বর প্রদীপ্তশক্তি সূর্যই একমাত্র সত্য।
'এক সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়!' এক সাধ করলেই সব সাধ পূর্ণ হয়, অনেক সাধ করলে একটি সাধও মেটে না। যদি বৃক্ষের মূলে জলসেচন করো বৃক্ষ পুষ্পফলব্যাপ্ত হবে; গোড়া ছেড়ে আর সর্বত্র জল ঢালো কোথায় তোমার বৃক্ষশোভা, কোথায় বা পুষ্পকান্তি। সব ছেড়ে সেই এককে ধরো, মূলকে ধরো, শাখা ছেড়ে শিকড়কে আশ্রয় করো। সেই তোমার সবেধন নীলমণি। তোমার একশ্চন্দ্রঃ।
গোপালের সেবাই ঠাকুর বেশি পছন্দ করেন। ওষুধও সেই খাইয়ে দেয়।
'সেই বুড়ো লোকটা কোথায়?' ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেলেও গোপালের দেখা নেই দেখে ঠাকুর জিগগেস করলেন বিরক্ত হয়ে।
সকলের চেয়ে বয়সে বড়, এমন কি ঠাকুরের চেয়েও, তাই ঠাকুর তাকে বুড়ো গোপাল বলে ডাকেন। কখনো বা ডাকেন 'মুরুব্বি।'
খোঁজ, খোঁজ, কোথায় গেল, কোন কানাচে! একজন এসে বললে, 'ঘুমুচ্ছে।'
'আহা,' স্নেহে ও সমবেদনায় ভরে উঠলেন ঠাকুর। 'কত রাত জেগেছে। এখন ঘুমুচ্ছে, আহা, একটু ঘুমুক। তাকে আর জাগিও না।'
ভক্তের দাহেই তাঁর দাহ। তার উপশমেই তাঁর উপশম।
বুড়ো গোপাল একবার তীর্থে যেতে চেয়েছিল। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোমার মন বুঝি এখন তীর্থ-তীর্থ করছে?'
'অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ। বারে-বারেই ইচ্ছেটা আসে ঘুরে-ঘুরে।'
বহূদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থভ্রমণ করে তার নাম বহূদক। আর যার ভ্রমণের সাধ মিটে গেছে, এক জায়গায় স্থির হয়ে আসন করে যে বসেছে, তাকে বলে কুটীচক।
'যখন হেথা-হেথা তখনই জ্ঞান।' বুড়ো গোপালের দিকে তাকালেন ঠাকুর।
যা আছে নিকটেই আছে, এই মুহূর্তেই আছে, আছে আমার দক্ষিণ হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে। কেন আর গ্রন্থি জটিল করছ, গ্রন্থির পাশেই রয়েছে উন্মোচনের উপায়। তাকিয়ে দেখ একবার চোখ মেলে, সূর্য-চন্দ্রের দিকে নয়, দূরে মেঘ-ছোঁয়া মন্দির-

চূড়ার দিকে নয়, তোমার পাশে বসা এই সহজ সুন্দর মানুষটির দিকে, বহুপুষ্প-ফলোপেত কল্যাণবৃক্ষের দিকে।

'যা চায় তাই কাছে।' বললেন ঠাকুর স্মিতমুখে। 'অথচ লোকে নানা স্থানে ঘুরে মরে।'

যেখানে স্বয়ং ঠাকুর বর্তমান সেখানে আবার তীর্থ কি। যেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় সেখানে পথ বাড়াবার কি দরকার!

বলরাম বললে, 'তাই গুরু শিষ্যকে বলে চার ধাম করে এস। যখন একবার ঘুরে দেখে যে এখানেও যেমন সেখানেও তেমন, তখন আবার গুরুর কাছে ফিরে আসে।'

যাবে কোথায়! যে বিন্দুর থেকে যাত্রা সমাপ্তিসিন্ধুও যে সেইখানে।

শুধু চিনতে পারে না। কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকোয়। কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছনে ছোটে। নিজ পুত্র ও বালক মনে করে বসুদেবও চিনতে পারেনি শ্রীকৃষ্ণকে।

সন্নিকর্ষই অনাদরের হেতু। যেমন গঙ্গাতীরবাসী গঙ্গা ছেড়ে শুদ্ধির জন্যে অন্য তীর্থজলের সন্ধান করে। হাতের শাঁখা দেখতে দর্পণ খুঁজতে বেরোয়।

কিন্তু সাধুই আসল তীর্থ।

'জলময় সকল স্থানই তীর্থ নয়,' বললেন শ্রীকৃষ্ণ, 'মৃত্তিকা বা প্রস্তরময় সকল বস্তুই দেবতা নয়। তীর্থ আর দেবতা পবিত্র করে বহু কাল পরে কিন্তু সাধু পবিত্র করে দর্শনমাত্র।'

সমুদ্র অসীম, গভীর-গম্ভীর, কিন্তু গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর যে মাধুর্য তা সমুদ্রে কোথায়? ব্রহ্মের চেয়েও সাধু সরস।

দধিমন্থন করছে যশোদা, কৃষ্ণ এসে দণ্ড ধরে বাধা দিল। কোলে তুলে স্তন্যপান করাচ্ছেন, দেখলেন উনুনে দুধ উথলে পড়ছে। অতৃপ্ত শিশুকে জোর করে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে যশোদা ছুটে গেল দুধ নামাতে। এসে দেখল ক্রুদ্ধ শিশু শিলাখণ্ড দিয়ে দধিমন্থনের ভাণ্ডটি চূর্ণ করেছে। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে ননী চুরি করে এনে নিজে খাচ্ছে, বানরদের খাওয়াচ্ছে।

লাঠি নিয়ে ছেলেকে তাড়া করল যশোদা। মাকে মারমুখো দেখে কৃষ্ণ ছুট দিলে। যশোদাও পিছু নিল। যোগীদের তপঃপ্রেরিত মন যার মধ্যে প্রবেশ করতে অসমর্থ, চেয়ে দেখ তারই পিছনে কিনা ছুটছে। কিন্তু শিশু তো, কত আর ছুটবে, ধরা পড়ল। মারবার জন্যে লাঠি তুলল যশোদা, কিন্তু দেখল ছেলের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছে। তখন মায়া হল। লাঠি ফেলে দিয়ে দড়ি কুড়িয়ে নিলে। দড়ি দিয়ে উদূখলের সঙ্গে বাঁধল কৃষ্ণকে। যার অন্তর-বাহির পূর্ব-পর কিছু নেই, যে নিজেই অন্তর-বাহির পূর্ব-পর তারই কি না রজ্জুবন্ধন!

কিন্তু কি আশ্চর্য, দড়িতে কুলোচ্ছে না, বারে-বারেই দু আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। বাড়ীত দড়ি জুড়লো গিঁট দিয়ে, তবু দু আঙুল কম। সবাই অবাক মানল। এ কি অঘটন, এ কি অতিমানুষী বিভূতি! কিন্তু যশোদা ছাড়বার পাত্র নয়। আরো দড়ি জুড়লে। পরিশ্রমে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত হয়েছে, কবরী ও মাল্য বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে, তবু নিবৃত্তি নেই। যে করে হোক তোকে বাঁধবই বাঁধব।

তখন কৃষ্ণ মাকে কৃপা করলেন। স্বিন্নগাত্রা বিস্রস্তকেশা দেখে নিজেই ইচ্ছে করে বাঁধা পড়লেন। বিশ্ব যাঁর বশ তিনি ভক্তেরও বশ। ভক্তিমানদের পক্ষেই তিনি সুখলভ্য।
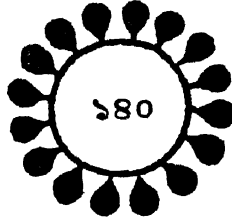
বাগবাজারের চুনীলাল বোস সাধু দেখবার জন্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। অন্তত একবার গঙ্গার ধারটা ঘুরে আসে। জটাভস্ম দেখলেই সঙ্গ নেয়। কোন জটায় জলধারা আছে, কোন ভস্মে বা স্বর্ণখণ্ড তা কে জানে! কিন্তু যত জটা দেখে সব কেশভার যত ভস্ম দেখে সব দগ্ধাবশেষ।

কে একজন বললে, যদি সত্যিকার সাধু দেখতে চাও রাসমণির কালীবাড়িতে যাও।

সে আবার কোথায়?

শুধু ঠিকানা জানলেই চলবে না, পথও জানা চাই। তারার অক্ষরে ঠিকানা তো লেখা আছে কিন্তু পথ কই অন্ধকারে?

আহিরীটোলা থেকে নৌকো পাবে জোয়ারের সময়। দক্ষিণেশ্বরের উত্তরের ঘাটে নামবে। ভাড়া পাঁচ পয়সা।

তবু কি তক্ষুনি-তক্ষুনি যাওয়া যায়? ঘাট থেকে কত নৌকো ছাড়ে, কত জোয়ারের নিমন্ত্রণ আসে তবু সময় হয় না। কি করে হবে? তুমি যখন ডাকবে তখনই তো সময়। তার আগে আর লগ্ন নেই।

কত দিন পরে এল সেই শুভযোগ। আফিসের ছুটি, দুপুরের জোয়ার, মনিব্যাগে পাঁচটি পয়সা এবং সর্বোপরি মন। মন যদি দূরে থাকে কান শোনে না হাজার ডাকে।

ঘাটে নেমেই এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা। যেমন সাধারণ লোকের প্রার্থনা তাই আন্দাজ করে ব্রহ্মচারী জিগগেস করলে, 'কি, ওষুধ চাই?'

'না। পরমহংসদেবের দর্শন চাই।'

'ঐ আছেন কোণের ঘরে। কিন্তু তাঁর কাছে কি?'

'কিছু নয়। শুধু দর্শন।'

ঠাকুরের ঘরে উত্তরের দিকে একখানি বেঞ্চি, তাতে গুটিসুটি বসল এসে চুনীলাল। ঠাকুর তাকে আপনজনের মত প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোথায় থাকে, কি কাজ করে,

কত মাইনে, কে-কে আছে তার সংসারে, এই সব ঘরোয়া কথা। প্রেমভক্তি বিবেক-বৈরাগ্যের কথা নয়, সর্বদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি যে ঈশ্বরে সে ঈশ্বরকথা নয়। অথচ একটুও ফাঁকা-ফাঁকা লাগল না, মনে হল না আসার কথা। সব যেন এক নিমেষে সরল করে দিলেন, লঘু করে দিলেন। আপনজন কি আর মুখের কথায় হওয়া যায়? আমার আপনজন হবেন অথচ আমার খুঁটিনাটি সব জানবেন না, তা কি হতে পারে? মুখের কথায় যখন মনের মধ্যে এসে মেশে তখনই তো আপনজন।

চুনীলালের মনে হল, এই তো ভূভারভঞ্জন সর্বলোকসুখাবহ বন্ধু। অজ্ঞান-সঙ্কটে পরজ্যোতি।

যাবার সময় মিছরি প্রসাদ দিয়ে দিলেন। বললেন, আবার এসো।

বৈরাগ্য এল চুনীলালের মনে। এক মাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাল আপিসে। বাড়ি থেকে সটকান দিলে। কাশী-বৃন্দাবন করলে কদিন, পরে হরিদ্বার-হৃষীকেশ। কিন্তু হৃষীকেশ হৃদিস্থিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি কই? মর্কট-বৈরাগ্যের অবসান হল, ফিরে এল কলকাতা।

এসে দেখল চাকরিটি গেছে। মিউনিসিপাল আফিসে কাজ করে, যত সামান্যই হোক তাইতেই তো সংসারের পালন-পোষণ। বৈরাগ্য গেছে যাক, চাকরীটি যায় কেন?

ধরাধরি করে চাকরিতে ফের বহাল হল চুনীলাল। এবার তোমার পদপ্রান্তে বহাল করো।

বলরামের বাড়ির লাগোয়া পশ্চিমেই চুনীলালের বাসা। ঠাকুর বলে দিলেন বলরামকে, যেন চুনীলালকে নিয়ে আসে মাঝে-মাঝে। শুধু চুনীলাল কেন, যত ভক্ত যোগাড় করতে পারে, সবাইকে নৌকো করে নিয়ে আসে বলরাম। অন্য দিন না হোক অন্তত রবিবার। কত গরিব লোক আছে, দশটি পয়সা যোগাড় করাও যাদের কষ্ট, বলরাম তাদের এপারের কান্ডারী। ওপারের কর্ণধারের কাছেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।

চুনীলালকে পাড়ার লোকে বলে বড়লোকের পেটোয়া, যেহেতু ঠাকুরের ইঙ্গিতে সে বলরামের নৌকোর সোয়ারী। লোক না পোক! লোকের কথায় আমি কি এই সরল-পথপরায়ণ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব?

তবু, কে জানে কেন, যোগাভ্যাসের দিকে মন গেল চুনীলালের। পুঁটে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে বসে আসন-প্রাণায়াম করতে লাগল। লাভের মধ্যে হল এই, হাঁপানি শুরু হয়ে গেল। কাজ কামাই, ঠাকুরের কাছে যাওয়া বন্ধ। টানটা কম পড়তে একদিন এসেছে দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর তাকে বকে উঠলেন, 'তোমাদের ও-সব কেন? তোমরা গৃহী, ও-সব যোগ-টোগ তোমাদের জন্যে নয়। তোমাদের শুধু বিশ্বাসভক্তি। ফেরবার সময় গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ নিয়ে যেও। দেখো, ও-সব কাজ আর কোরো না।'

কি করে জানলেন তার যোগের কথা, তার রোগের কথা?

আর, কি আশ্চর্য, তিন মাত্রা ওষুধ খেয়েই তার অসুখ সেরে গেল!

'জ্বরে আর দশমূল পাচন চলবে না এ যুগে,' বললেন ঠাকুর, 'এখন ফিভার মিকশ্চার।'

যোগ-প্রাণায়াম নয়, এ যুগে শুধু নারদীয় ভক্তি। অকারণের অবারণের ভালোবাসা।
বড় সাধ চুনীলালের—ঠাকুরের কিছু সেবা করে। কিন্তু বড় গরিব, কিছু ভোগরাগ করার সামর্থ্য নেই। মনের ফুল তুমি নিচ্ছ তা জানি কিন্তু তোমাকে যে বনের ফুলও দিতে ইচ্ছা করে। শুধু ভাব নয় কিছু একটা দ্রব্য দিতে ইচ্ছা করে। দেখতে ইচ্ছা করে তোমার মুখে আত্মভোলা শিশুর আহ্লাদ।
মাস্টারমশায়ের কাছে ঠাকুর একটা টুল চেয়েছিলেন, সেদিন চুনীলাল সেখানে ছিল। ঠাকুর বললেন, 'একটা টুল কিনে আনবে এখানকার জন্যে। কত নেবে?'
'দু-তিন টাকার মধ্যে।' বললে মাস্টার।
'এত? একটা জলপিঁড়ির দাম যদি বারো আনা, তবে অত হবে কেন?'
'না, না, বেশি হবে না।' মাস্টার চাপা দিতে চাইল কথাটা।
মাস্টারের কাছে চেয়েছেন, চুনীলাল কি করে কেনে? তা ছাড়া দু-তিন টাকা খরচ করবার মত তো তার সংগতি নেই।
ঠাকুর বুঝলেন ভক্তের মনের ব্যথা। বললেন, 'ধাতু-পাত্রে তো জল খেতে পারি না। তুমি এখানকার জন্যে একটা কাচের প্লাশ এনে দিও।'
কৃতার্থ হল চুনীলাল। কৃতকৃতার্থ। মনের ব্যথাটুকুই শুধু জানবে, হরণ-পূরণের কোনো ব্যবস্থা করবে না? তুমি তবে কেমনতরো আত্মজন?
প্রণবোচ্চারণে অধিকার নেই চুনীলালের, এ আরেক দুঃখ। তাও ঠাকুর জল করে দিলেন। বললেন, 'প্রণবে কি দরকার? ভগবানের যে কোনো একটা নাম ধরো, তাই জপ করো, উচ্চারণ করো।'
এই তো সরলপথপরায়ণ ধর্ম। এই তো ক্রান্তদর্শন। এই তো বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি।
ঈশ্বরের হাত নেই, কিন্তু সমস্ত কিছু রচনা করেন, গ্রহণ করেন। পা নেই কিন্তু সর্বব্যাপক বলে সমধিক বেগবান। চোখ নেই তাই দেখেন অনিমেষে, কান নেই তাই শোনেন অনিরুদ্ধ। অন্তঃকরণ নেই তবু সমস্ত জগৎকে হৃদয়ঙ্গম করেন। অথচ তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এমন কারও সাধ্য নেই। সনাতন সর্বোত্তম ও সর্বত্রপূর্ণ বলে তিনি পুরুষ। এবং পরমপুরুষ।
'যখন যেরূপ লোক আসবে আগে দেখিয়ে দিত।' মাস্টারকে বলছেন ঠাকুর, 'এই চোখে, ভাবে নয়, দেখলাম চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্ছে। তাতে বলরামকে দেখলাম, যেন তোমাকেও দেখলাম। আর চুনীলাল এখানে আনাগোনা করছে, তুমি করছ, তাতে উদ্দীপন হয়েছে।'
উদ্দীপিত করতে পারছে ঠাকুরকে এমন লোক চুনীলাল।
'আচ্ছা এ অসুখটা কত দিনে সারবে বলতে পারো?' কাশীপুরের বাড়িতে এসে জিগগেস করলেন একদিন।
'তা একটু সময় নেবে।' যেন প্রবোধ দিল মাস্টার।
'কত?' নিরীহ শিশুর মত তাকালেন ঠাকুর।
'এই পাঁচ-ছ মাস।'

'বলো কি?' অধীর হয়ে আকুলকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন। 'এত ঈশ্বরীয় রূপদর্শন এত ভাবসমাধি, তবে আবার এই অসুখ কেন?'
'উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই।'
'কি বলো তো?' ঠাকুরের চোখে প্রশান্তির প্রসন্নদীপ্তি ফুটে উঠল।
'একটা শুধু বলতে পারি, আপনি সাকার থেকে নিরাকারে যাচ্ছেন। বিদ্যার "আমি" পর্যন্ত থাকছে না। লোকশিক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'
'ঠিক বলেছ। কাকে আর কি বলব। সব রামময় দেখছি। কিন্তু দেখ না এই বড় বাড়িটা ভাড়া হয়েছে বলে কত লোক আসছে। শুধু কথা শুনতে চায়।' হাসলেন ঠাকুর। 'আমি কি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মত সাইনবোর্ড দিয়ে বসেছি যে অমুক সময় লেকচার হবে?'
সেই বাগবিন্যাসবিশারদ পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন। যে বলি-হস্তীর পদমর্দনে ধর্ম নিঃশেষপ্রায় হতে চলেছে সেই প্রমত্ত মাতঙ্গমথনের অঙ্কুশস্বরূপ হয়ে সে আবির্ভূত হয়েছে। মোহনিদ্রাতুর দেশের জাগ্রত চৈতন্য।
'আচ্ছা মশাই আপনি গেরুয়া পরেন কেন?' কৃষ্ণানন্দ স্বামীকে জিগগেস করলেন একজন।
'শ্রীমদবধূত গুরুপ্রসাদাৎ।'
'বাইরের রঙের চেয়ে ভিতরের রঙ কি ভালো নয়?'
'না। বাইরে রঙ করুন আর না করুন, ভিতর একেবারে শাদা রাখতে হবে। যদি ভিতরে রঙ লেগে যায় তাকে বৈরাগ্যের জলে ধুয়ে ফেলাই ভালো।'
'এ মলিন পোশাক পরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে আপনার লজ্জা করে না?'
হাসল কৃষ্ণানন্দ। 'এ যে অযাচকের পরিচ্ছদ। যাচঞাহীন ব্যক্তি নির্ভীক, ভুজবীর্য-সম্পন্ন, আনন্দময়।'
'কিন্তু আপনি তো দান সংগ্রহ করেন শুনেছি।'
'সে আমার নিজের জন্যে নয়, ভারতের হিতের জন্যে। এখানে স্বয়ং ভারতই যাচক, ভারতই দাতা।'
'কিছু সুবিধে আছে গৈরিক পরে?'
'যখন শাদা কাপড় পরতাম তখন আবার জামা লাগত, জুতো লাগত, না হলে পরিপূর্ণ হত না। এখন গৈরিক বস্ত্রখণ্ড একাই স্বসম্পূর্ণ। জুতো জামার দরকার হয় না। মাত্র কৌপীন পরলেই মনে হয় পূর্ণ পরিচ্ছদ পরে আছি।'
'শুধু এইটুকু লাভ?'
'না আরো আছে। আগের দিনে ঋষি ও ব্রহ্মচারীরা যাঁরা গহন বনে বা গিরিগুহায় থাকতেন তাঁরা গিরিমাটিতে বসন রাঙিয়ে নিতেন। গায়ে মাটি মাখলে কি হয় জানো বোধ হয়? শরীর থেকে যে তৈজসপদার্থ নিত্য বেরিয়ে যাচ্ছে তা নিরুদ্ধ হয়ে যায়। তাতে শরীরের ওজোগুণ বাড়ে, আত্মাতে সমাধি করবার শক্তি বাড়ে। গৈরিক বসন পরলে সেই গিরিমৃত্তিকার স্পর্শে সাধনার্থীর দেহ বলশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং গেরুয়া সাজের জন্যে নয় কাজের জন্যে।'

সেই কৃষ্ণপ্রসন্ন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী ঠাকুরকে দেখতে এসেছে। তার পর লিখছে তার কাগজে, 'ধর্মপ্রচারকে' :

'ইঁনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলিয়া বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্য্যে পরমহংস। আশ্চর্য্য ইঁহার ভাব, আশ্চর্য্য ইঁহার প্রকৃতি, যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্তচলাচলশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তৎশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। তিনি সাধনা স্বারা কামিনীকাঞ্চনকে বস্তুতঃই কায়েন-মনসা-বাচা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতস্বয় তাঁহার শরীরের সহিত সংসৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্তপদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমন কি যদি কোনো পাপগামী অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য সংবেগ উদয় হয়, এবং ইহা স্বারা তাঁহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে তাঁহাকে কেহই কখনও শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু, তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়-ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্তগ্রন্থ বিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার সংশ্রবে ও তাঁহার উপদেশগুণে অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছে।...'

সেই সব কথাই হৃৎকর্ণরসায়ন কথা। সেই সব কথা শ্রবণই অবিদ্যা নিবৃত্তির পথ, শুদ্ধা রতিভক্তি সংক্রমণের পথ। একমনসোবৃত্তি স্বাভাবিকী যে ভক্তি, যে ভক্তি অনিমিত্তা তা সিদ্ধির থেকে মুক্তির থেকেও গরীয়সী।

যারা আমার পদসেবাপরায়ণ, বললেন শ্রীহরি, তারা আমার সঙ্গে একাত্মতাও ইচ্ছা করে না।

দেখ দেখ আমার রুচির প্রসন্ন মুখ, আমার অরুণলোচন, আমার দিব্যতরঙ্গশোভা আর ইচ্ছামত বাক্যালাপ করো আমার সঙ্গে।

'দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে।' মাস্টারকে বললেন ঠাকুর, 'আর আর কত কথা বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে, কিন্তু পারছি না।'

তুমি যদি না কও আমরা কইব।

আমরা কইব আর তুমি শুনবে।

তোমার নাম যার জিহ্বাগ্রে, সেই কপিলজননী দেবহূতি স্তব করেছিল ভগবানের, সে চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ।

আর যারা তোমার নাম উচ্চারণ করে তারাই প্রকৃত তাপস। তারাই ঠিক-ঠিক হোম ও তীর্থস্নান করেছে। তারাই যথার্থ সদাচারী, তাদেরই সার্থক বেদাধ্যয়ন।
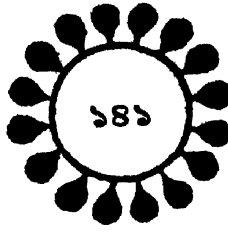
দক্ষিণেশ্বরের ঝাউতলায় হনুমানের পাল চুপ করে বসে আছে। যেন কত ভালো-মানুষ। যেন সর্ববিষয়ে বীতরাগ। কিন্তু আসল মতলবখানা হচ্ছে, কোন গৃহস্থের চালে-বাগানে হুপ করে লাফিয়ে পড়বে। চালে হয়তো ফলে আছে লাউ-কুমড়ো, বাগানে হয়তো কলা-বেগুন। এই মর্কট-ধ্যান, মর্কট-বৈরাগ্য দিয়ে কি হবে? কেশব সেনকে একদিন বলেওছিলেন ঠাকুর : 'তোমাদের ওখানে অনেকের ধ্যান দেখলাম সেই হনুমানের ধ্যানের মত।'

তন্ময় হয়ে যাও, তদেকান্তচিত্ত হও। আবেশেই তো আছ সারাক্ষণ। হয় ধনের আবেশ, নয় মানের আবেশ, নয়তো গূঢ়চর কামনার আবেশ। এবার নতুন আবেশে চলে এস, ঈশ্বর-আবেশে। কালকূটকুম্ভ আলোড়ন করে বারে-বারে পান করেছ, মেটেনি তৃষ্ণা, এবার ঈশ্বর-সরোবরে অবগাহন কর। তোমার চিত্ততল আবৃত করেই সেই অমৃতের পয়োধি।

'আচ্ছা, ধ্যানের কি নিয়ম? কোথায় ধ্যান করব?' জিগগেস করল মণি মল্লিক।

'কেন, হৃদয়ে।' মুখের উপর জবাব দিলেন ঠাকুর। 'হৃদয়ই ডঙ্কাপেটা জায়গা। নয়তো সহস্রারে। এ-সব বৈধী ধ্যান। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। তাকে বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় দৃষ্টি রাখতে হয় কপালে। জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা।'

'আর সাকার ধ্যান?'

'তাকে বলে বিষ্ণুযোগ। দৃষ্টি নাসাগ্রে। অর্ধেক জগতে অর্ধেক অন্তরে।'

একটু কি দুরূহ লাগছে?

ঠাকুর হাসলেন। জল করে দিলেন। বললেন, 'ও সব শাস্ত্রবিধি। যাদের রাগভক্তি হয়েছে, যেখানে খুশি সেখানেই তারা ধ্যান করতে পারে। সব স্থানই তো তাঁর, কোথায় তিনি নেই? গঙ্গা যেমন পবিত্র তেমনি অগঙ্গাও পবিত্র। বলির কাছে এসে যখন তিন পায়ে নারায়ণ স্বর্গ মর্ত পাতাল ঢাকলেন, তখন কি আর কোনো জায়গা বাকি ছিল?'

'পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও।' ঈশান মুখুজ্জেকে বলছেন ঠাকুর, 'লোকে না হয় জানুক ঈশান এখন পাগল হয়েছে। কোশাকুশি ছুঁড়ে ফেলে দাও, ঈশান নাম সার্থক করো।'

পাগল নয় কে! কেউ কামের জন্যে পাগল, কেউ নামের জন্যে। কেউ পদের জন্যে কেউ সম্পদের জন্যে। কয়েকজন না হয় ঈশ্বরের জন্যে পাগল হল! আর সব

পাগলদের মধ্যে হানাহানি মারামারি, কিন্তু আমিও ভক্ত তুমিও ভক্ত, জলে জলাকার।
ঈশানের দুর্জয় বিশ্বাস। বলে, 'একবার যখন দুর্গানাম করে বেরিয়েছি, আর আমার ভয় কি! শূলহস্তে শূলপাণি আমার সঙ্গে আছে।'
'তোমার খুব বিশ্বাস।' বললেন ঠাকুর। 'আমাদের কিন্তু অত নেই।'
সকলে হেসে উঠল।
'কি বলো, শুধু বিশ্বাস থাকলেই হয়?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
আগুনের সঙ্গে বায়ুর যেমন প্রীতি, তেমনি বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাকুলতার। শিশুর বিশ্বাস আর মায়ের ব্যাকুলতা।
'অহঙ্কারের দরুনই আমাদের বিশ্বাস কম।' বললে ঈশান। 'কাক ভূষণ্ডীও প্রথমে মানেনি রামচন্দ্রকে। সপ্তলোক বেড়িয়ে এসে দেখলে কিছুতেই নিস্তার নেই রামের থেকে। তখন নিজে ধরা দিল। রামের শরণাগত হল।'
শরণাগতি তো বীর্যহীনের নিষ্ক্রিয়তা নয়, শরণাগতি হচ্ছে এগিয়ে গিয়ে ধরা। রোক করে জোর করে ধরা। যে এগিয়ে গিয়ে ধরে সেই তো পুরুষপ্রবীর।
'তুমি খোশামুদের কথায় ভুলো না।' ঠাকুর সাবধান করে দিলেন ঈশানকে। 'বিষয়ী লোক দেখলেই পিছু নেয়। যেমন মরা গরু দেখলেই শকুনি এসে ভিড় করে। আর, বিষয়ী লোকদের কথা বোলো না। কোনো পদার্থ নেই। যেন গোবরের ঝোড়া।'
খুব সালিশি-মোড়লি করে ঈশান, তাকে সবাই মানে-গোণে। পাঁচটা লোকের যদি উপকার হয় তারই সে সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।
'তোমার ও ভাবনায় কাজ কি? ও সবের জন্যে অন্য থাকের লোক আছে। তোমার এখন সময় হয়েছে, তুমি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দাও। লঙ্কায় রাবণ মরে তো মরুক. বেহুলা কেন কেঁদে আকুল হবে?'
ঘোড়ার গাড়ি করে ঠাকুর যাচ্ছেন ঈশানের বাড়ি। বাবুরাম আর মাস্টারমশাইও চলেছে। শীতকাল। ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কান-ঢাকা টুপি আর মশলার থলে নিয়েছে সঙ্গে করে।
বৈঠকখানায় ঈশানের ছেলে শ্রীশের সঙ্গে দেখা। এণ্ট্রান্স ও এফ-এ-তে প্রথম হয়েছে। এখন এম-এ আর ল পাশ করে ওকালতি করছে আলিপুরে। বিদ্বান অথচ বিনয়ের প্রতিমূর্তি। দেখলে মনে হবে সংসারে আর সব জ্ঞানী-গুণীর কাছে সে-ই একমাত্র অজ্ঞ।
'তুমি কি করো গা?'
'আজ্ঞে, আমি আলিপুরে বেরুচ্ছি। ওকালতি করি।'
'বলে কি গো?' মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর। 'এমন লোকের ওকালতি?' শেষে বললেন, 'হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাঁকে পাবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে।'
শ্রীশের কটা প্রশ্ন আছে।
কর্মভার কমবে কিসে?

ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে-হতে। যতই এগোবে ততই লঘু হবে, মুক্ত হবে। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে পুঁটলি বেঁধেছিলে তারই গ্রন্থি মোচন করে পাল করে উড়িয়ে দেবে নৌকোয়।

সংসারে থেকে তাঁর দিকে এগোই কি করে?

শুধু অভ্যাসযোগে। প্রথমটা কাষ্ঠ-আড়ষ্ট মনে হবে বটে কিন্তু ক্রমশই রপ্ত-মুখস্থ হয়ে যাবে। অভ্যাসের থেকেই অনুরাগ। ভূমিকর্ষণেই মেঘবর্ষণ।

কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকবার সময় কই?

এটা একটা খাঁটি কথা বলেছ। তিনি সময় করে না দিলে কিছুই হবার নয়। ছেলে ঘুমিয়ে পড়বার আগে মাকে বলেছিল, মা, আমার যখন খিদে পাবে তখন আমাকে জাগিয়ে দিস। মা বললেন, খিদেই তোমাকে জাগাবে। আমাকে জাগাতে হবে না। তাই একবার খিদে যদি জাগে তাহলেই সফলমনোরথ।

'কি করবে? কিছুই করবার নেই। শুধু তাঁর পায়ে সব ঢেলে দাও, বিলিয়ে দাও। যা ভালো হয় করুন। আমি নাবালক, আমি ভালো-মন্দের কী বুঝি!'

কিন্তু ঈশ্বরের নাম নিলেই বা ভালো ফল হয় কোথায়?

'বলো কি? বীজ পড়ামাত্রই কি গাছ দেখা দেয়? আগে গাছ, তবে তো ফুল-ফল।'

তবু বপন করো এই নাম-বীজ। বীজের মধ্যেই নিগূঢ় হয়ে আছে নিরুদ্ধ হয়ে আছে বনস্পতি। তুমি জানো না তোমার আয়তন। তোমার পরিমাণ-পরিসর। হৃদয়ের উর্বর ক্ষেত্রে ফেল একবার এই বীজবিন্দু। দেখ কাকে বলে অসাধ্যসাধন। অফল-ফলন।

'আহা, সেই ছেলেটির গল্পটা বলো না!' ঈশানকে অনুরোধ করলেন ঠাকুর।

একটি ছোট ছেলে কোত্থেকে খবর পেয়েছে ঈশ্বরই সব সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বরই এক-মাত্র আপনার লোক। তখন সে ঈশ্বরকে একখানা চিঠি লিখলে। ঠিকানা দিলে স্বর্গ। চিঠি লিখে ফেলে দিল ডাকবাক্সে।

'দেখলে তো! একেই বলে বিশ্বাস। একেই বলে সরলতা। বালকের বিশ্বাস আর বালকের সরলতা।'

ডাকবাক্স তো একটা নয়, তেত্রিশ কোটি ডাকবাক্স। তেত্রিশ কোটি দেবতা। চিঠি পৌঁছুনো নিয়ে কথা। গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা গাঁয়ের ডাকবাক্সেই ফেল বা হেড পোস্ট অফিস বা জি পি-ও-তেই ফেল ঠিকানা ঠিক লেখা থাকলে ঠিক গিয়ে পৌঁছুবে। শুধু ভক্তির টিকিটটি এঁটে দিও। দু-একবার বেয়ারিং হয়ে পৌঁছুতে পারে, শেষকালে, বেশি বেয়ারিং দেখলে রিফিউজ করে দেবে। টিকিটটি এঁটে দেওয়াই শান্তি। যখন ব্যাকুলতার ভাষায় লিখেছ তোমার চিঠি, বিশ্বাস করে ফেলে দিয়েছ তোমার নিকটতম ডাকবাক্সে আর তাতে ভক্তির টিকিটটি এঁটে দিয়েছ, তখন আর ভাবনা নেই, তোমার চিঠি পৌঁছেছে ঠিক জায়গায়। এবার অপেক্ষা করো, এই এল বলে তাঁর প্রত্যুত্তর।

জানো না বুঝি, তিনিও গুণাতীত বালক। বালকে-বালকে বন্ধুত্ব। তুমিও বালক হয়ে যাও।

কালীপ্রসাদ সেদিন এসে খুব আনন্দের কথা বললে। আনন্দই যদি মুখ্য তবে তার মধ্যে আবার শ্রেণীভাগ কি? যার যাতে আনন্দ!

ঠাকুর বললেন, 'তাই বলে ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক?'

দেখ কে বেশি টেঁকসই। স্থানে-কালে কে বেশি পরিব্যাপ্ত। কে নিরবচ্ছিন্ন। কে শ্রান্তিক্লান্তিহীন।

কালী বললে, 'তাঁর শক্তিই তো সব। সেই শক্তিতেই ব্রহ্মানন্দ, সেই শক্তিতেই বিষয়ানন্দ।'

ঠাকুর বললেন, 'সে কি? সন্তান লাভের শক্তি আর ঈশ্বর লাভের শক্তি কি এক?'

কালী বুদ্ধগয়া থেকে ফিরেছে। তাই সব সময় আনন্দের কথা কইছে আনন্দের ধ্যান করছে। সুখই যখন আমার উদ্দেশ্য তখন অল্প সুখে তুচ্ছ সুখে আমার সুখ কি! আমি যে সুখের চেয়েও আরো সুখ চাই। সুখ মানেই তো আরো-সুখ। আরো-সুখ মানেই তো অধিকতম সুখ। সেই অধিকতমই তো ঈশ্বর।

শ্রাবস্তীতে এক নবদম্পতী বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছে। নবীনা বধূ পরিবেশন করছে স্বহস্তে। স্বামী বুদ্ধের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার আতুর দৃষ্টি স্ত্রীর দিকে। বুদ্ধ তার মনের কথা টের পেয়েছেন। বলছেন তাকে, কামনার সমান আগুন নেই, দ্বেষের সমান পাপ নেই, পঞ্চস্কন্ধের সমান দুঃখ নেই, শান্তি বা নির্বাণের সমান সুখ নেই।

পঞ্চস্কন্ধ কি? রূপ, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আর বেদনা। জীব এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধরাজ অজাতশত্রুর কাছে হেরে গিয়েছে যুদ্ধে। বার-বার তিন-বার। সামান্য কাশীগ্রাম নিয়ে যুদ্ধ। তা হলে কি হয়, পরাজয়ের লজ্জায় অনশন সুরু করেছে প্রসেনজিৎ। বুদ্ধ শুনতে পেলেন অনশনের কথা। বললেন, 'জয় বৈরিতা প্রসব করে, পরাজিত বাস করে দুঃখে, মর্মদাহে। যে জয়-পরাজয়ের অতীত তারই অক্ষুণ্ণ শান্তি।'

কাশীপুরের বাগানবাড়ির ভাড়া পঁয়ষট্টি টাকা। তারপর রাঁধুনে বামুন রাখতে হয়েছে, আবার একটি ঝি। অনেক খরচ হচ্ছে।

ঠাকুর বললেন মহেন্দ্র সরকারকে, 'বড় খরচা হচ্ছে।'

'তা হলেই দেখ।' সরকার হাসল, 'কাঞ্চন চাই।'

ঠাকুর নরেনের দিকে তাকালেন। ইচ্ছে সে একটা সমুচিত উত্তর দেয়।

'শুধু কাঞ্চন? কামিনীরও দরকার।'

রাজেন ডাক্তার বললে, 'রান্নার জন্যে অন্তত।'

'দেখলে?'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু বড় জঞ্জাল।'

'জঞ্জাল না থাকলে তো সবাই পরমহংস।'

'টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে দোষ নেই।' বললেন ঠাকুর, 'সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হলেই তবে বিদ্যার সংসার।'

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ঠাকুর যেন একটু ভালো আছেন। রাজেন ডাক্তার ভারি খুশি। বললে, 'সেরে উঠে আপনার কিন্তু হোমিওপ্যাথি করতে হবে। নইলে বেঁচে থেকে লাভ কি?'
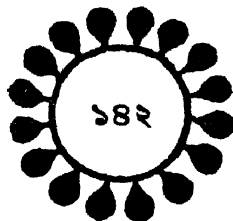
জ্ঞানীর লক্ষণ কি?
লক্ষণ দুটি। বললেন ঠাকুর, 'প্রথম, অভিমান থাকবে না, দ্বিতীয়, স্বভাবটি শান্ত হবে।' থেমে আবার বললেন, 'যার মধ্যে এ দুটো লক্ষণ দেখবে, জানবে তার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ।'
পালকিতে করে নন্দ বোসের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। পরনে লাল ফিতে-পাড় ধুতি, পায়ে বার্নিশ-করা কালো চটিজুতো। উঠে এসেছেন উপরের হল্‌-ঘরে।
ঘর তো নয়, পটের হাট। প্রথমেই চতুর্ভুর্জ বিষ্ণুমূর্তি। দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠাকুর, ভাবাবিষ্ট হয়ে বসে পড়লেন। তারপর এই দেখ নৃসিংহমূর্তি। জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু, বিষ্ণু সর্বগুহাশয়। সেই উদার আধার বিশ্ববিধারক বিষ্ণু। আর দম্ভের স্তম্ভ-বিদারক নৃসিংহ।
আহা, হনুমানের মাথায় হাত দিয়ে রাম আশীর্বাদ করছেন বুঝি। হনুমানের দৃষ্টি রামের পায়ের দিকে। হে নির্মলজ্ঞানচক্ষু, আর কি আশীর্বাদ করবে! তোমার পাদ-পদ্মেই যেন মতি শাশ্বতী হয়।
আর এইটি বুঝি বামন? ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছে বলির যজ্ঞে। এক দৃষ্টে তাকে দেখছেন ঠাকুর। লোকব্যাপারকারণ সর্বব্যাপী প্রকাশিত হয়েও যে ছদ্মবেশী।
তমালশ্যামল কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। রাখাল ছেলেদের সঙ্গে চলেছেন গোষ্ঠে, যমুনা-পুলিনে। আর, দেখ, দেখ, রাই রাজা সেজে বসেছে সিংহাসনে। চারদিকে সখীদের শতদল। সব চেয়ে মজা, কুঞ্জদ্বারে ঐ কোটালটিকে দেখ। চিনতে পেরেছ? ওটি আমাদের কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নয়।
এ সব উগ্রমূর্তি রেখেছ কেন? ধূমাবতী ছিন্নমস্তা বগলা মাতঙ্গী? ও সব মূর্তি রাখলে পুজো দিতে হয়। আর, আহা, এইটি অন্নপূর্ণা। সর্বজনেশ্বরী সর্ব-দানেশ্বরী কল্যাণী। হে সর্ববরকামদে, ভিক্ষে দাও। অন্ন দাও। যে অন্নে তুষ্টি-পুষ্টি-অনাময় সেই অন্ন দাও। জ্ঞানভক্তিবৈরাগ্যই সেই অন্ন।

সুরেশ মিত্তির ঠাকুরের ভাব নিয়ে বিচিত্র একটা ছবি করিয়েছিল, দিয়েছিল কেশব সেনকে। সেটি দেখছি এখন নন্দ বোসের বাড়িতে।
ঠাকুর চিনতে পারলেন! বললেন, 'এ সেই সুরেন্দরের পট।'
কে একজন বললে, 'আপনি আছেন এই ছবির মধ্যে।'
'এ হচ্ছে ইদানীং ভাব।' আত্মগত হলেন ঠাকুর, 'এর মধ্যে সবাই আছে।'
ছবির বিষয়বস্তুটি অভিনব। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনকে দেখিয়ে দিচ্ছেন ভিন্ন-ভিন্ন পথ দিয়ে চলেছে যাত্রীদল। কিন্তু সবাই গিয়ে পৌঁছুচ্ছে সেই চিরস্থিরের সকাশে। অর্থাৎ যত মত তত পথ। কর্ম নানা, বিষয় এক। পথ নানা, লক্ষ্য অভ্রান্ত।
দেখতে তো পাচ্ছ তিনি অনন্ত, তাই তাঁর পথও অন্তহীন। তিনি বিচিত্র তাই তাঁর পথও বহুদিঙ্মুখ। তাঁকে মানলেও তিনি, তাঁকে উড়িয়ে দিলেও তিনি। তাঁর কথা বললেও তিনি, তাঁর কথা চেপে গেলেও তিনি। এক ছাড়া দুই নেই। দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত—যত খুশি বাড়িয়ে যাও, সব সেই একককে নিয়ে। বাড়ির মধ্যে রয়েছে একজন, কেউ ডাকছে খুড়োমশাই, কেউ ডাকছে মামাবাবু, কেউ ডাকছে মেসোমশাই, কিন্তু লোকটি ঠিক বুঝতে পারছে আমাকেই ডাকছে। ঠিক-ঠিক সাড়া দিচ্ছে। যার যেমন তাড়া তার তেমনি সাড়া। কথায় বলে, যেমন গাওনা তেমনি পাওনা। ঐ বারোয়ারি তলার মেলায় দেখনি? বললেন ঠাকুর, 'কত রকম মূর্তি তৈরি করেছে। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম। আবার বেশ্যা তার উপপতিকে ঝাঁটা মারছে, তাও আছে। নানা মতের লোক নানা মূর্তির কাছে ভিড় করে। যারা বৈষ্ণব তারা যায় রাধাকৃষ্ণের কাছে, যারা শাক্ত তারা যায় হরপার্বতীর কাছে, যারা রামভক্ত তাদের লক্ষ্য সীতারাম। আর যাদের ঠাকুরের উপর মন নেই তারা দেখছে ঐ ঝাঁটা-মারা। শুধু তাই নয়, বন্ধুদের ডাকছে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে—ওরে, ও সব কি দেখছিস, এদিকে এসে দ্যাখ, কেমন তৈরি করেছে মাইরি!'
তেমনি বিষয়ী লোক ডেকে বলছে ভক্তদের, ওদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কি দেখছ, এদিকে এসে ভিড় করো, দেখ এই ভূতের নৃত্য!
কিন্তু সারাংশ পরীক্ষা না করে কদলীকাণ্ডে আসক্ত হব না এই বীরত্বই তো ভক্তি। কাম-কাঞ্চনের সুখ, এই আছে, এই নাই। যে সুখ সারাক্ষণ থাকে না সে সুখ আমি সওদা করতে যাব কেন? আমি কেন ঠকে ঠুনকো জিনিস নেব? এত যাচাই-বাছাই করা আমার অভ্যেস, মাণিক ফেলে কাচ কিনব আমি কোন হিসেবে?
'ভোগান্ত না হলে কি চৈতন্য হয়?' জিগগেস করলে নন্দ বোস।
'ও রকম মত আছে বটে। এ কাদের মত জানো? যাদের ভোগ করবার ইচ্ছে তাদের। আহা, ভোগ করবে কি? ঐ তো আমড়া, আঁটি আর চামড়া। খেলেই অম্লশূল।'
'তাহলে চৈতন্য হয় কিসে?'
'একমাত্র তাঁর কৃপায়।'
'তবে সবাইকে কৃপা করছেন না কেন?'
'তাঁর খুশি।'
'এ কেমনতরো খুশি?'

'খুশির আবার এমন-তেমন কি? খুশি খুশি।'
'তা হলে কি বলব ঈশ্বর পক্ষপাতী?' জিগগেস করল নন্দ বোস।
'কার উপর পক্ষপাত করবেন?' ঠাকুরের প্রশান্তমুখ প্রসন্নতায় ভরে গেল। 'সবই তো তিনি। পঞ্চকোটি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, তার মধ্যে দুটো একটা বা কাটিয়ে দিচ্ছেন খুশিমত। সেই মুক্তিতে নিজেই আবার হাততালি দিচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছেতেই সব হচ্ছে।'
'আর তাঁর ইচ্ছেতে আমরা মরছি।'
'তোমরা কোথায়? সব তিনি। তিনিই মরছেন। তিনিই হয়েছেন।'
'এ স্বরূপ বুঝি কি করে?'
'মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে কি ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝা যায়? বুঝে কি বা হবে? নানা খবরে নানা বিচারে কাজ কি। কথাটা আর কিছুই নয়, ঈশ্বরের উপর একবার ভালোবাসা আসে কিনা তাই দেখ। তুমি তাঁর ভালোবাসার জন, এ যদি একবার তাঁকে বোঝাতে পারো, তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। কথাটা আর কিছুই নয়, আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও। কত ডাল, কত পাতা এ হিসেবে দরকার কি?'
নন্দ বোস গদগদ হয়ে তন্ময়ের মত বললেন, 'আমগাছ কোথায়?'
'আহা, নিত্যবৃক্ষ। শুধু বৃক্ষ? তিনি কল্পতরু। প্রার্থনা করো, কাঁদো। তরুর মূলে ফল আপনা থেকে খসে পড়বে।'
আমরা কি কাঁদি না? আমরাও কাঁদি। কিন্তু যে অশ্রু ফেলি সে অশ্রু অমল অশ্রু নয়, আবিল অশ্রু। আকাঙ্ক্ষায় আবিল, ভালোবাসায় অমল নয়।
'নাকের দিক দিয়ে যে চোখের কোণ সে কোণ দিয়ে যে জল আসে সে হচ্ছে অনুতাপের অশ্রু আর অন্য প্রান্ত দিয়ে যে জল আসে সে হচ্ছে ভালোবাসার।' গঙ্গাধরকে বললেন একদিন ঠাকুর।
'হ্যাঁ রে, ধ্যান করতে-করতে চোখে জল এসেছিল?' জিগগেস করলেন গঙ্গাধরকে : 'প্রার্থনা করতে-করতে?'
'এসেছিল।'
'তবে আর কি। তবে আর ভাবনা নেই। কিন্তু কি করে প্রার্থনা করতে হয় জানিস?'
চুপ করে রইল গঙ্গাধর।
'ছোট ছেলের মত হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে হয়। কাঁদতে হয় অঝোরে। নাছোড়বান্দার মত। বলতে হয়, মা, আমাকে জ্ঞান দে, ভক্তি দে। আমি আর কিছুই চাইনে মা! তুই ছাড়া আমার আর কে আছে? তোকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব?'
কি আশ্চর্য, নিমেষে ঠাকুর ছোট ছেলেটির মতন হয়ে গেলেন। কাঁদতে লাগলেন হাত-পা ছুঁড়ে, কাঁদতে লাগলেন নিরর্গল।
ছোট ছেলেরই ঐশ্বর্য নেই। দারিদ্র্যে সে দীন নয়, নগ্নতায় সে রিক্ত নয়, ধূলিতেও সে শুচিস্নাত। ঐশ্বর্য জুটতে শুরু করলেই সে সরতে আরম্ভ করে।
'ঐশ্বর্যের স্বভাবই ঐ। ঐ দেখ না যদু মল্লিককে।' বললেন ঠাকুর, 'বেশি ঐশ্বর্য হয়েছে, তাই আজকাল আর ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে-আগে বেশ কইত।'

'আচ্ছা মশাই, পরলোক কি আছে?' নন্দ বোস আবার প্রশ্ন করল।

'থাকলে আছে, না থাকলে নেই। কি দরকার ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? আধ বোতল মদেই যখন মাতাল হও, শুঁড়ির দোকানের বোতলের হিসেবে দরকার কি? একটা জন্মেই যখন ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—'

'তবু যদি বলেন—'

'সোজা কথা, যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ না হচ্ছে ততক্ষণ বারে-বারে যাতায়াত করতে হবে সংসারে। যতক্ষণ কাঁচা মাটি থাকবে কুমোরের চাকে উঠতে হবে পাক খেতে।'

যতক্ষণ ঘট তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ কুম্ভকার রেখে দেবেন দণ্ড-চক্র। যতক্ষণ নদী অনুত্তীর্ণ ততক্ষণ নৌকো ভাসাবেন কর্ণধার।

যখন আমরা চলি তখন এক পা মাটিতে রেখে আরেক পায়ে মাটি ত্যাগ করি। এক পায়ে ত্যাগ আরেক পায়ে গ্রহণ। এমনি করে ধরে আর ছেড়ে, ছেড়ে আর ধরে আমরা এগোই। যতক্ষণ না মেলে আমাদের গন্তব্যস্থল। জোঁক কি করে? পূর্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে গ্রহণ করে তৃণান্তর। তেমনি প্রাক্তন দেহ ত্যাগ করে ধরছি নবীন দেহ। এক দীপের আলো বহন করছি আরেক দীপে। যতক্ষণ না তার মুখখানি দেখি। তন্তু ছাড়া পটোৎপত্তি অসম্ভব। তেমনি মৃত্যু ছাড়া জন্ম অমূলক।

জীবনটা যখন পেয়েছ তখন সম্ভোগ করে যাবে তো? আর সে সম্ভোগে সুখ কোথায় যে সম্ভোগে নিশ্চিন্ততা নেই? সংসারে নিশ্চিন্ত কে? একমাত্র ভক্তই নিশ্চিন্ত। তারই একমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধি। সারাবলোকিনী প্রজ্ঞা। সমস্ত জীবনভোর তার প্রসন্ন বায়ুর দাক্ষিণ্য। অনুকূল হাওয়া দিলে মাঝি কি করে? কেবল হাল ধরে বসে থেকে তামাক খায়। অনুকূল বায়ুই হচ্ছে ভক্তি। হাল হচ্ছে ঈশ্বর। আর তামাক খাওয়া হচ্ছে জীবনসম্ভোগ।

বারে-বারে আসব। আমার পুলক-পুজাঞ্জলি দিয়ে যাব তোমাকে। শেষে নিজেকে দিয়ে যাব উৎসর্গ করে। তার আগে আমার ছুটি নেই, চাইও না। আমার সমস্ত দৈন্যকে যতক্ষণ না বৈভবরূপে দিতে পারছি তোমার হাতে ততক্ষণ আমারও বিশ্রাম কোথায়? আমার সমস্ত অপচয়ের পরিপূর্তি তো তুমিই।

তুমি আত্মা, আমার পঞ্চপ্রাণ তার সহচর, শরীর গৃহ, বিবিধ উপভোগরচনাই পূজা, নিদ্রা সমাধিস্থিতি, পদসঞ্চার প্রদক্ষিণবিধি আর আমার সমস্ত বাক্য তোমার স্তোত্র। আর যত কর্ম আমি করছি সমস্ত তোমারই আরাধনা।

কি প্রার্থনা ঠাকুরের অন্তরের? যদি একটি মানুষেরও দুঃখ মোচন করতে পারি, ঊর্ধ্বগমন পথে যদি একটি আত্মাকেও সাহায্য করতে পারি, আমি জন্ম-জন্ম আসব, হোক না তা অতি নীচ জন্ম। সেবাই আমার পরাপূজা। মা, আমাকে বেহুঁস করিস না। সমাধি সুখের হাত থেকে রেহাই দে মা! আমাকে ডুবিয়ে দিস না মা, আমাকে সন্তরণ করতে দে। সন্তরণেই সিন্ধুতরণ।

অসুখ বেড়েছে, কাউকে কাছে আসতে বারণ, ঠাকুর কাতরস্বরে বলছেন, 'আজ আর কেউ তো এল না? আজ তো আমি কারুর কাজে লাগলাম না? আমার এ কষ্ট কি কম গা?'

সৌরালোকে যে অখিল জগৎ প্রতীত, তাকে কে সন্দেহ করে? তেমনি আমাকেই বা কার সন্দেহ? আমিই সেই নিত্যস্ফূর্তিময় নির্মল সদাকাশ। মহামোহান্ধকার থেকে আমিই একমাত্র বিনির্গত। আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমাকেই বা কার সন্দেহ? আমিই অখণ্ড বোধস্বরূপ আনন্দ, আমিই পরাৎপর ঘনচিৎপ্রকাশ। মেঘ যেমন আকাশকে স্পর্শ করে না তেমনি সাধ্য কি সংসার-দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে?
একটা বেরাল তার বাচ্চা নিয়ে কাশীপুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাই নিয়ে ঠাকুরের মহাভাবনা। একদিন নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী এসেছে, তাকে একটু একান্তে টেনে নিলেন ঠাকুর। কুণ্ঠিত মুখে জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ গা, তোমাকে একটা কথা বলব?'
বলুন। আপনি বলবেন তাতে আবার কথা কি! নবগোপালের বউ যেন নিজেই সঙ্কুচিত হল।
'দেখ আমার এখানে একটা বেরাল আছে, তার আবার কতগুলি বাচ্চা—'
মমতাময় কণ্ঠস্বর। তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল নবগোপালের স্ত্রী।
'কিন্তু জানো, এখানে মাছ নেই, দুধ নেই। বড় কষ্ট হচ্ছে তাদের। তোমাকে যদি দিই নিয়ে যাবে?'
আপনার দান নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। ঘোষপত্নী হাত পাতল।
এততেও হল না। ঠাকুরের মুখে তখনও কুণ্ঠার কুয়াশা লেগে। বললেন, 'নেবে যে, তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না তো?'
না, না, অসুবিধে কি। আমি তো বেরাল ভালোবাসি।
'কিন্তু তোমার বাড়ির কর্তারা যদি অমত করে? যদি কেউ বিরক্ত হয়? যদি কেউ মারে বেরাল-ছানাকে?'
নবগোপালকে ডাকানো হল। সেও যখন সায় দিলে তখন ঠাকুর নিশ্চিন্ত, তখন তাঁর মুখ ভরে উঠল খুশিতে।
এই নবগোপালেরই শেষকালে নাম হয়েছিল 'জয় রামকৃষ্ণ'।
ওরে চল্, ঐ 'জয় রামকৃষ্ণ' আসছে রে, চল বাতাসা নিয়ে আসি।
যেদিন ঠাকুর কল্পতরু হন সেদিন সেখানে নবগোপালও মোতায়েন। রাম দত্ত ছুটে এসে বললে, 'বসে আছেন কি! ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন। যান, যান, শিগগির যান, যা চাইবার চেয়ে নিন এইবেলা।'
নবগোপাল ছুটল। ঠাকুরের পায়ের কাছে নুয়ে পড়ে বলল, 'আমার কি হবে?'
'একটু ধ্যান জপ করতে পারবে?'
বলো পারব, একশোবার পারব, কেন পারব না? কিন্তু নির্ভয়ে নবগোপাল বললে, 'আমার সময় কোথায়? ছাপোষা গেরস্থ লোক সংসারের ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—'
'ধ্যান না হোক, একটু একটু জপ করতে পারবে না?'
'তারই বা সময় কই?'
যখন কাছে এসে পড়েছে, কিছু ফল নেবেই সে কুড়িয়ে। তখন ঠাকুর বললেন, 'জপ করতে না পারো, আমার নাম একটু-একটু করতে পারবে? সময়ে-অসময়ে, যখন

খুশি, যখন তোমার মনে পড়বে—কোনো বাঁধাধরা নেই—আইন-কানুন নেই—পারবে?'

'তা পারব।'

'তা হলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে।'

সেই থেকে নবগোপালের মুখে শুধু 'জয় রামকৃষ্ণ।' পাড়ার ছেলেরা তার পিছু নেয় আর হাত-তালি দিয়ে বলে 'জয় রামকৃষ্ণ'। আফিস থেকে যখন ফেরে দরজায় বাতাসার ঠোঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চাকর। চল, চল, ঐ 'জয় রামকৃষ্ণ' আসছে, বাতাসা বিলোবে এবার। চল বাতাসা নিয়ে আসি।

ছেলেরা জড়ো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায় নবগোপালকে। 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে নাচে। মুঠো ভরে বাতাসা নেয়।

কালীঘর থেকে প্রসাদ পেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল গঙ্গাধর। ঠাকুর তার হাতে একটা পানের খিলি দিলেন। বললেন, 'খা, খাবার পর দুটো একটা খেতে হয়—'

কুণ্ঠিত মুষ্টি খুলে দিল গঙ্গাধর। ঠাকুর বললেন, 'নরেন একশোটা পান খায়। যা পায় তাই খায়। এত বড়-বড় চোখ, ভিতর দিকে টান। সব নারায়ণময় দেখে। কলকাতায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, বাড়ি-ঘর গাড়িঘোড়া সব নারায়ণময়। তুই তার কাছে যাবি, খুব খাবি আর তার সঙ্গ করবি।'

সেই নরেনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কাশীপুরের বাড়িতে। ঠাকুরকে সারাক্ষণ দেখবার জন্যে যে বাড়িঘর লেখাপড়া ছেড়ে চলে এসেছে কাশীপুর, সে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে কয়ে চলে গেল উধাও হয়ে! একদিন যায় দুদিন যায়, কোনো খোঁজ-খবর নেই। শুধু একা যায়নি মনে হচ্ছে, তারক আর কালীপ্রসাদও অনুপস্থিত! কোথায় গেল, কোথায় গেল নরেন?
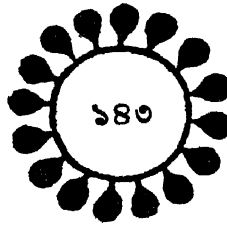
'নরেন কি নিষ্ঠুর!' আক্ষেপ করছেন ঠাকুর। 'আমার এই অসুখ আর এই সময়ে আমাকে ও ছেড়ে গেল! কানাই ঘোষালের ছেলে, যাকে এখানে সে আশ্রয় দিল, সেই তারক ওকে নিয়ে গেল ভুলিয়ে। আর কালীকেও সঙ্গে নিলে!'

বালককে যেমন সান্ত্বনা দেয় তেমনি করে বললে একজন : 'কোথায় আর যাবে! এই এসে পড়বে একদিন হুট করে।'

'সত্যিই তো যাবে কোথায়!' ঠাকুরের কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত হল : 'তার আর আছে কোন আস্তানা? ওলতলা বেলতলা, সেই আসতে হবে ফের বুড়ির কাছে। আমার কাজের জন্যে মহামায়া যখন তাকে এনেছে তখন আমার পেছনেই তাকে ঘুরতে হবে। যাবে কোথায়!'
কিন্তু সত্যি কি আর নরেন ফিরবে? সে চলে এসেছে বুদ্ধগয়া।
নির্বেদ এসেছে নরেনের মনে। সমস্ত মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে নির্বাণ-নগরীর দিকে! কঠোর তপস্যায় যদি ঈশ্বর দর্শন হল তো হল নইলে আসনে বসেই দেহপাত করে যাব। ঠাকুরের স্নেহ ও বন্ধন, সেই বন্ধনও ছিন্ন করতে হবে।
'হে ভবতৃষ্ণা, বহু জন্ম ধরে আমার এই দেহগৃহ নির্মাণ করে আসছ, এইবার সেই দেহ ভেঙে দিলাম। আর পারবে না বাসা বাঁধতে।' উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন বুদ্ধদেব।
নির্বাণ-নগরের দ্বাররোধ করে দাঁড়িয়ে আছে 'তনহা', তৃষ্ণা—তোমার কামনা-বাসনা। তারাই কর্মের সৃষ্টি করছে আর সেই কর্মের সংস্কার সঞ্চিত হয়ে তৈরি করছে মাকড়সার জাল। তারই নাম 'মার'। এই 'মার'কে পরাভূত করতে হবে, ছিন্ন করতে হবে ঊর্ণাতন্তু। সেই বাসনার বোঝা ফেলে দিতে পারলেই হালকা হবে তোমার দেহ-নৌকা। তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে সেই নির্বাণ-বন্দরে।
ও তো হল নিজের মুক্তির কথা। নিজে সরে পড়া। তা হলে চলবে না, পরের কথাও ভাবতে হবে, অন্যকেও পৌঁছে দিতে হবে সেই আনন্দলোকে। প্রেমে ও প্রসাদে করুণায় ও মৈত্রীতে তোমার শূন্যতাকে ভরে তোলো। প্রেমপ্রবাহে প্রসারিত হয়ে পরিপ্লুত করো সবাইকে।
মৈত্রী করুণা মুদিতা আর উপেক্ষা।
'সুখং বসতি মিত্রাণি বিবর্ধতু সুখঞ্চ বঃ।' 'হে মিত্রগণ, তোমরা সুখে থাকো ও তোমাদের সুখ বর্ধিত হোক। এই হচ্ছে মৈত্রী। আর শত্রুর দুঃখে হৃষ্ট না হয়ে বলো, তোমার সর্বদুঃখের বিমোচন হোক। এই হচ্ছে করুণা। আর মুদিতা কি? আমাদের মতের বা পথের যারা বিরোধী তাদের অভ্যুদয়ে আমাদের আর ক্লেশ নেই, তাদের পুণ্যাংশ চিন্তা করে মনে আনো এবার প্রসন্নতা। আর উপেক্ষা কাকে বলে? কে পাপকারী? কার প্রতি তোমার এত অবজ্ঞা, এত ক্রূরতা? কার তুমি বিচার করবে? বলো, আমি নিজেই পাপকারী, নিজেই বিচারপ্রার্থী, তোমাকে আর আমি কি বলতে পারি? এই মনোভাবের নামই উপেক্ষা। এই সব ভাবনা করে চিত্তের শোধন-সাধন করো।
বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কুশীনারায় দেহ রাখছেন তথাগত, ম্লান মুখে শিষ্যরা চেয়ে আছে তাঁর দিকে। আনন্দকে ডেকে নিলেন কাছটিতে, বললেন, 'আনন্দ, আত্মদীপ হও। জ্ঞানালোকের জন্যে বাইরে কোথাও অনুসন্ধান কোরো না। তোমরা নিজেরাই তোমাদের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র উৎস। একমাত্র প্রদীপ। সত্য যদি কোথাও থাকে তা তোমাদের নিজেদের মধ্যে।''
অহংকে আত্মাতে দান করো। তা হলেই দুঃখের অপসরণ হবে। কার দুঃখ, কার

সুখ? তোমার নিজের সুখ ঘটিয়েই বা তোমার শান্তি কোথায়? অন্যের সুখেই যে তোমার সুখের নিশ্চিন্ততা। সুতরাং এক সুখ এক দুঃখ। তোমার আমার সুখ নয়, নয় তোমার আমার দুঃখ। দুঃখ দুঃখ বলেই নিবারণীয়, আমার তোমার বলে নয়। তেমনি সুখ সুখ বলেই প্রাপণীয়, আমার তোমার বলে নয়। এক অখণ্ড দুঃখ, এক অভিন্ন সুখ। নিজ-নিজ খণ্ড-খণ্ড সুখ আহরণ করতে গিয়েই একে অন্যকে দুঃখ দিয়ে নিজ-নিজ দুঃখের বোঝা বাড়াচ্ছি। যেমন এক দেহ তেমনি এক পৃথিবী। অঙ্গের এক অংশের ব্যাধিতে সর্বদেহ নিপীড়িত, তেমনি এক অংশের আরোগ্যে সর্বদেহের নৈরুজ্য নেই। চাই সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্য। সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য। আমি স্ফীত আর তুমি বিশীর্ণ, তার অর্থ সমস্ত দেহই কদাকার, রোগক্লিন্ন। কোথাও গণ্ডী নেই, পৃথক সত্তা নেই। তাই সকলের দুঃখমোচন সকলের সুখসাধন চাই। তা কিসে হবে? তার উপায় কি? একমাত্র উপায় মৈত্রী। আকাশজোড়া প্রকাণ্ড প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর, ভালোবাসা।

'সুখের আকাঙ্ক্ষা বর্জন না করলে দুঃখ দূর হয় না।' বললেন বুদ্ধদেব। 'সংসারে যারা দুঃখ পায় সুখের ইচ্ছাতেই সে দুঃখ পায়। আর যারা সুখী হয় পরের সুখেচ্ছাতেই সুখী হয়। সুতরাং "আমি"কে দান করো। নিজের আর পরের উভয়ের দুঃখ দূর করবার জন্যে উৎসর্গ করো "আমি"কে।'

নদীতীর দিয়ে যাচ্ছে আনন্দ, দেখল একটি মেয়ে কলসীতে জল ভরছে। কলসী কাঁখে নিয়ে চলে যাচ্ছে মেয়েটি, আনন্দ তার কাছে এসে বললে, 'আমি তৃষ্ণার্ত, আমাকে একটু জল দেবে?'

মেয়েটি তাকাল চোখ তুলে। আনন্দের অঞ্জলিতে জল ঢেলে দিল।

জল খেয়ে চলে যাচ্ছে আনন্দ, মেয়েটি তার পিছু নিল। তোমার তৃষ্ণা দূর করলাম, এবার আমার তৃষ্ণা দূর করো।

ঘরে ফিরে এসে ধূলোয় শুয়ে কাঁদতে লাগল মেয়ে। মা মাতঙ্গীকে বললে, 'আমি দেখে এসেছি কোথায় তিনি থাকেন। তাঁর নাম আনন্দ। আমার যদি বিয়ে দিতে চাও তবে তাঁর সঙ্গেই বিয়ে দাও। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না।'

কে আনন্দ, সন্ধানে বেরুল মাতঙ্গী। আনন্দ? তাকে চেনো না? সে যে শ্রমণ। বুদ্ধ-শিষ্য।

'এ তোর কী অসম্ভব কথা?' মা ফিরে এসে শাসন করল মেয়েকে। 'সে বুদ্ধের ভক্ত, সে কি করে বিয়ে করবে?'

'মা, তুমি তো মন্ত্রতন্ত্র জানো। এবার সেই শক্তি প্রয়োগ করো।' মেয়ে মায়ের পা চেপে ধরল।

আহার-নিদ্রা ত্যাগ করল মেয়ে। মায়ের মন গলল। গৃহে ভিক্ষা নেবার জন্যে নিমন্ত্রণ করল আনন্দকে।

আসছে? আসবে বলেছে? মেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সর্বাঙ্গে।

আনন্দ এসে দাঁড়াল ভিক্ষাপাত্র হাতে। মাতঙ্গী বললে, 'আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করো।'

শান্ত স্বরে বললে আনন্দ, 'আমি শীল গ্রহণ করেছি, স্ত্রী গ্রহণ করতে পারি না।'
'তোমাকে পতিরূপে না পেলে আমার মেয়ে আত্মহত্যা করবে।'
কোনো অনুনয় কানে তুলল না আনন্দ। ফিরে যাবার জন্যে যাত্রা করল।
'তোমার তন্ত্রমন্ত্র কোথায় গেল?' মায়ের উদ্দেশে গর্জে উঠল মেয়ে। 'কোথায় তোমার ইন্দ্রজাল?'
'এমন মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নেই যা বুদ্ধ বা বুদ্ধের শিষ্যদের অভিভূত করতে পারে।' অসহায়ের মত বললে মাতঙ্গী।
'তা হলে দ্বার বন্ধ করে দাও।' আকুলা কন্যা আবার রোদন করে উঠল। 'আমার কাছেই রয়েছে সে ইন্দ্রজাল। রাত্রি সমাগত হলে স্বভাবতই উনি আমার পতি হবেন।'
মাতঙ্গী দ্বার বন্ধ করে দিল। মন্ত্র দিয়ে বদ্ধ করলে আনন্দকে। মেয়ের জন্যে শয্যা-রচনা করলে।
আনন্দ অক্ষুন্ন উদাসীন। সর্বজ্বরবিবর্জিত।
মন্ত্রবলে আগুন আকর্ষণ করল মাতঙ্গী। আনন্দকে টানতে-টানতে নিয়ে এল অগ্নি-কুণ্ডের কাছে। বললে, 'যদি আমার মেয়েকে এ দণ্ডে বিয়ে না করো তবে তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করব।'
কি আশ্চর্য, মন্ত্রের মায়া কাটাতে পাচ্ছি না এখনো? একমনে বুদ্ধদেবকে ডাকতে লাগল আনন্দ। আগুন নিবে গেল। খুলে গেল রুদ্ধ দ্বার।
গৃহগণ্ডী থেকে বেরিয়ে এলো আনন্দ।
'মা, ও যে চলে যায়!' মেয়ে আবার কেঁদে উঠল অনাথার মত।
মা বললে, 'আমি আগেই বলেছি আমার মন্ত্রের এমন ক্ষমতা নেই বুদ্ধের শিষ্যকে বশীভূত করতে পারে।'
তবু আনন্দচিন্তা ত্যাগ করতে পারল না মেয়ে। পরদিন সকালে উঠে আবার চলল আনন্দের সন্ধানে। আনন্দ ভিক্ষায় বেরিয়েছে, পিছু-পিছু চলল তার ছায়া হয়ে। বিহারে এসে ঢুকল, মেয়ে তবু কাঁদতে লাগল দ্বারের বাইরে।
বুদ্ধদেব তাকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'তুমি কি চাও? কেন আনন্দের পিছু নিয়েছ?'
স্পষ্ট দুঃসাহসে বললে তরুণী : 'আনন্দকে পতিরূপে বরণ করতে চাই।'
বুদ্ধদেব বললেন, 'তাকিয়ে দেখেছ আনন্দের দিকে?'
'দেখেছি।'
'তার মাথায় চুল নেই দেখেছ?'
'দেখেছি।'
'কিন্তু তোমার মাথা-ভরা চুল। তুমি আনন্দের মত মাথা মুণ্ডন করতে পারবে? নির্মূল করতে পারবে কেশভার? যদি পারো তোমার হাতে দিয়ে দেব আনন্দকে।'
'পারব।'
'তবে যাও, মাথা মুণ্ডন করে এস।'

মেয়ে ফিরে গেল মায়ের কাছে। বললে, 'তোমার মন্ত্রতন্ত্র যা পারেনি তা অনায়াসেই সফল হতে চলেছে। বুদ্ধ বলেছেন ক্ষুর দিয়ে মাথা মুড়িয়ে নিলেই পাব সেই পরমরম্যকে।'
মাতঙ্গী ক্রুদ্ধ হল। বললে, 'আহা, কি রূপের ছিরি হবে তখন! বলি, দেশে কত ধনী-গুণী লোক আছে, তাদের কাউকে মনোনীত কর। শ্রমণ ছাড়া কি আর মোহন-মনোরম নেই?'
'মরি আর বাঁচি, আমি আনন্দের।'
অভিশাপ দিল মাতঙ্গী। তবু মেয়ে নিরস্ত হয় না। তখন কি আর করে, কাঁদতে-কাঁদতে মেয়ের মাথা কামিয়ে দিল ক্ষুর দিয়ে।
মুণ্ডিত মাথায় বুদ্ধ সমীপে দাঁড়াল এসে মেয়ে। বললে, 'আমি এসেছি। এবার দিন আমার আনন্দকে।'
'তুমি আনন্দকে ভালোবাসো?' জিগগেস করলেন বুদ্ধদেব।
'বাসি।'
'দেহের কোন অংশ ভালোবাসো?'
'চোখ কান নাক মুখ, চলন বলন, সমস্ত—'
'চোখে কানে মুখে নাকে দেহের প্রতি অংশেই ঘৃণিত মল। ক্লেদে-কলুষে মানুষের জন্ম, ক্লেদে-কলুষেই মানুষের মৃত্যু। কাকে তুমি ভালোবাসছ? এই নশ্বর দেহকে? যার অস্তিত্বেও দুঃখ অবসানেও দুঃখ? সত্যি যদি আনন্দ চাও, এমন আনন্দের সন্ধান করো যার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই।'
দেহের অভ্যন্তরের কঙ্কালদর্শন হল তখন সেই তরুণীর। সেই তো সত্যদর্শন। স্বরূপদর্শন। সেই দর্শনে দিব্যজ্ঞান হল। অর্হত্ব লাভ করল।
বুদ্ধদেব বললেন, 'এবার চলে যাও আনন্দের ঘরে।'
শ্রমণা তখন পড়ল প্রভুর পাদমূলে। বললে, 'ভগ্নতরী ফেলে এবার তীরে এসে উঠেছি। অন্ধের যষ্টিলাভ হয়েছে। আর আমার কোনো বাসনা নেই।'
আমি শান্ত হয়েছি, অভাবনামুক্ত হয়েছি, অপ্রমাদচিত্ত হয়েছি। আর আমি কিছু চাই না।
আমি দীপাকাঙ্ক্ষীর দীপ, শয্যাকাঙ্ক্ষীর শয্যা, আরোগ্যাকাঙ্ক্ষীর মহৌষধ। যতক্ষণ না ব্যাধির বিচ্ছেদ হচ্ছে ততক্ষণ তার শয্যাপার্শ্বে চলবে আমার পরিচর্যা। যতদিন আকাশ থাকবে যতদিন জগৎ থাকবে ততদিন জগতের সর্বদুঃখ অপনয়ন করতে আমিও থাকব।
বৈশালী থেকে রাজগৃহে ফিরছেন বুদ্ধদেব। দেখলেন নগরের উপকণ্ঠে এক ব্রাহ্মণ চাষী তার গৃহে খুব উৎসবে মেতেছে। চলছে নৃত্য, চলছে গান ভোজন। কি ব্যাপার? নতুন ফসল উঠেছে ঘরে, ভবনাঙ্গন ভর-ভর, তাই এই উৎসব। ভিক্ষাপাত্র হাতে বুদ্ধদেব দাঁড়ালেন এসে দুয়ারে। বললেন, 'ভিক্ষা দাও।'
'এখানে কিছু হবে না।' ব্রাহ্মণ, নাম ভরদ্বাজ, তিরস্কার করে উঠল। 'কত কষ্টে জমি চষে ঠিকমত সময়ে বীজ বুনে দেহপাত পরিশ্রম করে শস্য ফলাই, আর তুমি

বিনাশ্রমের ভিখিরি, দিব্যি হাত পেতে আমাদের উপভোগে ভাগ বসাতে চাও। লজ্জা করে না! আমার কথা শোনো। ঘরে ফিরে যাও। চাষ করো জমি। বীজ বোনো। পরিশ্রমের ফসল ফলাও।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'বন্ধু, আমিও জমি চাষ করি বৈকি। আমিও বীজ বুনি। মানব-জীবনই আমার ভূমি। বীর্য বৃষ, বিনয় হল, প্রজ্ঞা ফাল। সৎকর্মের বৃষ্টিতে ভূমি উর্বর হয়, তারপর সম্যক দৃষ্টির বীজ বুনি। কর্ষণে-কর্ষণে যে জঞ্জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার নাম তৃষ্ণা। তারপরে ভূমি ফল দেয়। আর সেই ফলের নাম নির্বাণ।'

'অমন কথা সব ভিক্ষুই বলে থাকে।' প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করল ভরদ্বাজ। 'দেখাতে পারো?'

'পারি। এস আমার সঙ্গে।'

নগরের প্রমোদ-উদ্যানে পৌরনাগরদের ভিড় হয়েছে। কি ব্যাপার? নগরের প্রধানা নর্তকী কুবলয় নাচছে রঙ্গমঞ্চে। সেইখানে ভরদ্বাজকে নিয়ে হাজির হলেন বুদ্ধদেব।

স্পর্ধিনী রূপসী নাচছে লাস্যের তরঙ্গ তুলে। কামার্ত চোখে নগরবিলাসীর দল পান করছে রূপসুধা। অনন্ত রূপের আধার প্রভু তথাগত যে পাশে দাঁড়িয়ে সে দিকে কারু চোখ নেই।

নাচতে-নাচতে হঠাৎ জনতাকে লক্ষ্য করে কুবলয় বলে উঠল, 'আমার মত সুন্দরী আর দেখেছ কাউকে সংসারে?'

লালসাবিলোল চোখে হতবাক জনতা নিস্পন্দ হয়ে রইল।

'আমি দেখেছি।' জনতার মধ্য থেকে বলে উঠলেন বুদ্ধদেব। 'আর সে তোমার থেকে শত সহস্রগুণ বেশি সুন্দরী।'

'কোথায়? কোথায়?' মিলিত স্বরে জনতা হুঙ্কার করে উঠল। 'দেখাও সেই সুন্দরীকে।'

'দেখাচ্ছি।'

কোত্থেকে দেখাবে? কুটিলকটাক্ষ হেনে আবার নাচতে লাগল কুবলয়। লাবণ্যের সরোবরে ফুটতে লাগল আবার লাস্যের শতদল।

বুদ্ধদেব তার দিকে অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন।

এ কি! এ কি অঘটন!

ক্রমে-ক্রমে মাথার চুলে পাক ধরল নটিনীর। কুন্দদন্ত খসে পড়ল একে-একে। দুই গালে গহ্বর হয়ে গেল। দুই চোখ প্রবেশ করল কোটরে। ধীরে-ধীরে মৃত পত্রের মত খসে পড়ল রূপ-লাবণ্য। বরাঙ্গ কঙ্কালে পরিণত হল। বিবসনা হয়ে দাঁড়াল রঙ্গমঞ্চে। ভয় পেয়ে কেউ চোখ বুজল, কেউ বা ঘৃণায় পালিয়ে গেল সভা ছেড়ে।

প্রভু বললেন, 'কুবলয়, এবার দর্পণে নিজেকে দেখ। দেখ কত সহস্র গুণ সুন্দরী হয়ে উঠেছ। মায়াবসন ছেড়ে ধরেছ এবার তোমার নিত্য সৌন্দর্যের আকৃতি।'

বসন কুড়িয়ে নিয়ে কুবলয় প্রভুর পাদমূলে লুটিয়ে পড়ল। বলল, 'চিনতে পেরেছি তোমাকে। তোমার করুণা অন্তহীন। তুমি নির্বাচিত করেছ আমাকে। তোমার চরণতলে ডেকে নিয়েছ নিজের থেকে। প্রভু, আর আমাকে বিচ্যুত কোরো না।'

'আমিও চিনেছি তোমাকে।' ভরদ্বাজও ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। 'তুমি কোন কৃষির কৃষক? কি তোমার হল-বৃষ? কি তোমার বৃষ্টিধারা? আমাকেও ডেকে নাও তোমার চাষের কাজে। আমাকেও কৃষাণ করো।'
ঠাকুর বললেন, 'আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী খেতে আসছে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিদ্র সব খুব বড়-বড় দেখি। সব যেন রাক্ষসীর মত। আগে ভারি ভয় ছিল। কারুকে কাছে আসতে দিতাম না। এখন তবু অনেক করে মনকে বুঝিয়ে মা আনন্দময়ীর এক-একটি রূপ বলে দেখি।' আবার বলছেন, 'দেখ, ছাদে একবার উঠতে পারলে হয়। ওঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। কি বলো, যায় না? কিন্তু সিঁড়িতে নাচো, তোমার সাধ্য কি। সাধকের অবস্থায়ই খুব সাবধান। তখন মেয়েমানুষ থেকে অন্তরে থাকো। একবার সিদ্ধ হয়ে যেতে পারলে আর ভয় নেই। তখন মেয়েমানুষ মাত্রই সাক্ষাৎ ভগবতী।'
বলরাম বোসের বাড়ির একতলায় তখন একটা বালিকা বিদ্যালয় বসে। শৌচান্তে ঠাকুরের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে বাবুরাম, ইস্কুলের একটা মেয়ে আঁচলে-বাঁধা চাবির গুচ্ছ ঘোরাতে-ঘোরাতে চলে গেল সমুখ দিয়ে। বাবুরামকে বললেন ঠাকুর, 'দেখে রাখ্। পুরুষদের ঐ রকম করে বেঁধে বন-বন করে ঘোরায় মেয়েরা। তুইও কি ওদের হাতে পড়ে ঐ রকম করে ঘুরতে চাস?'
স্বগতোক্তি করছেন ঠাকুর। 'আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়িকে জিগগেস করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হল না। খানিক পরে ভাবলুম, আমি সংসার করিনি, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই! সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কি রকম বশ!'
'সেই পাঁড়ে জমাদার খোট্টা জমাদারকে চেনো? তার চৌদ্দ বছরের বউ! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে-খুলে লোকে দেখে। তাকে আগলাতে-আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায় জমাদারের।'
তিন বন্ধু, নরেন কালী আর তারক, গয়ায় নেমে সাত মাইল পথ হেঁটে সোজা চলে এল বোধগয়ায়। এই সেই বোধিদ্রুম, এই সেই শিলাসন। এখানে বসেই জগৎ সংসারের দুঃখ নিবারণের তপস্যা করেছিলেন বুদ্ধদেব। মানুষের মুক্তি কিসে, এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন। দুঃখ নিবারণের উপায় তৃষ্ণার উন্মূলনে। আর মানুষের মুক্তির উপায় আত্মার উন্মীলনে।
একদিন সন্ধ্যার নির্জনে সেই শিলাসনে বসে ধ্যানস্থ হল নরেন। কতক্ষণ পর পাশে বসা তারকের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।
'সে কি, কাঁদছ কেন?'
'ভাই, বুদ্ধদেবকে দেখলাম। সেই করুণাঘন ক্ষমাসুন্দর প্রশান্ত মূর্তি।'
মন্দিরের মোহান্তের আশ্রয়ে তিনদিন ছিল কোনো রকমে। তিনদিনের পরেই পিছটান। আবার ঠাকুরের কথা মনে পড়ল। সেই সরল সুন্দর প্রেমস্মিত স্নিগ্ধ হিরণ্ময় পুরুষ। তাঁকে ছাড়া সব যেন নিরুদক মরুভূমি। চল, চল ফিরে চল নিজের ঘরে। কিন্তু বাহির ঘুরে এলেই তো নিজের ঘরের মর্যাদা।

ঠাকুরের সেই কথা। 'কোথায় আর যাবে? আকাশ একটু দেখুক উড়ে-উড়ে। শেষ-কালে বসবে ঠিক এই বৃক্ষশাখে তার নিজের জায়গায়।'
নরেন ফিরে এসেছে। ঠাকুর শুনে মহা খুশি। কোথায় আর যাবে! এখানে ও যেমনটি দেখেছে তেমনটি আর দেখবে না কোথাও। এখানে এমন একটা কিছু ওর চোখে পড়েছে যা আর কোথাও স্পষ্ট নয়।
আমার প্রভুর পায়ের তলে কি শুধু মানিক জ্বলতেই দেখেছ? শত শত মাটির ঢেলাও সেখানে স্থান পেয়ে কাঁদছে লুটিয়ে-লুটিয়ে। আমার গুরুর আসনের কাছটিতে যে কটি চেলা জমেছে সবাই কি সুবোধ? অবোধও কটি আছে আশে-পাশে। সেই অবোধজনকেও কোল দিয়েছেন বলেই তো আমি তাঁর চেলা হতে পেরেছি।
গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তার পথ অনেক। সাগরের দিকে সব নদীই যায় কিন্তু সবাই এক পথে এক নদী হয়ে যায় না। ঠাকুর সব পথে গিয়েছেন। যত মত তত পথ।
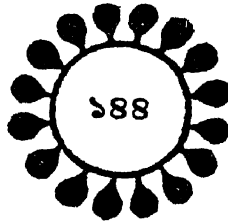
ঠাকুরের যন্ত্রণার কিছুতে নিবারণ নেই।
সেটা ততোধিক যন্ত্রণা নরেনের। ডাক্তার-টাক্তার সব ফেল মেরে গেল! কোনো প্রতিকার নেই, প্রতিষেধ নেই। কি দুঃসহ অবস্থা!
অখণ্ড ধরামণ্ডলে এমন কি কেউ নেই যে প্রতিবিধান করতে পারে! নয়কে হয় করতে পারে! সর্বাস্ত্রকুশল সর্বকামসম্পন্ন ধন্বন্তরি কি কেউ নেই?
উন্মত্তবৎ হয়ে উঠল নরেন। মুখে রাম-নাম গর্জন করতে-করতে বাগানের চারদিকে ছুটতে লাগল। সেই সন্ধ্যে থেকে ছুটছে, মধ্যরাত্রি হয়ে এল, তবু বিরাম নেই। মধ্য-রাত্রি কি, শেষরাত্রি! তবু কেউ থামাতে পারছে না নরেনকে। তবু সমানে ছুটছে। রাম রাম রাম রাম! হুঙ্কার ক্রমে আর্তনাদের রূপ নিল। রাম রাম রাম রাম! রাত্রির শেষ প্রহরও বুঝি যায়-যায়!
'যা নরেনকে শিগগির ডেকে নিয়ে আয়।' ঠাকুর আদেশ করলেন ভক্তদের।
কিন্তু কোনো কথাই কানে তুলবে না নরেন। নামধ্বনিতে উন্মূল করবে রোগজ্বালা। ঠাকুর যখন আদেশ করেছেন, ভয় কি, জোর করে ধরে নিয়ে চলো। সবাই তখন নরেনকে গায়ের জোরে বাধা দিল। প্রায় ধরে-বেঁধে নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে।
'হ্যাঁ রে অমন করছিস কেন? ওতে কি হবে?'

নরেন চুপ করে রইল।
ঠাকুর আবার বললেন, 'তুই যেমন করছিস অমনি বারোটা বছর আমার গিয়েছে। দু-এক রাত্তির নয়, অখণ্ড বারোটা বছর গিয়েছে একটানা একটা ঝড়ের মত। এক রাত্তিরে তুই আর কি করবি বাবা? ছেড়ে দে, ঘরে যা, ঠাণ্ডা হ।'
যেন থাকবেন না এমনিই ইঙ্গিত করছেন। নইলে নামশক্তিকে তো অস্বীকার করতে পারেন না ঠাকুর।
কি ছিল কি হয়েছে!
সেই একদিন হাজরার সঙ্গে বসে নরেন শুকনো জ্ঞানবিচার করছিল, ইংরেজিতে বড়-বড় দর্শনের বুলি, ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে?'
নরেন বললে, 'লম্বা-লম্বা কথা। সে আপনি বুঝবেন না।'
'তবু শুনি না!' ঠাকুর হাসলেন।
'সে ইংরিজি কথা। দার্শনিক হ্যামিলটন কি লিখেছেন তাই।'
'কি লিখেছেন?' ঠাকুর নাছোড়বান্দা।
ইংরেজি কথাটা আওড়ালো নরেন।
'এর মানে কি গো? মানে বলে দাও।'
'মানে হচ্ছে, দর্শনশাস্ত্র পড়া শেষ হয়ে গেলে মানুষ তখন বুঝতে পারে সে কিছুই জানে না। তখন সে ধর্ম-ধর্ম করে। যেখানে বিজ্ঞানের শেষ সেখানেই ধর্মের আরম্ভ।'[1]
আনন্দিত হলেন ঠাকুর। মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে বললেন, 'থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।'
সমস্ত জানার পরেও থেকে যায় অজানা। সমস্ত বিশ্লেষণের পরেও থেকে যায় অনুভূতি। সমস্ত বিশেষণের পরেও থেকে যায় বিশেষ্য। সমস্ত প্রথার পরেও থেকে যায় প্রাণ।
'এরা সব নিত্যসিদ্ধের থাক।' বললেন ঠাকুর, 'নরেন রাখাল বাবুরাম।' বলে সেই হোমাপাখির কথা বললেন।
বেদে আছে সেই হোমাপাখির কথা। সে পাখি আকাশবাসী, কখনো আশ্রয় নেয় না মাটিতে। আকাশেই ওড়ে ঘোরে, আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিমও মাটিতে এসে পড়ে না, মাটিতে পড়বার আগেই ফুটে যায় ডিম। ডিম ফুটতেই বেরিয়ে পড়ে ছানা। ছানার তখন মাটিতে পড়বার কথা। কিন্তু ছানা বেরিয়ে এসেই উড়তে শুরু করে। উড়তে শুরু করে মাটির দিকে নয়, তার মায়ের দিকে। তার এক লক্ষ্য শুধু উপরে ওঠা, তার মায়ের কাছে পৌঁছুনো।
'ও সব ছোকরারাও সেই রকম।' বললেন ঠাকুর, 'কিসে মা'র কাছে যাব।'
আর, মা কে? ঠাকুর নিজেই তো মা।
কাল কালীপুজো, আগের দিন ভক্তদের হঠাৎ বললেন, 'পুজো হবে, সব উপকরণ ঠিক রাখিস।'
ঘটনাটা শ্যামপুকুরে থাকতে।
পুজো হবে, শুধু এইটুকু নির্দেশ। ভক্তরা ভাবনায় পড়ল। কি উপচার লাগবে, কি

দিয়ে বা ভোগ, কিছুই বললেন না ঠাকুর। এখন কি করে কি যোগাড়যন্ত্র করে ভেবে পেল না কেউ। এ বলে ও, ও বলে ও। এ দিকে ঠাকুরের মুখে আর কথা নেই।
যাক গে, ফুল আর ধূপদীপ হলেই যথেষ্ট। ভোগের জন্যে না হয় কিছু মিষ্টি, নয়তো বা একটু পায়েস। তারপর এর অতিরিক্ত কিছু ফরমায়েস করেন তখন দেখা যাবে। কিন্তু, কি আশ্চর্য, পরদিন বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে প্রায় হয়-হয় তবু ঠাকুরের কোনো কৌতূহল নেই। পুজোর কথা তুলছেনও না কারু কাছে। ঘড়িতে সাতটা ছেড়ে আটটা বাজল। তবু যেমন বসে থাকেন তেমনি বসে আছেন শয্যায়। স্থির, স্তব্ধ, উদাসীন। কি আর করা যাবে, ঠাকুরের বিছানার পাশে মেঝের উপর জিনিসগুলো সাজিয়ে দিল ভক্তরা। নিজেরা বসল চার দিকে। দীপ জ্বলল, উঠল ধূপগন্ধ।
কে জানত এই কালী, এই কালীপুজো।
'জয় মা!' বিহ্বলকণ্ঠে বলে উঠল গিরিশ ঘোষ। ফুলচন্দন ফেলল ঠাকুরের পাদ-পদ্মে।
ঠাকুর গভীর সমাধিতে ডুবে গেলেন। দুই হাতে ধারণ করলেন বরাভয় মুদ্রা। উদ্ভাসিত হলেন দিব্যজ্যোতিতে।
এ স্বপ্ন নয়, ইন্দ্রজাল নয়, মরুনীর নয়, আকাশে গন্ধর্বনগর নয়, সত্যিই মা আছেন বসে। কালী মানেই রামকৃষ্ণ। কালীপুজো মানে রামকৃষ্ণপুজো।
'জয় মা, জয় মা—' সবাই ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগল।
রাখাল দেখল ঠাকুর শুধু তার নিজের মা নন, অখিলজননী। অনেকাকারা সৃষ্টির আদিকর্ত্রী। মহাকালের মনোমোহিনী। জীবজগতের জগদ্ধাত্রী। রাখালও ফুল দিল শ্রীচরণে।
মনে হল ঠাকুরের এ অসুখ, এ বুঝি তাঁর নিজের ইচ্ছে। তবে আর কিসের চিন্তা, কিসের চিত্তক্লেশ! তাঁর রোগের চিন্তা না করে এস তাঁর নিজের চিন্তা করি!
ডাক্তার সরকার এসেছে।
'তুমি নাকি বলেছ ইনি পাগল?' নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর।
'তা ঠিক বলিনি। বলেছি তোমাতে এখনো অহঙ্কার আছে।'
'অহঙ্কার!' মাস্টার চমকে উঠল।
'তা ছাড়া আবার কি! নইলে অন্যকে কেউ পায়ের ধুলো নিতে দেয়?'
'বা, লোকে যে পায়ের ধুলোর জন্যে কাঁদে।' বললে মাস্টার।
'কাঁদলেই হল? কাঁদলেই দিতে হবে? লোকে পাগল বলে আমিও পাগল হব?' ডাক্তার বললে উত্তেজিত হয়ে: 'সবাইকে বুঝিয়ে বলব ছাড়ো এই পাগলামি।'
'যদি প্রণাম করতে না দেন তা হলে আবার কেউ অহঙ্কারী বলবে।' আরেকজন কে বললে পাশ থেকে। 'বলবে, দেখলে লোকটার অহঙ্কার। এত লোক একটু পায়ের ধুলোর ভিখিরি, আর, দেখ না কেমন পায়ে কম্বল বেঁধে বসে আছে!'
'তা নয়, বুঝিয়ে বলো।'
'কাকে বোঝাবো? কে বুঝবে? বুঝিয়ে বলতে গেলেই তো বক্তৃতা। আবার সেই অহঙ্কার।' বললে সেই পার্শ্ববর্তী।

মাস্টার আগের কথার জের টানল। বললে, 'কেন দোষ কি প্রণামে? সর্বভূতে কি নারায়ণ নেই?'
'বেশ, তাই যদি হয়, তবে সব্বাইকে করো। বিশেষ একজনকে কেন?'
'সেই বিশেষের মধ্যেই যে বেশি।' মাস্টার এবার অনেকটা বাগে পেয়েছে ডাক্তারকে। 'জল কোথাও ডোবায় প্রকাশ, কোথাও সাগরে। কোথায় এসে বিহ্বল হন, ডোবায় না সমুদ্রে? আপনি কাকে বেশি মানবেন, ফ্যারাডেকে, না, নতুন বি-এস-সি পাশ কলেজী-ছোকরাকে?'
ঠাকুর মুখ খুললেন। সূর্যকিরণ মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে আরেক রকম। আবার যখন আরশিতে পড়ে তখন একেবারে আলাদা। সেই একই কিরণের বিভিন্ন প্রকাশ। কিছু বেশি প্রকাশ আরশিতে। তাই নয়? তেমনি এমন মানুষও আছে, যেখানে ঈশ্বর বিভূতির বেশি প্রকাশ। যেমন ধরো প্রহ্লাদ। কাকে বেশি মানবে? প্রহ্লাদকে? না, এই যারা ভক্তবৃন্দ সমবেত হয়েছে এদেরকে?
'সব বুঝলাম।' বললে ডাক্তার। 'কিন্তু লোকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে এ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ভয় হয় এমন একটা ভালো লোককে খারাপ করে দিচ্ছে। কেশব সেনকেও তার চেলারা অমনি করেছিল। তোমায় বলি শোনো—'
'তোমার কথা কি শুনব!' ঠাকুর কি বিরক্ত হলেন? বললেন, 'তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী।'
'তা হলে বেশ, উঠলাম।' ডাক্তারের গলার স্বরে কি অভিমান বেজে উঠল? বললে, 'তবে এখন থেকে তোমার কেবল গলার অসুখটি দেখে যাব। অন্য কথায় কাজ নেই। তবে যদি অন্য কথা উঠে পড়ে, আমি ছাড়ব না। ছাড়ব না যুক্তির পথ। তর্ক করতে হলে বলব ঠিক ঠিক।'
করো না তর্ক। কটা সিঁড়ি শুধু তো ভাঙবে ধাপের পর ধাপ—তারপর? কটা সিঁড়িই বা পারো তৈরি করতে? রাবণের সিঁড়িও ভেঙে পড়েছিল, স্বর্গকে ছুঁতে পারেনি। সিঁড়ির শেষ আছে, কিন্তু যাকে সে স্পর্ধা করে উঠতে চেয়েছে সেই আকাশের শেষ কই, অবধি পরিধি কই? সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে উঠবে না হয় উচ্চ-চূড়ে, তুঙ্গচূড়ে, প্রাসাদ-শিখরে। তারপর? আর কোথায় তর্ক, কোথায় বাক্যজাল? অবলম্বনের সূক্ষ্ম সূত্রটিও আর নেই। তখন অবতরণ। তখন শরণাগতি।
তাকেই বলি তত্ত্বজ্ঞান।
তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাজরা বললে, 'তত্ত্বজ্ঞান মানে চব্বিশ তত্ত্বের জ্ঞান—'
'চব্বিশ তত্ত্ব কি-কি?' কে একজন জিগগেস করল।
'পঞ্চভূত ছয় রিপু'—হাজরা ফিরিস্তি দিতে বসল।
ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'ঐ বুঝি তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ? তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান।'
সবাই চমকে উঠল কথা শুনে। তাকাল ঠাকুরের মুখের দিকে।
'তৎ মানে পরমাত্মা আর ত্বং মানে জীবাত্মা।' ঠাকুর বললেন, 'পরমাত্মা আর জীবাত্মা এক, এই জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান। আর তাঁকে জানা যা নিজেকে জানাও তা। তাই তত্ত্বজ্ঞানই আত্মজ্ঞান।'

কিন্তু তর্কে-তত্ত্বে কি দরকার? সোজা পথ ভক্তির পথ। ভক্তিতেই মুক্তি।

তাতেও টিপ্পনি কাটলে হাজরা। বললে, 'যাই বলো ব্রাহ্মণশরীর না হলে মুক্তি হবে না।'

'সে কি?' ঠাকুর ঝলসে উঠলেন : 'শবরী ব্যাধের মেয়ে, শূদ্র। তার ভক্তিতেই মুক্তি হয়েছিল। কি, হয়নি?'

শবরী বনের মেয়ে। ফুল তোলে, পাখির গান শোনে, বুনো ফল খায়, তৃণগন্ধের ঘ্রাণ নেয়। গিরিনদীতে স্নান করে, তরুছায়ায় আলুল চুলে বসে থাকে। কখনো বা শুয়ে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা সূর্যের উদয়-বিলয় দেখে। রাতে চাঁদ উঠলে আর ঘরে ফেরে না।

দণ্ডকারণ্যে তার অনেক সঙ্গিনী। তাদেরকে জিগগেস করে, তোরা বলতে পারিস এ সূর্য-চন্দ্র কে করেছে? নীলাম্বর ভরে কে এত ঢেলে দিয়েছে জ্যোৎস্না? পাখিদের কণ্ঠে কে দিয়েছে এত অমিয়? মৃগশাবকের চোখে কে দিয়েছে এত বিস্ময়সারল্য? তোরা বলতে পারিস কে সে?

সঙ্গিনীরা কি বলবে! যা জানি না তা জানি না। অত খোঁজাখুঁজিতে কাজ কি! কি দিয়েছে তাই দেখ, কে দিয়েছে তা নিয়ে তোর কি দরকার!

আমার প্রশ্ন 'কি' নয়, আমার প্রশ্ন 'কে'?

বাপ শবরীর জন্যে পাত্র ঠিক করেছে। শুধু পাত্র নয়, দিনও স্থির। নিমন্ত্রিতদের জন্যে এক পাল গরু-মোষও কেনা হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে ভূরিভোজের।

অন্তরের গভীরে শিউরে উঠল শবরী। তার জন্যে নিরীহ পশুহনন হবে! রক্তনদীর পারে বসে প্রিয়মিলন! তার প্রিয় কে? গিরিধর গোপাল বিনা কে আর আমার প্রিয়তম!

বিয়ের রাত্রে শবরী গৃহ ছাড়ল। বন হতে বনান্তর ঘুরে পৌঁছুল পম্পা সরোবরের পারে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে। পিছনে চর ছুটেছে শবরীকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। এবার মতঙ্গের আশ্রমে এসে শবরী নির্বিঘ্ন হল। কারু সাধ্য নেই মুনির আশ্রয় থেকে তাকে বিচ্যুত করে।

ছোট একটি পর্ণকুটির তৈরি করল শবরী। ঋষিসেবায় মন দিলে। ভূমিতলে শোয়, গাছের বাকল পরে, ফলমূলের অতিরিক্ত কোনো ভোজন নেই। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ঘুম থেকে উঠে শৌচ-পূজো সেরে পথে এসে বসে। যে পথ দিয়ে ঋষিরা স্নানে যাবেন সেই পথে। সেই পথের কণ্টক-কঙ্কর তুলে দেয়, বালি কুড়িয়ে এনে পুরু করে ঢেলে দেয় পাথরের উপর। যাতে ঋষিদের পায়ে এতটুকু কাঁটাখোঁচা না লাগে। ঋষিরা স্নানে গেলে কুশসমিধ আহরণ করতে বেরোয়। তার এই অলক্ষিত সেবা মতঙ্গ মুনি টের পেলেন। দিলেন তাকে যোগদীক্ষা। নাম রাখলেন শ্রমণী। বললেন, নিজ কুটিরে অপেক্ষা করো, তোমার প্রাণনাথ দেখা দেবেন, তোমাকে।

অপেক্ষা করবার অধিকার পেয়েছি আর আমার কি চাই! আমার অপেক্ষাই টেনে আনবে অপরূপকে।

রাজা দশরথের বড় ছেলে রাম চৌদ্দ বছরের জন্যে বনবাস করছে, এ খবর বনচরদের

মুখে-মুখে। আর বনবাসী ঋষিদের জানতে বাকি নেই সেই রামই বিষ্ণুর অবতার। সেই কমলায়তাক্ষ নবদূর্বাদল শ্যাম রামই আমার প্রিয়তম। সন্দেহ কি, তিনি আসবেন আমার কুটিরে।

গুরুবাক্য মিথ্যে হবার নয়। আমি প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত আমার প্রতীক্ষায়। এমন যেন না হয় তিনি এসেছেন অথচ আমি প্রস্তুত নই।

মতঙ্গ মুনি মারা গেলেন। একে-একে আর-আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। আশ্রম জন-মানবহীন হয়ে গেল। বনচরেরা এ আরণ্যপ্রান্ত পরিত্যাগ করলে। শবরী একাকিনী বসে আছে তার কুঁড়ে ঘরে। বিরহোৎকণ্ঠা বিহ্বলা শবরী। প্রভাততপস্যায় তমস্বিনী শর্বরীর মত। এই বুঝি এলেন, পাতার মর্মরে বাতাসের নিশ্বাসে এই বুঝি তাঁর পদশব্দ!

দণ্ডে শতবার বাইরে বেরিয়ে আসে। এগিয়ে গিয়ে দেখে কোথায় তিনি? কোথায় তিনি? আবার ফিরে এসে স্থির হয়ে বসে ঘরের শূন্যতায়। কোথায় তুমি?

কবে আসবেন ঠিক নেই, তাই নিত্য প্রত্যূষে স্নান করে গন্ধপুষ্প চয়ন করে শবরী। শুধু ফুল নয় রসাল ফলমূল। পর্ণপুট ভরে শীতল জল ধরে রাখে। অজিন আসনটি পেতে রাখে মেঝের উপর। আর পথের দিকে সতৃষ্ণ বিমর্ষ চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে। দু-এক বছর নয়, দীর্ঘ বারো বছর। ঘরে দরজা নেই শবরীর, চোখে নেই স্বপ্নহরণ নিদ্রা। তবু কোথায়, কোথায় আমার হৃদয়রঞ্জন, আমার লোচনাভিরাম!

সীতাহরণের পর রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে-বনে ঘুরছেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে। খুঁজতে-খুঁজতে পথিমধ্যে মৃতকল্প জটায়ুর সঙ্গে দেখা। জটায়ু বললে, পম্পা সরোবরের পূবে ঋষ্যমূক পর্বত। সেখানে গেলেই সন্ধান পাবে জানকীর।

পম্পার দিকে যাত্রা করল রাম-লক্ষ্মণ। ঋষ্যমূকে পরে যাব, দেখে আসি ঐ পর্ণকুটীর, কে রয়েছে একাকিনী। অন্ত্যজার ঘরে দাঁড়ালেন এসে ভগবান।
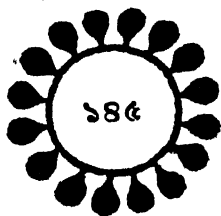
ঠাকুরের ঘরের রেকাবি হারিয়েছে। বৃন্দে ঝি আর রামলাল কথা-কাটাকাটি করছে। তারপর দুজনে মোকাবিলা হল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর বললেন, 'কই এখন আর দেখতে পাই না। আগে ছিল বটে দেখেছিলাম।'

'আমার সব আছে। স্ত্রী আছে। ঘরে-ঘরে ঘটিবাটিও আছে।' বললেন ঠাকুর, 'হয়ে প্যালাদেরও খাওয়াই, হাবির মা এলেও ভাবি।'
মধ্যবিত্ত সংসারীর কথা। কিন্তু মন রয়েছে ঈশ্বরের পাদপদ্মে।
বিষয়ী লোকদের টানবার জন্যে গৌরনিতাই তাই পাতি দিলেন : মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরিবোল। লোকে ভাবলে খাসা ব্যবস্থা। এস না যদি প্রথম দুটি বস্তু পাওয়া যায়, করি না একটু হরিনাম। মাগুর মাছের ঝোল আর কিছুই নয়, প্রেমের অশ্রুনির্ঝর। যুবতী মেয়ে আর কিছুই নয় পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল মানে হরিপ্রেমে ধুলোয় গড়াগড়ি। একবার জিভে একটু নাও না হরিনামামৃতচ্ছটা, দেখ না চোখে জল আসে কিনা, ইচ্ছে করে কিনা ধুলোয় বিলুণ্ঠিত হই।
কাঁটালের মাছি কি গোলাপের গন্ধে আকৃষ্ট হবে? হবে না। সুতরাং গোলাপের নির্যাস আগে একটা শিশির মধ্যে বন্ধ করো। শক্ত করে ছিপি আঁটো। তারপর শিশির গায়ে ঘন করে কাঁটালের রস মাখাও। সেই রসের গন্ধে ছুটে আসবে কাঁটালে মাছি। মাছি এসে জড়ো হলেই খুলে দাও ছিপি, ঢেলে দাও গোলাপের নির্যাস। তখন কাঁটালের মাছি বসে যাবে ডুবে যাবে, আর উড়ে পালাবে না।
ঘটিবাটি আছে বটে কিন্তু ছুঁতে পারেন না ঠাকুর। গাড়ু পর্যন্ত না। ধাতুদ্রব্য ছুঁলেই হাত বেঁকে যায়, ঝনঝন কনকন করে। কলাপাতায় ভাত খান। জল খান ভাঁড়ে করে। তামাক খান ঠাকুর।
আগড়পাড়ার বিশ্বনাথ কবিরাজ দেখতে এসেছে ঠাকুরকে। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁগা, তামাক খেলে কি হয়?'
কবিরাজ বললে, 'বায়ু কম হয়। তবে আপনি যখন খাবেন, ছিলিমের উপর কিছু ধনের চাল আর মৌরি দিয়ে খাবেন। তাতে উপকার হবে।'
তথাস্তু। ওরে রামলাল, ধনের চাল আর মৌরি যোগাড় কর।
সঙ্গে একটি বটুয়া রাখেন। বটুয়ার মধ্যে মশলা। মশলা খান মাঝে-মাঝে। বটুয়াটি রঙিন।
সেইবার একটা লেমনেড খেয়েছিলেন অশ্বিনী দত্তের হাতে।
ঈশানের বাড়িতে সেবার জল খেতে চেয়েছিলেন। কে একজন এক গ্লাশ জল ঠাকুরের সামনে এনে রাখল। কিন্তু সেই জল স্পর্শ করলেন না ঠাকুর।
কেন কি হল?
যে জল রেখে গেছে সে লোকটা উচ্ছৃঙ্খল। জলের মধ্যে দেখতে পেলেন তার স্বভাবের আবিলতা।
মশারি গুঁজে নিতে পারেন না। না বা জামায় বোতাম লাগাতে। শুতে যাবেন দরজায় খিল লাগাবেন না।
কে একজন হঠাৎ তাঁর সামনে নতুন কাপড় ছিঁড়ে ফেলল। ঠাকুর যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন এ যেন তাঁকে লেগেছে।
গরমের দিনে মছলন্দের মাদুর পেতে বসেন বারান্দায়। কখনো বা তাকিয়ায় ঠেস

দিয়ে। মাস্টারকে বললেন, 'পা-টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা।'

মাস্টারকেই বললেন মার্কিনের জামা দিতে। সেদিন বললেন, 'একটা শাদা পাথরের বাটি এনো। এক পো আন্দাজ দুধ যাতে ধরে।' হাতের ইশারায় বাটির গড়ন বুঝিয়ে দিলেন, 'আর সব বাটিতে আঁষটে লাগে।'

খবরের কাগজ দেখতে পারেন না। গিরিশের বাড়িতে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখলেন একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। ইশারায় বললেন সেটাকে সরিয়ে নিতে। না সরানো পর্যন্ত বসলেন না।

কালো বার্নিশকরা চটি পরেন। ধুতির পাড় লাল। এমনিতে গায়ে একটা পিরান, আস্তিনটা কনুই ও কবজির মাঝামাঝি। শীতের দিনে ফুলকাটা মোজা, বনাতের জামা, কান-ঢাকা টুপি।

গেরো বাঁধতে পারেন না। গেরো বাঁধলেই দম বন্ধ হয়ে আসে।

শম্ভু মল্লিকের ওষুধখানা থেকে একটু আফিং নিয়ে বেঁধেছিলেন কাপড়ের খুঁটে, ব্যস, পথ ভুল হয়ে গেল। শ্রীমা'র হাত থেকে পাওয়া একটু মশলা একদিন গুঁজে-ছিলেন ট্যাঁকে, ব্যস, গঙ্গায় গিয়ে ডুবলেন। 'দেশেও অমনি একদিন হয়েছিল। আম পেড়ে নিয়ে আসছি, পথে আর পা ফেলতে পারি না। দাঁড়িয়ে পড়লাম কাঠ হয়ে। তখন কি করি, আমগুলো ফেলে দিলুম ডোবার মধ্যে। তখন পায়ে চলার শক্তি এল।'

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যেমন এলোমেলো হয়ে বসে তেমনি বসেন চাপাটি খেয়ে। কোঁচা নেই, কাপড়টা লম্বা চাদরের মত করে বাঁ কাঁধে ফেলা। যখন কীর্তনে যোগ দেন কোঁচার কাপড়টা কোমরে ফেট্টি করে বাঁধেন। যখন বালক সাজেন তখন আবার অন্য-রকম করে পরেন।

সেদিন বালক সেজে বালিশ কোলে নিয়ে বসেছেন। বালিশকে ছেলে করে দুধ খাওয়াচ্ছেন আর হাসছেন বালকের মত।

সমাধি অবস্থাতেও মুখে হাসি।

হিসেব করতে পারেন না। মাইনে নিয়ে একবার কি গোল বাধল। শ্রীমা বললেন, খাজাঞ্চিকে একবার বলা থাক। ঠাকুর ছি-ছি করে উঠলেন : 'হিসেব করব?'

সেবার মণি মল্লিক তীর্থ করে ফিরেছে। ঠাকুরকে এসে বললে, 'অনেক সব সাধু দেখে এলাম।'

'কেমন দেখলে সব?'

'দেখলুম, তবে কিনা—'

'তবে কিনা কি?'

'তবে কিনা সব্বাই পয়সা চায়'।

মণি মল্লিক ভেবেছিল ঠাকুর বোধ হয় সেই সব অর্থী সাধুদের উপর বিমুখ হয়ে উঠবেন। কিন্তু ঠাকুরের সায় ঐ সব সাধুদের দিকে। বললেন, 'ক'টা বা আর চায় শুনি? হয়তো একটু তামাক বা গাঁজা খাবে তার জন্যে। তোমাদের দুধের বাটি

ঘিয়ের বাটি চাই, ওদের একটু তামাক-গাঁজাও খেতে দেবে না? সব ভোগই তোমরা করবে?'
সহজ সদানন্দ পুরুষ, সকলের জন্যে দরদ। সর্বভূতে ক্ষান্তি। গগনাঙ্গনে সার্ব-কালিকী জ্যোৎস্না। কারু প্রতি কার্পণ্য নেই, কুণ্ঠালেশ নেই। ভূতানুকম্পী জনই আসল সাধু। ঠাকুর হচ্ছেন ভূতানুকম্পী।
নারকেলের নাড়ু ভালোবাসেন। জিলিপিকে বলেন লাটসাহেবের গাড়ির চাকা। আর কিছু না, দাও একটু ভাতের মণ্ড, একটু সুজির পায়েস। অল্প নিয়েই আমার তুষ্টি। উপকরণ সামান্য উপভোগ অন্তহীন।
যার যা পেটে সয়। যার যেমন ধাত।
একবার যোগীন ঠাকুরের কোথায় নিন্দা শুনল। নিন্দা করছে তো করুক, ঠাকুরকে তা স্পর্শও করতে পারবে না। ধোঁয়া কি ম্লান করতে পারে আকাশকে? চুপ করে রইল যোগীন। ফিরে এসে ঠাকুরকে বললে।
ঠাকুর রাগ করে উঠলেন। বললেন, 'আমার নিন্দা করল আর চুপটি করে তাই তুই শুনে এলি? প্রতিকার দূরের কথা, প্রতিবাদও করলিনে একটা? তুই কি মানুষ?'
মাথা হেঁট করে রইল যোগীন।
এর কিছুদিন পরে নিরঞ্জন নৌকো করে দক্ষিণেশ্বর আসছে। সেই নৌকোয় আরো অনেক যাত্রী। কথায়-কথায় ঠাকুরের প্রসঙ্গ উঠেছে। কতগুলি যাত্রী ঠাকুরের নিন্দা শুরু করল। যত কলুষকটূক্তি।
আর যায় কোথা! ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নিরঞ্জন। নৌকোর দু দিকে পা রেখে দোলাতে লাগল নৌকো। বললে, ডুবিয়ে মারব তোদের। ঠাকুরের নিন্দে সইব না প্রাণ থাকতে। সকলে তো ভয়ে থরহরি! নৌকো প্রায় ডুবু-ডুবু। সবাই তখন নিরঞ্জনের হাতে-পায়ে ধরল। অনেক কাকুতিমিনতি করতে লাগল। নাক কান মলে প্রতিজ্ঞা করলে আর নিন্দা করবে না ঠাকুরের। তখন নিবৃত্ত হল নিরঞ্জন।
সেই কথাই সেদিন বলছিল দক্ষিণেশ্বরে। শুনে ঠাকুর তো জ্বলে উঠলেন। 'শালা, তোর কি! আমার নিন্দে করছিল তো বেশ করছিল! তাতে তোর কি মাথাব্যথা?'
যার যেমন ধাত। যার যা পেটে সয়। যার যেটি সহজ হয়ে আছে।
আবার আরেকদিন।
কালীমন্দিরের ঘাটে স্নান করতে আসে এক পতিতা। স্নান সেরে ফিরে যাবার পথে ঠাকুরকে প্রণাম করে দূর থেকে। দু-একটি কথাও বা কয় মাঝে-মাঝে।
এই নিয়ে আবার পাড়ায়-বেপাড়ায় ফিসফাস।
কথাটা কানে এল যোগেনের। সে এবার তৈরিয়া হয়ে উঠল। এবার আর সে ছেড়ে দেবে না। প্রমাণ যদি দিতে না পারো তবে তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন।
তখন নিন্দুকের দল মেয়েটাকে ধরল।
ছি ছি ছি, পাপপ্রশমন মধুসূদন, আর বাড়িও না পাপের বোঝা। লজ্জানিবারণ, লজ্জা কেড়ে নিও না। নিজের দেহ বিকিয়েছি বলে দেবচরিত্রে কালি দেবো! আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, কলুষিত, তবু দেখেছি সেই সরসিজাসন নারায়ণকে।

নিন্দুকের দল লেজ গুটোল। উদ্যতমুষ্টি যোগেন বুঝি পিছু নিয়েছে।
ঠাকুর যোগেনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'ছাগলে কি না খায় পাগলে কি না বলে! তার জন্যে তোর কেন আস্ফালন? ওসব কথায় তোর কান দেবার কি হয়েছে!'
যখন যেমন তখন তেমন। যার বেলায় যা তার বেলায় তা।
কাপড়চোপড় রাখবার জন্যে ঠাকুরের একটা বাক্স ছিল। সেই বাক্সে আরশুলা বাসা বেঁধেছে। বাক্সে একদিন নাড়াচাড়া পড়তেই বেরিয়ে পড়ল আরশুলার দল।
'ধর্, ধর্,—' ঠাকুর তেড়ে গেলেন।
একটাকে মুঠোয় চেপে ধরেছে যোগেন। ঠাকুর বললেন, 'ওটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফ্যাল।' বাইরে নিয়ে গেল বটে কিন্তু মারল না। ছেড়ে দিল।
এ নিয়ে আবার ঠাকুর মাথা ঘামাবেন ভাবতে পারেনি যোগেন। ঘরে ফের ফিরে আসতেই জিগগেস করলেন, 'কি রে আরশুলাটা মেরে ফেলেছিস তো?'
যোগেন ভ্যাবাচাকা খেল। ঢোঁক গিলে বলল, 'না মশায়, ছেড়ে দিয়েছি।'
'আমি তোকে কি বলেছিলাম?'
'মেরে ফেলতে বলেছিলেন।'
'তবে ছেড়ে দিলি কেন?'
যোগেনের মুখে কথা নেই।
ঠাকুর বললেন, 'শোন যেমনটি করতে বলব তেমনটি করবি। নিজের মতে চলবিনে।'
গুরুবাক্যই বেদবাক্য, বহ্নিবাক্য। পিতা আর গুরু সমান। পুত্র আর শিষ্যও তেমনি। গুরুকে মানলেই গুরু তোকে টানবেন, ঢাকবেন, রাখবেন।
শিব-দুর্গা ঘুমুচ্ছেন, দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে গণেশ। হঠাৎ পরশুরাম এসে তার গুরু শিবের দর্শন চাইল। গণেশ বললে, হবে না, আরেক সময় এস। আমার এখুনি দর্শন চাই। পরশুরাম জোর দিয়ে বললে। তাঁরা এখন ঘুমুচ্ছেন, তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হতে দেব না। গণেশ রুখে দাঁড়াল। ও সব কথা শুনছি না, দ্বার ছাড়ো। পরশুরাম নাছোড়বান্দা। দর্শন করতে যখন মন হয়েছে কেউ পারবে না ঠেকাতে। লেগে গেল মারামারি। গণেশ পরশুরামকে ধরে ত্রিভুবন ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারল মাটিতে। তখন পরশুরাম কি করে, শিবের থেকে পাওয়া পরশু ছুঁড়ে মারল গণেশের উপর। গণেশের একটা দাঁত ভেঙে পড়ল। রক্তারক্তি কাণ্ড! গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙে গেল শিব-দুর্গার। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন গণেশের এই অবস্থা। তখন ভগবতী শূল তুললেন। তেড়ে মারতে গেলেন পরশুরামকে। মহাদেব নিরস্ত করলেন ভগবতীকে। বললেন, আত্মজ যেমন পুত্র শিষ্যও তেমনি পুত্র। তাই গণেশ আর পরশুরাম সমান। সুতরাং পুত্রবুদ্ধিতে পরশুরামকে ক্ষমা করো। ভগবতীর ক্রোধ শান্ত হল। পরশুরামকে ক্ষমা করলেন, রক্ষা করলেন।
গণেশও হতাশ হবার ছেলে নয়। ভগ্ন দন্ত তুলে নিলে মাটি থেকে। সেটিকে নিজের যোগদণ্ড করলে। সেই থেকে তার নামও হয়ে গেল একদন্ত।
হাজরার বেলায় 'পাটোয়ারী বুদ্ধি', অথচ যোগেনের বেলায়, 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?'

একটা কড়া কিনতে বাজারে পাঠিয়েছেন যোগেনকে। অত শত কে দেখে, দোকানীকে শুধিয়েছে, ভালো জিনিস তো, দোকানী বলেছে, ভালো। সরল বিশ্বাসে তা-ই নিয়ে এসেছে বাড়ি। দেখি কেমন কড়া আনলি? কড়াটা হাতে নিতেই ঠাকুর দেখতে পেলেন কড়াটা ফাটা। জল দিতেই দেখা গেল জল পড়ছে। তখন খুব চটে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'ভক্ত বলে তুই বোকা হবি? দোকানীর কথায় বিশ্বাস করে একটিবার না দেখেই তুই নিয়ে এলি? দোকানী কি দোকান ফেঁদেছে ধর্ম করতে?'
লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল যোগেন।
ভবের হাটে সুখ কিনতে বেরিয়েছিস। যাচাই-বাছাই করে দ্যাখ কোন সুখটা টেঁকসই অথচ সুলভ। বাজার করতে এসে আমি ঠকে যাব কেন? আমি ঠকতে তো আসিনি? চোখ কান খোলা রেখে সওদা করে যাব। সুখের বস্তুটাকে দেখব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। টুটা-ফুটা দেখলে কিছুতেই কিনব না। কিছুতেই না।
প্রভু বললেন, 'সহজ না হলে সহজকে চেনা যায় না।'
আর কিছু না পারো সহজ হয়ে যাও। তাকেই বলে সহজানন্দ হওয়া। চলতে-চলতে যা কিছু পথে এসে পড়ে তাতেই আনন্দ। তাতেই পরমপূর্ণতা।
তোমার মুখখানি দেখব বলে কত সন্ধান করেছি দিকে-দিকে। গিয়েছি পর্বতে অরণ্যে সজনে বিজনে, হয়েছি একান্তচারী, কখনো বা ঐহিকদর্শী। পরিক্রমা করেছি সপ্ত-দ্বীপা বসুন্ধরা। কোথায় তোমার মুখ? সব সময়ে মনে হয়েছে অস্পষ্ট, নীরব, অবগুণ্ঠিত। কোথায় কোন স্বর্গার্গল উদ্ঘাটন করলে দেখব সেই মনোনয়ননন্দন মনোহর মুখখানি?
সর্বতীর্থে স্নান করে এলাম, দীক্ষা নিয়ে এলাম সর্বমন্ত্রে, তবু তোমার সেই উন্মুদ্র কমলকোষ কোমল মুখখানি চোখে পড়ল না।
তারপর শরণ নিলাম মানসনিলয়ে। আশ্চর্য, সেইখানেই তোমার সুচির-রুচির মুখখানি ফুটে আছে।
বুঝেছি চিত্তের সহজ সুখই তোমার মুখ।
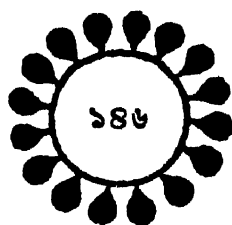
কায় বাক্য মন এই তিন নিয়ে ধন।
কায়মনোবাক্যে সেবা করছেন শ্রীমা। সেবার, কতদিন আগের কথা, ঠাকুরের যখন

আমাশা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে, সেবার ভার ছিল হৃদয়রামের হাতে। শ্রীমাকে ঘে'ষতে দেয়নি কাছে। কাশী থেকে না কোত্থেকে একটি মেয়ে এসে হাজির, অবাক্যব্যয়ে লেগে গেল ঠাকুরের পরিচর্যায়। মাকে ধরে নিয়ে এল তাঁর চালাঘর থেকে। বললে, 'তাঁর এমন অসুখ আর তুমি এমনি দূরে পড়ে থাকবে?'

'কি করি, ভাগ্নের বউ রয়েছে যে ঐ চালাঘরে। আমি নইলে ওকে আগলাবে কে?'

'সে ওরা লোকটোক রেখে দেবে'খন।' বললে সেই অপরিচিতা। 'তাই বলে তুমি তোমার স্বামীসেবায় হাত লাগাবে না?'

আরোগ্যের দেশে ঠাকুরকে নিয়ে আসবার জন্যে আরামের দেশে চলে এলেন শ্রীমা।

কিন্তু কাশীর মেয়েটি গেল কোথায়? যেন হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল। ঠাকুরের প্রয়োজনে এসেছিল, প্রয়োজন সাধন করে ছুটি নিলে।

এবারের সেবায় প্রথম শ্যামপুকুরে, শেষে কাশীপুরে।

শুধু ওষুধটি হলেই তো চলে না, পথ্যটিও দরকার। পথ্য কে রান্না করে? শুধু রান্না করলেই তো চলে না, খাওয়ায় কে? পথ্যের সঙ্গে কে মেশায় প্রচ্ছন্নপবিত্র প্রেম? অন্তর-সুষমার শুশ্রূষা?

লজ্জাপটাবৃতা হয়ে বাস করছেন শ্রীমা। চারদিকে ভক্ত ছেলেদের ভিড়, তারই মধ্যে সবাইকার মা রয়েছেন অন্তরালবর্তিনী হয়ে। মহাবলসম্পন্না কল্যাণেচ্ছার মত।

ভাতের মণ্ড তৈরি করছেন। কখনো বা মাংসের সুরুয়া।

দুপুর বেলা পথ্য তৈরি হলে, বুড়ো গোপাল বা লাটুকে দিয়ে খবর পাঠান। এবার তবে লোক সরিয়ে দাও। মা নিজে এসে খাওয়াবেন ঠাকুরকে।

'সেবা বস্তুতে নয়, সেবা অন্তরের ইচ্ছাটিতে।' একদিন লাটুকে বললেন ঠাকুর, 'ভিক্ষে করে এনেও যদি প্রিয় জিনিস কেউ ভগবানকে উপহার দেয়, সে সেবাও উত্তম জানবি।'

কি ছিল সেটি বিচার্য নয়, কেমন করে ছিল, কোন ভাবের থেকে ছিল সেইটিই জিজ্ঞাস্য।

কে এক বড়লোক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে একখানি ছোট সিংহাসন উপহার দিয়ে গেছে। সেখানে ঠাকুরকে বসিয়ে পুজো করবেন বলে।

তুই এত বড় একটা ডাকসাইটে বড়লোক অন্তত একটা রুপোর সিংহাসন দে। কি একটা জার্মান সিলভারের সিংহাসন নিয়ে এসেছিস। ভক্ত-মেয়েরা লোকটাকে বিদ্রূপ করতে লাগল। কী হাড়কৃপণ, পয়সা তো নয় যেন বুকের পাঁজর। 'তুমি এ সিংহাসন ফেরত দাও মা।' কেউ-কেউ বললে। 'ও সব জাঁকের বড়লোকের চাইতে গরিবের ভক্তি অনেক বেশি।'

'এ সব কথা বোলো না।' মা বললেন সুধাসিঞ্চিত কণ্ঠে : 'মানুষের প্রাণে যাতে ব্যথা লাগে, এমন কথা বলতে নেই। ভক্ত যদি বাঁশের তৈরি সিংহাসনও আমায় দেয়, আমি তাও খুশি মনে তুলে নেব। জিনিসের বিচার হবে কি জিনিসের দাম দিয়ে? কখনো না। তার দাম হবে যে দিচ্ছে তার আন্তরিকতা দিয়ে।'

ঈশ্বরকে কি দিচ্ছ? হয় পাতা নয় ফুল নয় একটুখানি জল। দেওয়ার মধ্যে

আন্তরিকতার এক ছিটে রস ঢালো, ঈশ্বর হাত বাড়িয়ে লুফে নেবেন। সমস্ত উৎসর্গ স্বর্গসুধান্বিত হয়ে উঠবে।

কি এক কাজে লাটুকে ঠাকুর পাঠিয়েছেন কলকাতায়। ফিরতে-ফিরতে প্রায় বিকেল। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'কিরে খাওয়া জুটেছে তো কোথাও? না কি উপোস?'

'আপনার কাজে গিয়েছি, অভুক্ত থাকতে পারি?'

'কোথায় খেয়েছিস?'

'শরতের বাড়িতে।' তৃপ্তির পরিপূর্ণ প্রসন্নতা ভেসে উঠল লাটুর মুখে : 'শরতের মা যা খাওয়ালে তার তুলনা হয় না।'

'বলিস কিরে!'

'খেতে-খেতে তাইতো এত দেরি হল। কি সুন্দর যে রাঁধেন শরতের মা!'

'কোন রান্নাটা সব চেয়ে ভালো হয়েছিল?'

'চচ্চড়ি—চচ্চড়ি! এমন চচ্চড়ি জীবনে আমি আর কখনো খাইনি মশাই।'

'বলিস কিরে? সেই চচ্চড়ি তুই একা-একা খেয়ে এলি?' নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর : 'ইখানকার জন্যে একটু আনলিনে?'

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল লাটু। সত্যিই তো, মস্ত ভুল হয়ে গেছে। নিজের যা ভালো লাগে তাই তো দেবতাকে উৎসর্গ করতে হয়। তাকেই তো বলে আত্মবৎ সেবা। অর্থাৎ নিজের সেবার পক্ষে যেটি রুচিকর তাই দিয়ে তোমার প্রিয়তমের সন্তোষ করো। যেটিতে তোমার রতি সেইটিতেই আরতি ভগবানের।

'শোন, কাল আবার যাবি কলকাতায়।' ঠাকুর হুকুমজারি করলেন। 'আর সেই শরতের বাড়িতে। শরতের মাকে বলবি ফের তেমনি করে চচ্চড়ি রাঁধতে। আর সেই চচ্চড়ি নিয়ে আসবি ইখানকার জন্যে। বুঝলি?'

পরদিন পায়ে হেঁটে লাটু ঠিক গেল কলকাতায়। শরতের মায়ের থেকে নিয়ে এল চচ্চড়ি। একটু মুখে দিয়ে ঠাকুর তো আনন্দের উর্দ্ধে হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওরে, সত্যিই তো, এ যে অমৃত। এমন চচ্চড়ি তো কোনোদিন খাইনি। শরতের মা'র মন ভালো নইলে কি রান্নায় এমন তার হয় রে?'

যার মন পরিচ্ছন্ন, তার কাজও শুভাবহ। কাজ মনেরই প্রতিফলন। গোল জিনিসের ছায়া গোল, চৌকোর ছায়া চৌকো। তেমনি তোমার যেমন মর্ম তেমনি কর্ম।

লালাবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন, শরপুঞ্জের মত বৃষ্টি নেমে এল, এক দরিদ্র গ্রাম্য নারীর ঘরের দাওয়ায় তিনি আশ্রয় নিলেন। এমন বর্ষণ যে ছেদ টানতে চায় না। দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করছেন লালাবাবু, বৃষ্টির সমাপ্তি নেই। দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে খিদে পেয়ে গেল যে।

গ্রাম্য নারী দরজা খুলে শীলসম্পন্ন অতিথিকে অন্তঃপুরে ডেকে নিল। ঘন দুধে চিনি ফেলে চারটি চিঁড়ে দিল খেতে। পরম তৃপ্তিতে লালাবাবু খেলেন সেই দুধ-চিঁড়ে।

সেই তৃপ্তি সেই প্রীতি নিবেদন করলেন তাঁর রাধাবল্লভকে। শুরু হয়ে গেল রাধাবল্লভের চিঁড়ে-ভোগ।

আমার ভালো লাগা যে তোমারই ভালো লাগা।
আর তোমার যত দুঃখ সব আমার দুঃখের জন্যে।
তাই ঠাকুর একদিন বললেন মাকে, 'জীবের জন্যে আমি শত দুঃখ সয়েছি, তুমিও তাদের একটু দেখো।'
মায়ের খুব জ্বর, থার্মোমিটার লাগাতে এসেছে একটি মেয়ে। থার্মোমিটারটিকে মা বলেন কাঠি।
বললেন, 'ঠাকুরের কথা রেখেছি আমি মা। যেখান থেকে যে এসেছে, কারুকে বারণ করিনি। সবাইকে নাম বিলিয়েছি। মানুষের পাপে তাপে দেহটা জ্বলে গেল। কাঠিতে কি জ্বর পাবে মা! এ আমার অন্তঃজ্বরা।'
মাঝে-মাঝে ঠাকুরের একটু পা টিপে দেন মা। মাঝে-মাঝে সেটি বুঝি মনের মতন হয় না। তখন ঠাকুর মায়ের গা টিপে দেখিয়ে দেন, বলেন, 'এমনি করে টেপো।'
ঠাকুর কিছু খেতে পাচ্ছেন না।
ঠাকুরের দাদা রামকুমার বিকারের সময় জল খাচ্ছেন, তাড়াতাড়ি হাত থেকে জলের গ্লাশ কেড়ে নিলেন ঠাকুর।
খুব চটে গেলেন রামকুমার, শাপ দিয়ে বসলেন। বললেন, 'তুই যেমন আমায় জল খেতে দিলিনে, তুইও তেমনি শেষ সময়ে খেতে পারবি নি কিছু।'
ঠাকুর বললেন, 'আমি তো তোমার ভালোর জন্যে জল খেতে দিচ্ছি না। তাই বলে তুমি আমাকে শাপ দিলে?'
তখন যেন চেতনা হল রামকুমারের। কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'ভাই, কেন কে জানে অমন একটা অসম্ভব কথা বেরিয়ে এল মুখ থেকে।'
মুখ দিয়ে যখন বেরিয়ে এসেছে তখন আর ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না। হোক না সে ছোট ভাই। আপনার জন।
'তার মানে' মা বললেন, 'কর্মের ফল ঠাকুরকেও ভোগ করতে হয়েছে। অনেক জন্মের সংস্কারের ফল। যে কটা ঢেউ আছে সব কাটিয়ে যেতে হবে।'
কিন্তু সর্বদিন এমন ছিল না।
সেই এক বুড়ি লাঠি ধরে কাঁপতে-কাঁপতে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। ডান হাতে লাঠি, বাঁ হাতে ছোট্ট একটি পাতার ঠোঙা।
ইচ্ছে ঠাকুরকে একটু মিষ্টিমুখ করানো। কিন্তু তাঁর ঘরে প্রচণ্ড ভিড়। সাধ্য কি অনামা-অজানা বুড়ি সে ঘরে ঠাঁই পায়। নিরিবিলিতে বলে একটু তার প্রাণের কথা।
অগত্যা নবতে এসে দাঁড়াল। বললে, 'মা, একটু সন্দেশ এনেছিলুম ওঁকে খাওয়াব বলে। কি বিরাট ভিড় হয়েছে সেখানে। উপায় নেই মনের ইচ্ছাটি পূর্ণ করি। তাই তোমার কাছে রেখে গেলুম মা, আমার হয়ে তুমি খাইয়ে এস।'
'ঐ ভিড়ের মধ্যে আমিই বা যাব কি করে?' বললেন শ্রীমা। 'আপনার সন্দেশ আপনিই দিয়ে আসুন।'
বুকে বল বেঁধে ভিড়ের দিকে আবার এগুলো বৃদ্ধা। আশ্চর্য, ঢুকতে কেউ তাকে

বাধা দিল না। দেখল তক্তপোশের পায়ার কাছে অনেকে অনেক রকম নৈবেদ্য রেখে গেছে, তারই মধ্যে নিজের ছোট্ট ঠোঙাটি লুকিয়ে রাখল। প্রণাম করে চলে গেল নীরবে। প্রাণের কথাটি বলা হল না। হে হৃদয়বিহারী বুঝে নাও আমার মর্মের গুঞ্জন।

ভাবাবেশ হয়েছে ঠাকুরের। দেহভূমিতে নেমে বলে উঠলেন, 'খাব। খিদে পেয়েছে।'

স্তূপীকৃত নৈবেদ্য থেকে বড় ঠোঙাটি বেছে নিলেন গৌরীমা।

ঠাকুর বললেন, 'উঁহু।'

শাঁসালো দেখে আরো একটি বের করলেন গৌরীমা। এটিও ঠাকুর বাতিল করে দিলেন। আঙুল দেখিয়ে বললেন : 'ঐ যে, ছোট্ট ঠোঙাটি—'

সেই বুড়ির ঠোঙা। সেই বুড়ির নিবেদন।

সবটুকু সন্দেশ খেয়ে নিলেন ঠাকুর। সন্দেশের মিঠায় শুনলেন তার প্রাণের কান্নার মধুরিমা।

সেদিন ছোট একটি ছেলেকে নিজেই ডাকলেন সন্দেশ খেতে। তিন-চার বছরের শিশু, কখন দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে কে জানে। দাড়ি-গোঁফওলা অচেনা লোক দেখে খানিকটা ভয় পেয়েছে বোধহয়, কিন্তু মুখে দুষ্টুমিমাখা মিষ্টি হাসি— যেন আর দু পা এগিয়ে এলেই কিছু একটা লোভের বস্তু পাওয়া যাবে।

'আয়, আয়।' ঠাকুর হাত বাড়ালেন। 'সন্দেশ খেতে দেব।'

এক গাল হেসে শিশু ঠাকুরের কোলে চড়ে বসল।

ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তুই কাদের বাড়ির ছেলে?'

আর কাদের বাড়ি! যিনি কোলে তুলে নিয়েছেন, তিনিই আমার বাড়ি-ঘর।

ছেলেটা কথা কয় না, নির্ভয়ে হাসে।

'তোর নাম কি?'

উজ্জ্বল চোখে ছেলেটা বললে, 'শিবকালী।'

দরজায় কার ছায়া পড়ল। ঠাকুর তাকিয়ে দেখলেন স্ত্রীলোক। ছেলে কোথায় লুটিয়ে পড়ে ঠাকুরকে প্রণাম করবে, তা নয়, এক লাফে কোলে উঠে বসেছে, তাই অস্থির পায়ে ছুটে এসেছে মা। চোখে নীরব শাসন, নোংরা ছেলে, দুষ্টু ছেলে, নেমে পড় শিগগির।

'এ তোমার খোকা বুঝি?' ঠাকুর বললেন স্ত্রীলোকটিকে, 'বেশ নাম রেখেছ। শিবকালী।' বলে তিনবার উচ্চারণ করলেন, শিবকালী, শিবকালী, শিবকালী।

আদি-মধ্যান্ত-শূন্য শিব, ভবভয়শমনী কালী। বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথ, কাশী-পুরাধিশ্বরী অন্নপূর্ণা।

জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ পূর্ব-প্রথম ইজ্য-পূজ্য মান্য-শ্লাঘ্য সকলকে প্রণাম, আবার সদ্যোজাত-কেও প্রণাম। প্রণাম শিশু ভোলানাথকে।

কালীঘাট অঞ্চল থেকে এসেছে স্ত্রীলোক। নাম ব্রজবালা। ঠাকুরের কাছে আসবার আগে ছেলে কোলে নিয়ে গিয়েছিল নবতে, শ্রীমা'র কাছে। ছেলের মঙ্গল চেয়েছিল। শ্রীমা বললেন, ছেলেকে ছেড়ে দাও, ঠাকুরের কাছে চলে যাক গুটি-গুটি। আর শিব-

কালীকে শিখিয়ে দিলেন, গিয়েই ঠাকুরকে প্রণাম করবি, পায়ের নিচে পড়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খাবি। বুঝলি?
খুব বুঝেছে যা হোক। পায়ে না পড়ে কোলে চড়ে বসেছে। শিশুর হাতে ঠাকুর একটি সন্দেশ দিলেন। বললেন, 'খা।' লোভার্ত ছেলে, অথচ মুঠোর মধ্যে সন্দেশ চেপে ধরে নিস্পন্দ হয়ে রইল। শুধু বলতে লাগল, শিবকালী, শিবকালী, শিবকালী।
ব্রজবালা ছুটে এল মা'র কাছে।
মা বললেন, আর ভাবনা কি, তোমার ছেলের কাজ হয়ে গেল!
শুধু ঈশ্বরকে আশ্রয় করে থাকো আর নাম করো। কালাতীতকল্যাণ শিব আর কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা কালী।
একবার একটি ভক্ত এসে বললেন শ্রীমাকে, 'মা, আমি জপের সংখ্যা ঠিক রাখতে পারি না। হাত চলে তো মুখ চলে না আর মুখ চলে তো হাতের গণনা ভুল হয়ে যায়।'
শ্রীমা বললেন, 'এর পর দেখবে হাত-মুখ কিছুই চলবে না, শুধু মনে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে।'
নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করো। নামসাধনই পরম সাধন। নিশ্বাস-প্রশ্বাসেই রক্ত চলাচল, দেহরক্ষা। দেহের প্রতিটি অণুতে-পরমাণুতে তার কাজ। অনেক রকম গন্ধ নিয়েছ তোমার ঘ্রাণে, এবার নামসৌরভ নাও। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নাম-গন্ধ মিশে গেলে ধীরে-ধীরে সমস্ত দেহ নামময়, নামাঙ্কিত হয়ে উঠবে। এই ভাবেই সাত্ত্বিক হয়ে উঠবে দেহ। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত কর্মও শুভসত্ত্বান্বিত হবে। নাম সাধনই কামশোধন। সর্বশোধন।
এমন কি নাম করতে-করতে দেহে, দেহের অস্থিচর্মে পর্যন্ত, নাম ফুটে ওঠে।
বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'অর্ধকুম্ভে বৃন্দাবন গিয়েছিলাম। যমুনার চড়াতে দেখলাম সাধুদের ভিড়। ভাবলাম দর্শন করে আসি। বালির উপর দেখলাম একখানা হাড় পড়ে আছে। সন্দেহ নেই মানুষের হাড়। কি মনে হল তুলে নিলাম হাড়খানা। দেখি সমস্ত হাড়খানাতে দেব নাগরী অক্ষরে 'হরেকৃষ্ণ' লেখা। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে হাড়-খানা দেখালাম সাধুদের। সবাই অবাক হয়ে গেল। নিশ্চয়ই কোনো বৈষ্ণব মহা-পুরুষের অস্থি, সকলে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে লাগল। সঙ্কীর্তন লাগিয়ে দিলে। পরে কেশীঘাটের কাছে যমুনার চড়ায়-ই সমাধিস্থ করল অস্থি।'
এক ভক্ত শ্রীমাকে বললে, 'জপ করতে আর ইচ্ছে নেই। করে কিছুই হচ্ছে না। কাম ক্রোধ মোহ আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। মনের ময়লা একটুও কাটেনি।'
'নাম করতে-করতেই কাটবে।' বললেন শ্রীমা, 'নাম না করলে চলবে কেন? পাগলামি কোরো না। যখনই সময় পাবে নাম করবে। ডাকবে ঠাকুরকে।'
'কই কিছুই হচ্ছে না।' স্বরে অপার নৈরাশ্য নিয়ে বললে সেই ভক্ত। 'আবার সেই পুরোনো অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশি, অন্যায় কাজ করি। যতই চেষ্টা করি না কেন কুচিন্তা ছাড়তে পারি না।'
বরাভয়ময়ী মা বললেন, 'ও কি আর জোর করে ছাড়া যায়? ও তোমার পূর্বজন্মের সংস্কারে হচ্ছে। নামেই প্রারব্ধ নষ্ট হবে। নৈরাশ্য ও শুষ্কতার ওষুধই হচ্ছে নাম।'

কাশীপুরের বাড়িতে কাঠের সিঁড়ি। ধাপগুলোও উঁচু-উঁচু। আড়াই সের দুধের বাটি নিয়ে শ্রীমা উঠছেন উপরে, হঠাৎ কি হল, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। দুধ তো গেলই, মায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। বাবুরাম ছুটে এসে মাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়।

ঠাকুরের কানে গেল সেই কথা। বাবুরামকে ডেকে এনে বললেন, 'তাই তো বাবুরাম, এখন কি হবে? আমাকে খাওয়াবে কে?'

খান তো ভাতের একটু মণ্ড, তা গোলাপ-মা খাইয়ে দেবে। কিন্তু খাদ্যই তো সব নয়, আসল হচ্ছে সেই সান্নিধ্য সেই আত্মস্থ হয়ে পরমাত্মাতে চিত্ত সংলগ্ন করে থাকা।

হাতের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে নথ বোঝালেন ঠাকুর। আর নথ দেখিয়ে বোঝালেন শ্রীমাকে। বললেন, 'ও বাবুরাম, এই ওকে তুই একটু আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবি?'

'কি করে আনব! মায়ের পায়ে যে ব্যথা। মাটিতে ফেলতে পারেন না পা।'

'কেন একটা ঝুড়িতে বসিয়ে মাথায় করে তুলে নিয়ে আসবি এখানে। তুই আর নরেন। পারবি নে?'

নরেন আর বাবুরাম তো হেসে খুন।

তিনদিনেই ব্যথার কিছু উপশম হল। নরেন আর বাবুরাম মাকে ধরে নিয়ে গেল উপরে, ঠাকুরের কাছে।

এবার আমাকে তোমার সেবার কাজে লাগাও। আমাকে একলা ফেলে রেখো না। তুমি আমাকে তোমার কাছে-কাছে থাকতে দাও। তোমার এই কাছে-কাছে থাকাটিই আমার একমাত্র পুজো। আমার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিও না। আমাকে তুমি ডেকে নাও তোমার পাশটিতে। আমার হৃদয়ে তোমারই যে সঞ্চিত সুধা তারই আস্বাদ গ্রহণ করো আমার হাত থেকে। শুধু আমিই তো তোমাকে চাই না, তুমিও আমাকে চাও। শুধু তুমিই তো আমাকে কাঁদাও না, আমিও তোমাকে কাঁদাই। তাই এবার সব ব্যবধান ভেঙে দাও। তোমার কৃপাচোখে আমাকে দেখ। তোমার স্নেহকরতলে নির্ভয়-নির্ভর করো। আর নাও আমার এই দেবনিন্দিত হৃদয়ের সহজশোভন সম্ভাষণ।

'মাগো, সংখ্যা রেখে কি জপ করব?' শ্রীমাকে জিগগেস করলে এক ভক্ত।

'সংখ্যা গুণে যোগ করতে গেলে কেবল সংখ্যার দিকে লক্ষ্য থাকবে।' বললেন শ্রীমা, 'তাই এমনি জপ করবে।'

'কিন্তু জপ করতে-করতে মন কেন তাঁতে মগ্ন হয় না?'

'করতে-করতেই হবে। মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। বসলেই দেহ স্থির, নাম করতে-করতে মন স্থির। তাঁকে ষোলো আনা না দিলে চলবে কেন? একটি স্ত্রীলোকের মন্ত্র ছিল 'রুক্মিণীনাথায়'। সে ঠিক-ঠিক উচ্চারণ করতে পারত না। সে বলত 'রুক' 'রুকু'। তাতে তাকে ঠেকতে হয়েছিল। পরে গুরুকৃপায় ফের মন্ত্র পেয়ে ভেলা ধরল।'

ঠাকুর বললেন, 'তুমি যদি ষোলো আনার কাপড় চাও তাহলে কাপড়ওলাকে ষোলো

আনা তো দিতে হবে। একটু কম পড়লে একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নেই। টেলিগ্রাফের তারে কোথাও যদি একটু ফুটো থাকে তা হলে আর খবর যাবে না।'

কিন্তু যাদের গুরুদত্ত মন্ত্র লাভ হয়নি তাদের কি হবে?

তাদের শুধু আকুল প্রার্থনা, প্রভু, তুমি তো সর্বত্রই আছ তবু আমার কাছে এসে দাঁড়াও; তুমি তো সব কিছুই দেখছ তবু আমার চোখের উপর চোখ রেখে আমাকে দেখ; সব কিছুই তুমি শুনছ তবু আমার বুকের উপর তোমার কান রেখে শোনো আমার নিঃশব্দ কান্না।

সেই নিঃশব্দ কান্নাই আমার মহামন্ত্র। হে জগৎগুরু, এ মন্ত্র তো তোমার দেওয়া। মানুষগুরু মন্ত্র দেন কানে, জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। হে প্রাণপাল, নিজের দেওয়া মন্ত্রের থেকে নিজের কান ফিরিয়ে নিও না। শোনো আমার কান্না, আমার চিরন্তনী প্রাণবাণী।
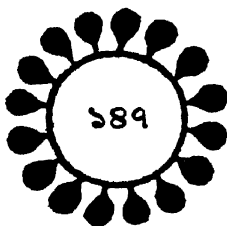
ঠাকুরের কাছে বিজয়কৃষ্ণ এসেছেন।

কথায়-কথায় বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'কে একজন সদাসর্বদা আমার সঙ্গে থাকেন। আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন কোথায় কি হচ্ছে।'

'ঠিক গার্ডিয়ান এঞ্জেলের মত। তাই না?' বললে নরেন।

ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'জানো, আমি ঢাকায় এঁকে দেখেছি।'

'ঢাকায়?' নরেন যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, শুধু ছায়া দেখিনি, গা ছুঁয়ে দেখেছি। টিপে-টিপে দেখেছি।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে তবে আরেকজন।'

নরেন ঢোঁক গিলল। বললে, 'আপনার কথা বিশ্বাস করি না এ কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে, কেননা আমিই নিজে যে এঁকে দূরে বসে দেখেছি অনেকবার।'

ঠাকুর গোপনে বললেন শ্রীমাকে, 'আত্মাটা যে বেরিয়ে যায় দেহ থেকে, এ ভালো নয়। দেহ বুঝি আর এবার বেশিদিন থাকবে না।'

ঠাকুর তখন অপ্রকট, একটি গৃহস্থ শিষ্য এসেছে মা'র কাছে। বললে, 'মা, কেন ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে না?'

'দর্শন কি এতই সোজা?' বললেন মা, 'ডাকতে থাকো, ক্রমে-ক্রমে হবে। এ জন্মে না হয় পরজন্মে হবে। পরজন্মে না হয় তার পরজন্মে।'

নরেনের হয়েছিল। হয়েছিল বিজয়কৃষ্ণের।

শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গের পঞ্চমখণ্ডে লিখছেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী : "গয়াতে দীক্ষা-গ্রহণের পর ঠাকুর (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ) কলিকাতায় আসিয়া বরাহনগর মণি মল্লিকদের বাগানে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরমহংসদেব ঠাকুরকে দেখিয়াই বলিলেন, এ কি, তোমার যে গর্ভলক্ষণ হয়েছে। ঠাকুর তখন তাঁহাকে দীক্ষালাভের সমস্ত পরিচয় দেন। পরমহংসদেব শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আর একবার ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের দর্শনমানসে যান। পরমহংসদেব একটু অসুস্থ ছিলেন। শিষ্যেরা ঠাকুরকে নিকটে যাইতে বাধা দিতে লাগিল। পরমহংসদেব তখন হাতে তালি দিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুর সম্মুখে যাওয়া মাত্রই পরমহংসদেব বলিলেন, আহা, তোকে দেখে যে আমার হৃদপদ্মটি ফুটে উঠল। এই বলিয়াই সমাধিস্থ হইলেন। একবার ঠাকুর পশ্চিমাঞ্চলে বহু স্থান ঘুরিয়া কলিকাতা আসিলেন। একদিন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। পরমহংস-দেব ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত তো ঘুরে এলি, কোথায় কি রকম দেখলি বল দেখি? ঠাকুর কহিলেন, কোথাও চার আনা, কোথাও আট আনা, কোথাও বারো আনা চৌদ্দ আনাও দেখেছি, কিন্তু ষোলো আনা এখানে। পরমহংসদেব শুনিয়া ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন।"

ঠাকুরের যেমন কালী, বিজয়কৃষ্ণের তেমনি শ্যামসুন্দর।

একদিন শ্যামসুন্দর বিজয়কৃষ্ণকে বললে, 'আমি সোনার চুড়ো পরব। আমাকে একটা গড়িয়ে দে না।'

বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মসমাজে। সে বললে, 'আমি তোমাকে মানি না। যারা মানে, তাদের বলো গে। আমার টাকা-পয়সা নেই।'

'তোর নেই, তোর খুড়ির আছে।' বললে শ্যামসুন্দর। 'দ্যাখ গে তোর খুড়ির ঝাঁপির মধ্যে অনেক টাকা। খুড়িকে বলে চেয়ে নে না।'

খুড়িমাকে বললে বিজয়কৃষ্ণ।

'কি আশ্চর্য,' খুড়িমা অভিভূতের মত বললে, 'কাল যে আমাকেও স্বপন দিয়েছেন শ্যামসুন্দর। বললেন, ওগো আমি সোনার চুড়ো পরব। আমি বললুম, টাকা কোথায় পাব? শ্যামসুন্দর বললেন, দ্যাখ না ঝাঁপি খুলে, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কোন না পাবি? লুকিয়ে-লুকিয়ে সাতষট্টি টাকা জমিয়েছিলাম ঝাঁপিতে, কেউ জানে না, কিন্তু শ্যামসুন্দর ঠিক দেখে রেখেছেন। সাধ্য নেই তাঁর চোখে ধুলো দি।'

অগত্যা বিজয়কৃষ্ণের হাতে টাকা দিল খুড়িমা। সেই টাকায় ঢাকা থেকে গড়ানো হল সোনার চুড়ো।

সেই সোনার চুড়ো পরানো হল শ্যামসুন্দরকে।

সন্ধের আগে ছাদে গিয়েছে বিজয়, শ্যামসুন্দর ঘর থেকে উঁকি মারল উপরে। বললে, 'ওরে একবার দেখে যা না চুড়ো পরে আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে।'

'আমি আর কি দেখব,' স্নেহকটাক্ষ ফিরিয়ে দিল বিজয়। 'আমি তো আর তোমাকে মানি না। যারা তোমাকে মানে তাদের ডেকে আনো গে।'

শ্যামসুন্দর হাসল মৃদু-মৃদু। বললে, 'নাই বা মানলি, তাতে একবার দেখতে কি দোষ!'

সত্যিই তো, দেখতে বাধা কি! একটা পাথরের মূর্তির মাথায় মুকুট পরানো হয়েছে, এইটুকুই তো দেখা। দেখি না কেমন গড়িয়ে আনলাম সোনার চূড়ো!

শ্যামসুন্দরের কাছে এসে দাঁড়াল বিজয়কৃষ্ণ। এ কি, চোখ যে আর ফিরিয়ে নিতে পারছি না! পদ্মপত্রবিশালাক্ষ কি অপার স্নেহে তাকিয়ে আছেন! তমালশ্যামলদ্যুতি সর্বাঙ্গে, সমস্ত ঘর নয়, সমস্ত ভুবন যেন আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন।

'কি রে, মানিস না, তবে অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন?' বললে শ্যামসুন্দর। 'চোখের দেখা তো কখন হয়ে গিয়েছে। এবার যা না ফিরে।'

পা ওঠে না বিজয়ের, চোখে পলক নেই। বললে, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে এতদিন এত ঘোরালে কেন? কালাপাহাড় বানিয়ে সব ভাঙালে কেন একধার থেকে?'

শ্যামসুন্দর বললে, 'তুই কে? সব আমি। ভেঙেওছিলাম আমি, এখন আবার গড়েও নিচ্ছি আমি। ভেঙে গড়লে কত সুন্দর হয় তার খেয়াল আছে?'

বিভ্রম্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশ শ্যামসুন্দরের দিকে মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল বিজয়। আমি মানি আর না মানি কি এসে যায়, তুমি তারুণ্যামৃতপারাবার, তুমি মধুর মধ্যমণি। আমি জানি আর না জানি কি এসে যায়, তুমিই লীলাকল্লোলবারিধি, তুমিই সর্বসৌন্দর্যের সিন্ধু।

এক দিন দুপুরে বসে আছে বিজয়, শ্যামসুন্দর এসে নালিশ করলে।

'দ্যাখ, আজ আমাকে খেতে দিয়েছে বটে, কিন্তু জল দেয়নি।'

'এ কখনো হয়?'

'জিগগেস কর না তোর খুড়িকে।'

খুড়িমাকে ডেকে জিগগেস করলে বিজয়। 'শ্যামসুন্দরকে আজ জল দাওনি?'

'কে বললে তোকে?'

'শ্যামসুন্দর বললেন।'

'শ্যামসুন্দর তো আর লোক পেল না, তুই ব্রহ্মজ্ঞানী, তোকে বলেছে জল দেবার কথা।'

'বেশ তো, তুমি একটু খোঁজ করেই দেখ না।'

খোঁজ নিয়ে খুড়িমা মাথায় হাত দিলেন। সত্যিই শ্যামসুন্দর আজ অপীত।

আমি তোমাকে না চাইলেও তুমি আমাকে চাও। আমি না মানলেও তুমি আমাকে ধরে থাকো। আমি তোমাকে ছাড়িয়ে চলে যেতে চাই, কিন্তু কিছুতেই তুমি ছাড়ো না।

ঠাকুর তীব্র বৈরাগ্যের গল্প বলছেন বিজয়কে। তীব্র বৈরাগ্য মানে দুঃসাহসিক অনুরাগ। শরণাগতি মানে চুপ করে করজোড়ে বসে থাকা নয়, শরণাগতি মানে

হচ্ছে শরণে আগতি, এগিয়ে গিয়ে ধরা, রোক করে ধরা, জোর করে আঁকড়ানো।
একজনের স্ত্রী তার স্বামীকে একদিন বললে, শ্নেছ? দাদা আজ কদিন থেকে সংসার ত্যাগ করে সন্নিসি হবার চেষ্টা করছে! বলো কি? কি করছে তোমার দাদা? খাওয়া কমিয়েছে, মাটিতে শোয়, বউয়ের সঙ্গে ভালো করে কথা কয় না। তাই বড় ভাবনা হয়েছে, পাছে সন্নিসি হয়ে বেরিয়ে যায়। স্বামী শুধু একটু হাসল। বললে, দূর ক্ষেপি, সে যাবে না, মিছে কথা, সন্নিসি কি অমনি করে হয়? স্ত্রী বললে, ওগো না সে যে কাপড় ছুপিয়েছে, সব ঠিকঠাক, সে নিশ্চয়ই যাবে। স্বামী আবার হাসল। বললে, আমি বলছি যাবে না। সন্নিসি কি অমনি করে হয়? স্ত্রী ক্ষেপে গেল। ঝাঁজিয়ে উঠে বললে, অমন করে হয় না তো কেমন করে হয়? কেমন করে হয় দেখবে? বলে স্বামী হঠাৎ নিজের পরা কাপড়খানি ছিঁড়ে ফেলে কোপীন করে পরলে। বললে, এমনি করে হয়। বলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আর এল না।
'একবার আমার ভারি ব্যামোর সময় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে নিয়ে গেল।' বলছেন ঠাকুর। 'গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, স্বর্ণ পটপটি খেতে হবে। কিন্তু জল খেতে পাবে না। বেদানার রস খেতে পারো। সকলে ভাবলে, এ কি সম্ভব, জল না খেয়ে কি করে থাকব! এই কথা? আমি তখন জল খাব না বলে রোক করলুম। পরমহংস, আমি তো পাতিহাঁস নই, রাজহাঁস। দুধ খাব।'
যা একবার মিথ্যা বলে জেনেছি তাকে যদি রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে না পারি তাহলে কিসের মনুষ্যত্ব?
'তুমি মাঝে-মাঝে আসবে।' বিজয়কে বললেন ঠাকুর, 'তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে।'
মামুলি নিয়মকানুন মেনে বিগ্রহ গড়লে বা চিত্রপট আঁকলেই চলবে না, তাতে মেশাতে হবে কারুকারের ভাবলাবণ্য, ভক্তির পবিত্রতা। সেই নিয়েই সেদিন কথা হচ্ছিল বিজয়ের সঙ্গে।
বিজয়কৃষ্ণ বললে, 'চিত্রপট ভাবশুদ্ধরূপে আঁকা উচিত। আজকাল বিশেষ আর সেই ভাবশুদ্ধি দেখা যায় না।'
'এঁড়েদায় মন্দিরের বারান্দায় যে চিত্রপট আছে দেখেছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'না, দেখিনি।'
'ঐ চিত্রপট ঠিক-ঠিক আঁকা। একবার গিয়ে দেখে এস।'
'আপনি যদি সঙ্গে করে নিয়ে যান তবেই যাওয়া হয়।'
'বেশ তো যাব।'
দুজনে একদিন গিয়ে হাজির হলেন এঁড়েদায়। মন্দিরে গিয়ে দেখলেন দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কখন খুলবে? কেউ ঠিক বলতে পারে না। পূজারী সামনের দিকের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে পিছনের দরজায় তালা দিয়ে চলে গিয়েছে। কখন ফিরবে কে জানে।
দুজনে মন্দিরের বাইরে থেকে প্রণাম করলেন। কাছেই কোন এক বৈষ্ণবের সমাধি আছে তাই গেলেন দর্শন করতে।

ফিরে এসে দেখেন তখনও মন্দির বন্ধ। মন্দিরের আঙিনার পাশে ছোট একখানি ঘর, তাতে বসলেন দুজনে। ঠাকুর গান ধরলেন আর বিজয়কৃষ্ণ ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন আঙিনায়।
মুহূর্তে কি হল কে জানে, মন্দিরের দরজা খুলে গেল।
সে কি, পূজারী ফিরে এল নাকি?
না, পূজারী কোথায়! মন্দিরের পিছনের দিকের দরজায় তেমনি তালাবন্ধই আছে। কতক্ষণ পরে পূজারী ফিরে এসে তো হতভম্ব। মন্দিরের সামনের দরজা খুলে গেল কি করে?
ব্যাকুলতায় খুলে গেল। এ তো শুধু বাইরের থেকে টান নয়, এ যে ভিতর থেকেও ঠেলা। এ বেগ দুদিকের। ওরা শুধু দেখতে আসেনি, আমিও যে দেখতে চাই। কতক্ষণ ওরা বসে থাকবে, তাই আমিই খুলে দিই দরজা। দেবতাই দরজা খুলে দিলেন।
প্রসাদী মালা ঠাকুর আর বিজয়কৃষ্ণের গলায় পরিয়ে দিল পূজারী।
এই দেখ সেই চিত্রপট। বারান্দায় সেই মনোনীত ছবিটি বিজয়কৃষ্ণকে দেখালেন ঠাকুর।
'প্রেম কাকে বলে?' ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'ঈশ্বরে যার প্রেম হয় তার জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত প্রিয় যে দেহ তা পর্যন্ত হুঁশ থাকবে না। বিজয় এখন বেশ হয়েছে, হরি-হরি বলতেই মাটিতে পড়ে যায়। ঠাকুরবিগ্রহ দেখলেই একেবারে সাষ্টাঙ্গ। আর অতি উদার সরল। সরল না হলে কি ঈশ্বরের কৃপা হয়?'
প্রেম রজ্জুস্বরূপ। প্রেম হলেই ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন। প্রেম হলেই সর্বভূতে সাক্ষাৎকার।
প্রেমই মধু। সেই মধুব্রহ্মের ভজনা করো। মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। এ মনোনেত্রোৎসবকে উপভোগ করো চতুর্দিকে।
মৈত্রেয়ীকে বলছেন যাজ্ঞবল্ক্য, 'পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় না, আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। কারু কামনায়ই কেউ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়।'
এ আত্মা কে? এ আত্মাই মধুব্রহ্ম।
মধুরাধিপতির সমস্ত অখিলই সুমধুর।
'খুব ভালোবাসা হলে তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখবি।' বললেন ঠাকুর, 'খুব ন্যাবা হলে তবেই তো চারদিক হলদে দেখা যাবে।'
'সব ঋণ থেকে মুক্ত কে?' আবার বললেন ঠাকুর। 'শুধু একজন। যে প্রেমোন্মাদ। তার আর তখন কেবা বাপ কেবা মা কেবা স্ত্রী! ঈশ্বরকে এত ভালোবাসা যে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। খসে গিয়েছে সমস্ত ঋণশৃঙ্খল।'
যখন প্রিয়মিলনের লগ্ন এসে পড়েছে তখন আর কিসের বিদ্যুৎ কিসের ঘনঘটা, কিসের বা উল্কাবৃষ্টি।
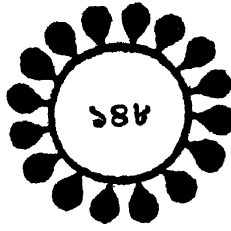
সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে-সঙ্গে বৃথা চলে যাচ্ছে আয়ু। চরম ভোগের উপাদান আজো পেলাম না খুঁজে-খুঁজে।

শুধু টিঁকে থাকাই কি জীবন? শুধু নিশ্বাস নেওয়া? গাছও তো টিঁকে আছে, বেঁচে আছে পত্রে-পুষ্পে। কামারের দোকানে হাপর নিশ্বাস ফেলছে সমানে। গ্রাম্য পশুরাও মেতে আছে আহারে-বিহারে। কান পচে গেল নানা শব্দের কোলাহল শুনে-শুনে, কবে শুনতে পাব সেই হরিনাম, শ্রবণমঙ্গল রসায়ন? কত কথাই তো বলছে জিহ্বা, একবার বলবে কবে হরিকথা? পট্টকিরীটই কি মাথার ভূষণ হবে, ভগবদভক্তের পদরেণু কি মাথায় ধরতে পাব না? যে হাত হরির পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিল না, কাঞ্চনকঙ্কণ থাকলেও তা মড়ার হাত। পা থাকতে যে হরিক্ষেত্রে গেল না তাতে আর তৃণগুল্মে প্রভেদ কি? কি প্রভেদ তাতে আর পাথরে যার হরিনামেও চোখে নেই অশ্রু, অঙ্গে নেই রোমহর্ষ! আর কত ঘ্রাণই তো নিলাম নাসিকায়, শ্রীবিষ্ণুপদার্পিত তুলসীর গন্ধটুকু নেব কবে?

দিন থাকতে-থাকতে বেরিয়ে পড়ো। হৃদয়নলিনদিনেশ এখনো অস্ত যায়নি। এখনো কিঞ্চিৎ আয়ু অবশিষ্ট আছে।

দেহ ধরেছিস কেন? সমস্ত রোমাঞ্চের শ্রেষ্ঠ—ঈশ্বর-রোমাঞ্চ আস্বাদ করবার জন্যে। 'তাই তো দেহের যত্ন করি।' বললেন ঠাকুর, 'ঈশ্বরকে নিয়ে যে সম্ভোগ করব।' আবার বললেন, 'এক-এক সময় মনে হয় দেহটা খোলমাত্র, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বই আর কিছু নেই।'

দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি। দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান। যতক্ষণ এ দেহ আমার বলে বোধ আছে ততক্ষণ সোঽহং নেই। যখনই এ দেহ তোমার বলে বোধ হবে তখনই দাসোঽহং।

আমার দেহ তোমার হাতের বীণা। তোমার হাতের লেখনী। যতদিন খুশি যেমন-তরো খুশি, বাজাও, লেখ। যখন ইচ্ছে হবে ছুঁড়ে ফেলে দিও অন্ধকারে। সেই অন্ধকারেই আবার তোমার হাতের নতুন বীণা নতুন লেখনী হয়ে উঠব।

দীপেরই বদল হয়, দ্যুতিটি অক্ষুণ্ণ। দেহেরই নাশ হয়, আত্মা চিরশিখা। দীপ আর তেলের তারতম্যে জ্যোতির তারতম্য। মাটিতে স্নিগ্ধ স্ফটিকে তীব্রপ্রভ। ঘৃতে স্বচ্ছ রেড়ির তেলে বিমলিন। শুধু এই তো সাধনা যেন ভালো দীপ পাই, ভালো আধার পাই, আহরণ করতে পারি ভালো তেল, আরো শক্তি। যেন আরো জ্বলতে পাই

উজ্জ্বল হয়ে। জ্বলতে-জ্বলতে মিশে যেতে পারি সেই নিখিলজ্যোতিতে।
'সুখ দুঃখ রোগ শোক জন্ম মৃত্যু এ সব দেহের, আত্মার নয়।' বললেন ঠাকুর, 'দেহের মৃত্যুর পর ঈশ্বর হয়তো ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, ভালো আধারে— যেমন প্রসব বেদনার পরে সন্তানলাভ।'
কিন্তু যতদিন দেহ ততদিনই তো কষ্ট। এ খোলস যত শিগগির ছেড়ে দেওয়া যায় ততই ভালো।
কোন দুঃখে?
'দেহ থাকলই বা।' বললেন ঠাকুর। 'এই সংসার যেমন ধোঁকার টাটি তেমনি আবার মজার কুটিও হতে পারে। শুধু একবার গুরুদত্ত কৃপা হলেই হয়। সমস্ত গেরো খুলে যায়, দিব্যচক্ষু ফুটে ওঠে। ভেলকি বাজি দেখনি? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি, তার একধার একটা জায়গায় বাঁধে বাজিকর। তারপর আরেকধার নিজের হাতে ধরে দড়িটাকে নাড়া দেয়। যেই নাড়া দেওয়া অমনি সব গেরো খুলে যায় একে-একে। অন্য লোকের সাধ্যও নেই টানাহেঁচড়া করেও সে সব গেরো খুলতে পারে। দেহে যেই একটু নাড়া খাওয়া অমনি দিব্যচক্ষু খুলে যাওয়া। মনের শুদ্ধিতেই দিব্যদৃষ্টি। নইলে ভাবো, সাধারণ একটা কুমারী মেয়ে, তার মধ্যে দেখলাম কিনা সাক্ষাৎ ভগবতী!'
গঙ্গা দিয়ে একখানি নৌকো যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়-হয়। মাঝি গান ধরেছে আপন মনে। গঙ্গার জল ছুঁয়ে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে সেই গীতধ্বনি ঠাকুরকে এসে স্পর্শ করল। অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। সমস্ত শরীরে পুলককণ্টক। মাস্টার কাছে ছিল, তার হাত ধরলেন। বললেন, 'দেখ-দেখ আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ।'
মাস্টার ঠাকুরের গায়ে হাত রাখল। আনন্দে-আবেগে সে দেহ শিহরিত হচ্ছে, কাঁপছে থরথর করে। শব্দরূপে ব্রহ্ম ঠাকুরকে আচ্ছন্ন করেছে।
মণি মল্লিকের নাতজামাই এসেছে। সে খুব জাঁক করে বলছে, ইংরেজের বইয়ে লিখেছে ঈশ্বর তেমন সর্বজ্ঞ নয়। সর্বজ্ঞ যদি হবেন তবে লোকের এত দুঃখ কেন? কোনো কার্যকারণ নেই তবু দুঃখ, ব্যাখ্যাহীন দুঃখ। একদিন যখন মরবেই তখন তাকে তিলে-তিলে কষ্ট দিয়ে মারা কেন? লেখক বলেছে, সে হলে এর চেয়ে ঢের-ঢের ভালো সৃষ্টি করতে পারত।
পণ্ডিতের কথা, শুনতে হয় সমীহ করে।
শেষে ঠাকুর বললেন বিনয়নম্র হয়ে, 'তাঁকে কি বোঝা যায় না? আমিও কখনো তাঁকে ভাবি ভালো, কখনো মন্দ। এক সের ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? কখনো অজ্ঞান চলে যায়, কখনো আবার তা ঘিরে ধরে। যেন পানাঢাকা পুকুর। একটা ঢিল ছোঁড়ো, দেখতে পাবে খানিকটা জল। কিন্তু কতক্ষণ! খানিক পরেই দেখতে পাবে পানা নাচতে-নাচতে এসে সে জলটুকুও ঢেকে ফেলেছে।'
[illegible] রাখাল-ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসেছে মাস্টার। সকলেই দেখেছে তুমিও একবার দেখ। দেখ কিছু করতে পারো কি না।

ডাক্তারের আঙুলের দিকে তাকালেন ঠাকুর। দেখলেন আঙুলগুলো মোটা-মোটা। 'যারা কুস্তিগীর তাদের মত তোমার আঙুল।' সহাস্যে বললেন ঠাকুর। 'দেখলে ভয় করে। মহেন্দ্র সরকার জিভ এমন জোরে টিপেছিল যে ভীষণ লেগেছিল, যেন গরুর জিভ টিপছে।'

'না, না, আমি হাত দেব না।' ডাক্তার বললে অপ্রস্তুতের মত। 'আপনার লাগবে না কিছু।'

তবে দেখ।

শুধু ঐটুকু। আর কথাবার্তা নেই ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তারের কি অভিমত, কি ব্যবস্থাপত্র, কৌতূহল নেই কণামাত্র। ভক্তদের সঙ্গে আলাপ।

আমাদের কিসে কি হবে! এই তো একমাত্র জিজ্ঞাসা!

'দীঘিতে বড় মাছ আছে, চার ফেল।' বললেন ঠাকুর।

চার কি? চার কোথায়?

অত কথায় কাজ নেই। ঠাকুর বললেন, 'দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে ডাকো। একটু নির্জনে চলে যাও। নির্জনে গোপনে কেঁদে-কেঁদে তাঁকে ডাকো তিনি সব করে দেবেন।'

এবার নির্জনে এসেছি, সংসার-কোলাহলের প্রান্ত উত্তীর্ণ হয়ে। আমার এবার ভয় ভেঙে দাও। আমি যে একাকী নই এটি বুঝতে দাও প্রাণ ভরে। একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাও আমার দিকে। হৃদয়ের থেকে উদ্‌ধৃত হয়ে দাঁড়াও আমার চোখের সামনে। তোমার জন্যে কত ধুলোপথ হেঁটে এসেছি, এড়িয়ে এসেছি কত অপবাদ ও প্রতিবাদের কণ্টক। তুমি যদি এখন দেখা না দাও ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে? আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, ঝড়ের নিশান উড়ছে ঈশান কোণে। আমাকে আশ্রয় দাও। ডান হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে তুলে ধরো আমাকে। আমাকে স্পর্শ করো। কোলে করে রাখো। আমি তোমার জন্যে এক পা এলে তুমি কি আমার জন্যে দশ পা আসবে না?

রাধিকার সর্প-অভিসারের গল্প বলছেন ঠাকুর। বলছেন লক্ষ্মীকে ও সারদামণিকে। 'নিকুঞ্জে এসেছে শ্রীকৃষ্ণ। বাঁশির সঙ্কেতধ্বনি করেছে। আর যায় কোথা! ললিতা বিশাখাকে নিয়ে শ্রীমতী সাজতে বসল। যাব-যাব আজ অভিসারে। ত্বরা কর ত্বরা কর সখি, তৃষ্ণাতরঙ্গিণী দুলে উঠেছে। কিন্তু তখুনি প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এখন যাবি কি করে? পাথর ডাগল, আতুর বারি, কাহে অভিসারিবি তুঁহু সুকুমারী। আমোদিনী রাধা উন্মাদিনী হয়েছে। বললে, কাকে সখি নিবারণ করছ? সমস্ত মর্যাদা সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করেছি, এখন কি এই সামান্য বৃষ্টির জলকে ভয় করব? তীর যদি একবার ছোঁড়া যায় সে কি আর ফিরে আসে? তোরা থাক। তুই যদি না শুনিস আমরাও শুনব না। বললে সব সখিরা। তুই বৃক্ষ আমরা তার পত্র-পুষ্প। তুই আকাশ আমরা তার চন্দ্রতারা। তখন সবাই বেরুল রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। এমন নয় যে রাস্তায় বেরুবার পর ঝড়-বৃষ্টি এসে পড়েছে আচম্বিতে। এ ঝড়-বৃষ্টি দেখে শুনে রাস্তায় বেরুনো। ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে, উড়িয়ে দিয়ে। রাস্তায় জলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সাপ শুয়ে আছে। রাধা ও সখিদের লক্ষ্য নেই,

সাপের উপরেই পা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সাপ আর কেউ নয় স্বয়ং অনন্তদেব। যেমনি উঠে দাঁড়িয়েছে অনন্তদেব সোঁ করে ফণা বিস্তার করে একেবারে তাদের নিকুঞ্জের ধারে পৌঁছে দিলেন। কেউ টেরও পেল না। এক পলকপতনের পরে আরেক পলক তুলে দেখল, একি, নিকুঞ্জে চলে এসেছি যে! ওমা গো, এ যে দেখি মস্ত বড় সাপ! সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সাপের থেকে। এ যে সাপের উপর পা দিয়ে আছি গো! চল-চল পালাই কৃষ্ণের কাছে। বুঝলি একেই বলে সর্পাভিসার।'

যদি দুস্ত্যজ অনুরাগ হয়, যদি আসে সর্বভঞ্জন ব্যাকুলতা ঠিক এসে উপনীত হবে। যাঁর মুরলী ত্রিজগন্মানসাকর্ষী তিনিই টেনে নিয়ে যাবেন। তুমি শুধু একবার ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও বাইরে এসে দাঁড়াও।

জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, ভক্তের কাছে ভগবান। ব্রহ্ম ক্ষুরধারের মত দুর্লক্ষ্য আর ভগবান সর্বরস-কদম্বমূর্তি। সমস্ত রসের আধার-আশ্রয়।

মল্লের কাছে অশনি, নরের কাছে নৃপতি, রমণীর কাছে মূর্তিমান মীনকেতু, গোপীর কাছে স্বজন, দুষ্টের কাছে শাস্তা, বাপ-মায়ের কাছে শিশু, ভোজরাজ কংসের কাছে মৃত্যু, অজ্ঞের কাছে বিরাটস্বরূপ, যোগীর কাছে পরমতত্ত্ব আর বৃষ্ণির কাছে দেবতা। যে ঈশ্বরকে যেমন ভাবে দেখে ঈশ্বর তার কাছে তেমনি। কৃষ্ণ যখন কংসের মল্লমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন সকলে তাকে এক রূপে এক চোখে দেখল না। কৃষ্ণে যে সকল রসেরই যুগপৎ আবির্ভাব তা কয়জনে দেখে! মল্ল দেখল রুদ্ররূপে, রমণী দেখল কন্দর্পরূপে, বাপ-মা সন্তানরূপে, দুষ্ট রাজারা বীররূপে আর কংস ভয়ঙ্কররূপে। রৌদ্র শৃঙ্গার বাৎসল্য বীর আর ভয়ানক সর্বরসের সমুচ্ছ্বাস।

সর্বরসের আস্বাদ্য ও আস্বাদক দুই-ই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যেমন সকলের প্রিয় সকলেও তাঁর তেমনি প্রিয়। তাঁর বাঁশি ডাকছে সবাইকে আর সকলেও সেই বংশীরবের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে। শুধু মানুষ নয়, বনের পশু-পাখি, বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম।

কৃষ্ণসারগেহিনী হরিণীরাও ছুটে এসেছে কৃষ্ণের কাছে। বিমুক্তগৃহাশা গোপিনীর মত। এই সারকৃষ্ণ ছেড়ে যাবে না আর কৃষ্ণসারের কাছে। সারসহংসের দল চারুগীত-হৃতচিত্ত হয়ে শ্রীহরির কাছে এসে মীলিতনেত্রে বসেছে স্তব্ধ হয়ে। পুষ্পফলাঢ্যা বনলতা আর প্রণতভারপুলকিত তরু প্রেমহৃষ্ট হয়ে মধুধারা বর্ষণ করছে।

আর গোপীরা?

তারা গোবিন্দে নতবাককায়মানসা। কৃষ্ণ বললেন, তারা মন্মনস্কা, মৎপ্রাণা, মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা। 'ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ।' তারা আমাকেই মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে, আমার জন্যে ছেড়েছে দেহস্বার্থ, পতিপুত্র। আমিই তাদের প্রিয়তম আত্মা, আমি মন দিয়ে পাবার, আমাকে তারা পেয়েছে মন দিয়ে। যারা আমার জন্যে লোকধর্ম বিসর্জন দিয়েছে আমি তাদেরই পালক-পোষক।

উদ্ধবকে বললেন, উদ্ধব, তারা আমার জন্যে বিরহোৎকণ্ঠ বিহ্বল হয়ে আছে। আমি দূরস্থ বলেই তারা আমাতে এমনি নিবিড় সংলগ্ন। আবার ফিরে যাব বলে তাদের আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম, আহা, সে কথা বিশ্বাস করেই তারা বহুক্লেশে দেহ ধারণ করে আছে। তুমি যাবে, একবার দেখে আসবে তাদের?

বাব্রাম বলে উঠল, 'আমি গোপী-টোপী জানি না।'
ঠাকুর ঝলসে উঠলেন, 'শালা, কলিকালে গোপীদের ভাব কি আর নিতে পারবি? শুধু তাদের টানটুকু নে। যে কৃষ্ণকে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র ধর্ম ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ ব্যাস শুক দূর থেকে স্তব করে, রাসের সময় সেই কৃষ্ণের গলা ধরে নৃত্য করেছে গোপীরা। অনিমেষ লোচনে পান করেছে তার মুখমাধুর্য।'

উদ্ধব ব্রজে এসেই প্রথমে নন্দ-যশোদার সঙ্গে দেখা করল। উদ্ধব, গোবিন্দ কি আমাদের কথা আর মনে রেখেছে? সে কি আর আসবে না ফিরে? তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি কি আর দেখতে পাব না? নন্দ প্রেমগদগদ কণ্ঠে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করতে লাগল। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল বলতে-বলতে। প্রেমপ্রসরবিহ্বল হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কাঁদতে লাগল যশোদা। স্নেহের গাঢ়প্রাচুর্যে তার পয়োধর থেকে দুগ্ধক্ষরণ হতে লাগল।

উদ্ধব বললে, দেহীদের মধ্যে আপনারা দুজনেই শ্লাঘ্যতম। অখিলগুরু নারায়ণে আপনাদের এই বিগাঢ়মতি। সন্তান—আলম্বন-বিভাব। আপনারা আশ্বস্ত হোন। শীঘ্রই কৃষ্ণ ফিরে আসবে আপনাদের কাছে।

আরো বললে, 'কৃষ্ণের কাছে প্রিয়-অপ্রিয় কিছু নেই, না বা উত্তম-অধম না বা সমান-অসমান। বাপ মা স্ত্রী পুত্র আত্মীয়-পর দেহ জন্ম-কর্ম কিছু নেই। কাঠের মধ্যে যেমন প্রচ্ছন্ন অনল তেমনি সকল দেহীর অন্তরেই নিহিত তাঁর নির্মল সত্তা। শুধু ক্রীড়ার জন্যে শুধু সাধুদের পরিত্রাণের জন্যে সকল যোনিতেই তাঁর আবির্ভাব। কুম্ভকারের ঘূর্ণ্যমান চক্রে চোখ রাখলে মনে হয় সমস্ত ভূমিই বুঝি ঘুরছে, তেমনি অহংদৃষ্টি নিবন্ধ মানুষ ভুল করে ভাবছে আমিই একমাত্র কর্তা, আমিই একমাত্র স্বয়ং-তন্ত্র। তিনি যেমন তোমাদের তেমনি আর সকলেরও। যে, যে ভাবে চায় তাকে তিনি সেই ভাবে দেখা দেন।'

ব্রজদ্বারে হেমময় রথ দেখে গোপীরা বিচলিত হল। এ কি কৃষ্ণচোর অক্রূর আবার এল নাকি? এবার বুঝি আমাদের দেহ কুড়িয়ে নিয়ে তার মৃত প্রভু কংসের পিণ্ড দেবে?

না, এ অক্রূর নয় তো! আজানুলম্বিত বাহু, কমললোচন, পীতাম্বর, পুষ্করমালী সুন্দর পুরুষ। দেখতে প্রায় কৃষ্ণের মত। এ কোত্থেকে এল বল দেখি?

আমি কৃষ্ণের বার্তাবহ। কৃষ্ণানুচর। বললে উদ্ধব। বসল সুখাসনে।

তখন সকলে তাকে বেষ্টন করে দাঁড়াল। সমুচিত সংবর্ধনা করলে। বললে, তুমি কৃষ্ণের সখা, আমরাও একদিন তার সখী ছিলাম। পিতামাতার প্রতি প্রিয়কাম হয়ে সে তোমাকে পাঠিয়েছে ব্রজপুরে, আমাদের জন্যে নয়। বন্ধুদের স্নেহবন্ধন, শুনেছি, মুনিরাও সহজে ছিঁড়তে পারে না। কিন্তু তোমার কৃষ্ণের ব্রজধামে কিছুই আর স্মরণীয় নেই। স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের মৈত্রী নিমিত্তমাত্র, যেমন ফুলের প্রতি ভ্রমরের। পাখি যেমন বীতফল বৃক্ষকে ত্যাগ করে, মৃগগণ যেমন দগ্ধ বনকে, তেমনি তোমার কৃষ্ণ আমাদের ত্যাগ করেছে।

একটা অলি উড়ে এসে গুঞ্জন করতে-করতে এক গোপীর পায়ের উপর বসতে চাইল।

গোপী বললে, ধূর্তের বন্ধু, চিনেছি তোমাকে। আর কোন পুরোনো বন্ধুর গান শোনাতে এসেছ আমাদের? তুমি যেমন মধুশেষ ফুল ত্যাগ করো, মধুপীত তেমনি আমাদের ছেড়ে গেছে। তার আপাতমধুর কথায় আমরা ভুলেছিলাম, লক্ষ্মীকে আবার ভুলিয়েছে। লক্ষ্মীর কাছে আমরা কি! লক্ষ্মী কেন, ত্রিভুবনে এমন কে কন্যা আছে যে সেই কপটসুন্দর সহাস্য মুখের দুষ্প্রাপ্য? তবু জানতাম দীনজনের জন্যেই তার উত্তমশ্লোক নাম। কিন্তু এ তার কেমন ব্যবহার, কেমন রীতিনীতি? কেন বারে-বারে পায়ের উপর বসছ জিগগেস করি। জানি অনেক চাটুবাক্য শিখেছ সেই কপটাচারীর কাছে। যার জন্যে আমরা স্বামী পুত্র গৃহ-কুল এমন কি পরকাল পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি, যে কৃতঘ্ন এ কথাও ভুলতে পারে তার সঙ্গে আবার সন্ধি কি? যে অসিত তার সঙ্গে আবার সখ্য কি? কিন্তু হায়-হায়, তার প্রসঙ্গও যে ছাড়তে পারি না, ভুলতে পারি না। অশ্রুতে চোখ আচ্ছন্ন তবু সেই কৃষ্ণসঙ্গমই ধ্যান করি। ব্যাধশরে হরিণীর মত বুক বিদ্ধ হয়ে গেছে তবু সেই ক্ষত দেখেও কঠিন হতে পারি না। বরং সেই কঠিনের প্রতিই কামমোহিত হচ্ছি। হে প্রিয়প্রেরিত বন্ধু, বৃথা রাগ করছি তোমার উপর, বলো সেই প্রিয়তমের কথা। এই দাসীদের কথা কি ভুলেও একবার সে উচ্চারণ করে? সে কি তার অগুরুবাসিত হাতখানি আমাদের মাথার উপর রাখবে না আর কোনো দিন?

উদ্ধব বিহ্বল হয়ে পড়ল। বললে, তোমরাই ধন্য, তোমরাই সিদ্ধকাম, তোমরাই লোকপূজ্য। তোমাদের এই বিরহসন্তাপ আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ। তোমাদের এই বিরহসন্তাপ দেখেই বুঝতে পারছি, ভগবৎ-প্রেমসুখ কি অনির্বচনীয়। তিনি তোমাদের জানাবার জন্যে কী বলে পাঠিয়েছেন জানো? বলেছেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁর আর বিয়োগ নেই। ধ্যানকাম হয়ে সর্বদা তোমাদের মন তাঁতে লগ্ন হয়ে থাকবে, তারই জন্যে তাঁর এই দূরস্থিতি। প্রিয়তম সর্বক্ষণ কাছে থাকলে রমণীদের আকর্ষণে আলস্য আসে, দূরে থাকলেই জাগে তাতে বিহ্বলপ্রাবল্য। তাই সম্পূর্ণ মন আমাকেই আবিষ্ট কর।

থাক, ঢের হয়েছে। শত্রু নাশ করে এখন সে রাজ্যলাভ করেছে, রাজকন্যাও বিয়ে করেছে শুনলাম, এখন আর এ বনচারিণীতে তার রুচি থাকবার কথা নয়। কিন্তু জিগগেস করি, আমাদের সে একদিন যেমন করে ভালোবেসেছিল তেমন করে কি বাসে, বাসতে পারে মধুপুরের কামিনীদের? কজ্জল নয়নের স্নিগ্ধ সলজ্জ হাসি দিয়ে অবলোকন দিয়ে তারা কি আমাদের মত পারে তার অর্চনা করতে? বলো আর কি সে আসবে না? তার গাত্রস্পর্শে সুশীতল করবে না, সঞ্জীবিত করবে না আমাদের? জানি, নৈরাশ্যই সুখ, তবু আশা ছাড়তে পারছি কই? গোপীরা আবার শোক করতে লাগল।

'তোমাদের হরিকথাগীতে লোকত্রয় পবিত্র হয়, তোমাদের চরণরেণু বন্দনা করি।' উদ্ধব বলতে লাগল, 'শ্রীহরির নিজ অঙ্গে একান্ত সংলগ্ন লক্ষ্মীর প্রতিও এমন অনুগ্রহ হয়নি। ভদ্রাচারের ধার ধারে না যে বনচরী তারা শুধু ভালোবাসার জোরেই ঈশ্বরকে লাভ করল। আমি আর কিছু চাই না, বৃন্দাবনে যে সকল

গুল্মলতা ও ওষধি এদের পদরেণু স্পর্শে পবিত্র হয়েছে আমি তাদের মধ্যে যে কোনো একটি হতে চাই।'

গোপীদের তাই বললেন শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদের ঋণ আমি কোনো কালে শোধ করতে পারব না। দেবতার আয়ু পেলেও নয়। দুর্জরগৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করে আমাতে আত্মার্পণ করেছ, প্রত্যুপকার দ্বারা নয়, তোমাদের প্রীতি দ্বারা আমিই অঋণী হব।

ঠাকুর আবার বলতে শুরু করলেন কৃষ্ণকথা :

'শ্রীকৃষ্ণ যেদিন রাসলীলা করেন সেদিন বৈকুণ্ঠ থেকে লক্ষ্মীও এলেন লীলা দেখতে। যোগমায়া দ্বার রক্ষা করছে, তাকে বললেন, দোর ছাড়, রাসস্থলীতে যাব। যোগমায়া বললে, আগে গোপীদের পদরজে গড়াগড়ি দিয়ে গোপীদেহ প্রাপ্ত হও, তার পরে যেতে পাবে রাসস্থলীতে। কি, এত বড় কথা? আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, আমি গোয়ালা মেয়েদের পদরজে গড়াগড়ি দেব? যাব না রাসস্থলী। আমি তপস্যা করে ভগবানকে নিয়ে করব রাসলীলা। আজও পর্যন্ত বৃন্দাবনে বিল্ববনে লক্ষ্মী তপস্যা করছে। কিন্তু কৃষ্ণ কি তপস্যার জিনিস? কৃষ্ণ ভালোবাসার জিনিস। গোপীরা সাধন ভজন তপজপ কিছুই জানে না, তাদের একমাত্র সম্বল ভালোবাসা।

'তারপর শিব এল কৈলাস থেকে। যোগমায়া পথ আটকাল। বললে, গোপীদের পদ-রজে গড়াগড়ি দিয়ে গোপীদেহ প্রাপ্ত হও, তার পরে যেতে পাবে রাসস্থলীতে। আশুতোষ ভোলানাথ, অভিমানের লেশমাত্র নেই। তখুনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গোপীদের পদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগল। গড়াগড়ির ফলে গোপীদেহ লাভ করল ভোলানাথ। নাচতে লাগল গোপীদের সঙ্গে। ললিতা-বিশাখাকে বললে শ্রীমতী, আমাদের শ্বেতাঙ্গ সখী শুধু একজন—অনঙ্গমঞ্জরী। এ নতুন শ্বেতাঙ্গ সখী কোত্থেকে এল? ও মা, তার কপালে যে দপদপ করে আগুন জ্বলছে! কৃষ্ণকে জিগগেস করলে, চেন ওকে? কৃষ্ণ বললে, কৈলাস হতে শিব এসেছে। সকলে পুষ্পাঞ্জলি দাও তাকে। কৃষ্ণ গিয়ে আলিঙ্গন করল। বললে, আপনি এখানে গোপী-শ্বর হয়ে বিরাজ করুন। আজও পর্যন্ত তাই রাসস্থলীতে গোপীশ্বর মহাদেবের অধিষ্ঠান।'

তার পর লক্ষ্মীকে বললেন ঠাকুর, 'আমার কাছে যা সব শুনলি তোরা দুজনে, খুড়ি ভাসুরঝিতে মিলে বলাবলি করবি। গরুগুলো দিনের বেলা যা খায় রাত্রে তা জাবর কাটে। বলাবলি করলেই আর ভুলে যাবিনে। মনে গেঁথে থাকবে।'

আবার বললেন, 'আমার দোকানে সব রকম জিনিস পাওয়া যায়। যে যেমন খদ্দের তাকে সেই জিনিসের জোগান দি। শোন আরো কৃষ্ণকথা :

'আয়ান ঘোষ আগের জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল। ঘোরতর তপস্যা করলে। ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললে, তোমার লক্ষ্মীকে পেতে চাই, তাকে আমার গৃহিণী করে দাও। ভগবান ভ্যাবাচাকা খেলেন, বললেন, ও ছাড়া অন্য বর নাও। অন্য বর নেব না, লক্ষ্মীই আমার একমাত্র লক্ষ্য। ভগবান চলে গেলেন। কিন্তু তপস্যা ছাড়ল না ব্রাহ্মণ। দেখি কেমন তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু। ভগবানকে আবার আসতে হল। বললেন, লক্ষ্মী ছাড়া আর যে কোনো বর নাও। ব্রাহ্মণ বললে, আর সব ছাড়তে

পারি লক্ষ্মীছাড়া হতে পারব না। আবার চলে গেলেন ভগবান। ব্রাহ্মণের তপস্যা আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনল। বার-বার তিনবার। তখন অনুপায় হয়ে বর দিলেন। বললেন, বেশ তুমি গয়লার ঘরে গিয়ে জন্ম নেবে আর লক্ষ্মী তোমার ঘরণী হবে। কিন্তু তুমি ক্লীব হবে, ঘরণীকে স্পর্শও করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ হাসল। বললে, তোমার লক্ষ্মী আমার ঘরণী হবে তাতেই আমি খুশি। তাকে আমার স্পর্শ করবার দরকার নেই, আমি তপস্বী, দিবানিশি তপস্যা করব। তথাস্তু। আয়ান ঘোষ খাবার সময় বাড়িতে একবার আসে আর বাকি সময় কেশীঘাটে বসে তপস্যা করে।'

সৎ চিৎ আর আনন্দ। সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী। সরস্বতী যমুনা আর গঙ্গা। সন্ধিনী মানে কর্ম, সংবিৎ মানে জ্ঞান আর হ্লাদিনী মানে ভক্তি। সরস্বতীর কর্মধারা যমুনার জ্ঞানধারা আর গঙ্গার ভক্তিধারা। ঈশ্বরের তাই তিন রূপ। প্রতাপঘন, প্রভাবঘন আর প্রেমঘন। অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রভাব আর অনন্ত প্রেম।

তাই কর্ম জ্ঞান আর প্রেমের সাধন করো। কর্মে সর্বভূতে হিতকারী জ্ঞানে সর্বভূতে সমদর্শী আর প্রেমে সর্বভূতে প্রীতিমান।
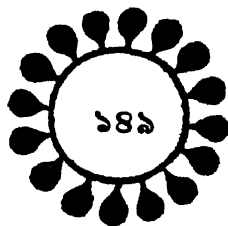
আমার অসুখ কেন হল বলতে পারো? জিগগেস করলেন ঠাকুর।

তার তিন কারণ।

প্রথম কারণ, পাপ গ্রহণ করে তাঁর শরীরে ব্যাধি। বললেন, 'গিরিশের পাপ। আহা, ও যে কষ্টভোগ করতে পারবে না।'

যদি জানতুম তরে যাবো তবে আরো কিছু পাপ করে নিতুম। বললে গিরিশ ঘোষ। 'ঠাকুরের কাছে সব শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেরা এসেছিল, আমিই এক মাত্র পাপী, একমাত্র দুরাচার। হেন পাপ নেই যা করিনি। তবু তিনি আমায় নিয়েছিলেন, পথের এক পাশে ফেলে দেননি। কোনোদিন কিছু নিষেধ করেননি আমায়। অহেতুক কৃপার কাছে আমার শুধু অবারিত প্রশ্রয়।'

কত লোক গিরিশের সম্পর্কে নালিশ করতে এসেছে ঠাকুরের কাছে। বলেছে কত বিরুদ্ধ কথা। ঠাকুর বললেন, 'না গো না, ওকে কিছু বলতে হবে না, ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে।'

তোমার কৃপার কাছে আবার পাপ কি! তোমার কৃপার অনলে অঙ্গার হয়ে যাবে সর্বপাপ।
'গিরিশের থাক আলাদা।' বললেন ঠাকুর, 'যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব। নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে আবার রামকেও লাভ করবে।'
'আগেকার দল ছেড়েছে গিরিশ।' বললে নরেন।
'তা ছাড়লে কি হয়? বাটিতে যদি এক বার রসুন গোলা হয় সে গন্ধ কি আর যায়? বাবুই গাছে কি আর আম ফলে?'
'কেন ফলবে না?' হুমকে উঠল নরেন।
'তা তেমন সিদ্ধাই থাকলে ফলতে পারে।' বললেন ঠাকুর। 'কিন্তু তেমন সিদ্ধাই কি সকলের হয়?'
আর কারু না হোক গিরিশের হবে। প্রজ্বলন্ত বিশ্বাসই গিরিশের একমাত্র সিদ্ধাই।
'কিন্তু যাই বলো গিরিশের খুব বিশ্বাস।' উজ্জ্বল চোখে ঠাকুর বললেন। 'সত্যি এমনটি আর কোথাও দেখেছিস?'
ঠাকুর একদিন কি উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন গিরিশকে। গিরিশ লাফিয়ে উঠল, 'আপনার কাছে এসেও আমাকে উপদেশ শুনতে হবে? উপদেশ তো আমিও অনেক দিতে পারি। অনেক লিখেওছি বইতে। কেন আপনার কাছে এসেছি, আপনি যদি আমায় কিছু করে দিতে পারেন তো তাই করুন। উপদেশ তুলে রাখুন কুলুঙ্গিতে।'
রামলালকে একটা শ্লোক আবৃত্তি করতে বললেন ঠাকুর। রামলাল আবৃত্তি করলে। তার মানে? তার মানে বিশ্বাসই হচ্ছে পদার্থ।
পার্বতী মহাদেবকে জিগগেস করলেন, 'ঈশ্বরলাভের খেই কোথায়?'
মহাদেব বললেন, 'বিশ্বাসই এর খেই।'
'তাই বলুন'। গিরিশ বললে উল্লসিত হয়ে, 'আপনার দেখা পেয়েছি এর পর আবার কি চাই? এখন বলুন, এত দিন যা করছি তাই এখনো করে যাব?'
'তাই করে যাও। তোমায় কিছুই ছাড়তে হবে না।'
যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, স্তব্ধীভূত অপ্রগল্ভ বিশ্বাস, তা হলেই পাপই করুক আর মহাপাতকই করুক কিছুতে ভয় নেই।
'বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞানও তত বাড়বে।' বললেন ঠাকুর। 'তাঁর নামে বিশ্বাস করলে তীর্থেরও প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণকিশোর বলত ওঁ রাম ওঁ কৃষ্ণ নাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়। বলত, বোলো না কাউকে, আমার সন্ধ্যাটন্ধ্যা ভালো লাগে না। ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পুজা-সন্ধ্যা সে কি চায়? সন্ধ্যা তাঁর সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়। ভক্তির যেমন তমঃ তেমনি বিশ্বাসের তমঃ আনো। রাম বলেছি কালী বলেছি আমার আবার বন্ধন আমার আবার কর্মফল। একশোবার যদি পাপী-পাপী বলো, পাপীই হয়ে যেতে হয়। আমি মা বলে ডেকেছি আমার আবার পাপ কি? ঈশ্বরের নামস্পর্শেই জিহ্বা পবিত্র হয়েছে, দেহ-মন পবিত্র হয়েছে।'
গিরিশের সেই বিশ্বাসের তমঃ।

'কিন্তু এত হৈ-চৈ গালাগাল মুখখারাপ করে কেন?' কৌতুকস্বরে জিগগেস করলেন ঠাকুর।
শুধু তোমার কৃপা আস্বাদন করার জন্যে। কর্দমের বদলেও কুঙ্কুম লাভ করা যায়, তা প্রমাণ করার জন্যে।
'মদ খেয়ে কত গালাগাল দিয়েছি, কত অপমান করেছি।' বলছে গিরিশ, 'কখনো যদি স্নেহভরে বলেছেন পা টিপে দিতে ভেবেছি এ কি আপদ! মানিনি ধরিনি গ্রাহ্য করিনি। তবু টেনে তুলে নিলেন, শুধু তাই নয়, নমস্কার করলেন।'
ঠাকুর বললেন, 'তবে কি এদের ঘৃণা করি? কখনো না, ব্রহ্মজ্ঞান আনি। তিনিই সব হয়েছেন, সকলেই নারায়ণ। সব যোনিই তখন মাতৃযোনি। তখন বেশ্যা আর সতী-লক্ষ্মীতে তফাত দেখি না।'
রাত্রে এসেছে গিরিশ। ঠাকুরের ঘুম নেই, বসে আছেন বিছানায়।
ওরে আলোটা আন। গিরিশকে একটিবার দেখি।
মাস্টার আলো এনে ধরল।
'ভালো আছ?' কণ্ঠে অপার স্নেহ ঢেলে জিগগেস করলেন গিরিশকে।
গিরিশ বুঝি খুব ক্লান্ত হয়ে এসেছে। কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে আসছে তার ঠিক কি! ব্যস্ত হয়ে বললেন লাটুকে, 'ওরে লেটো, এঁকে তামাক খাওয়া। পান এনে দে।'
লাটু ছুটল তামাকের যোগাড়ে। ওরে পান কই? সাজা পান নিয়ে আয়।
পান-তামাক দিল এনে গিরিশকে। শুধু এতে কি হবে? ঠাকুর আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ওরে জলখাবার এনে দে।
লাটু বললে, আনতে গেছে জলখাবার।
যার তার দোকান থেকে আনিসনি যেন। বরানগরে যেতে বল। ফাগুর দোকান থেকে যেন কচুরি নিয়ে আসে। কচুরি হচ্ছে রজোগুণের। তাই খাবে আজ গিরিশ।
শুধু কচুরি নয় লুচি-মিষ্টিও এসেছে ফাগুর দোকান থেকে। প্রকাণ্ড একটা থালায় সাজিয়ে সমস্ত খাবার প্রথম ধরল ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর তা প্রসাদ করে দিলেন। সমস্ত খাবার নিজের হাতে তুলে ধরলেন গিরিশের হাতে। গিরিশ খাচ্ছে আর ভাবছে, এ কী খাচ্ছি! ফাগুর দোকানের কচুরি না কি অপ্লব অমৃত-উদধি!
জল? জল দিতে হবে না গিরিশকে? বৈশাখের রাত, কী গরম পড়েছে কদিন থেকে। ঘরের কোণে জলের কুঁজো। দাঁড়াবার শক্তি নেই তবু উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর। নিজের হাতে জল গড়িয়ে দেবেন গিরিশকে। ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন, এবার পিপাসামোচন করবেন।
উঠে দাঁড়ালেন। দিগম্বর। একটি সকললোকসুন্দর বালক মূর্তি।
সকলে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।
নিজ হাতে জল গড়ালেন ঠাকুর। হাতে একটু ঢেলে দেখলেন যথেষ্ট ঠাণ্ডা কিনা। বোধহয় যথেষ্ট ঠাণ্ডা নয়। না হোক, এখন আর এর চেয়ে ভালো জল কোথায় মিলবে! নাও এই জলই নাও। নাও আমার হাত থেকে।

তোমার হাত থেকে যখন নিয়েছি তখন এ জল সর্বতাপশোষণ শীতলতা। হোক বা তা অশ্রুজল, যখন তোমার হাত থেকে নিয়েছি তখন এতেই অত্যন্তনিবৃত্তি শান্তি।
কী দেব তোমাকে এই জলের পরিবর্তে? শুধু অশ্রুজল—অশ্রুজল ছাড়া আমার কী আছে?
আকাশ বিগতাভ্র হল। পথ সমতল হল, কুশকণ্টকরহিত হল। উৎপথগামী হল বুঝি সৎপথগামী। তুমি একাধারে প্রণম্য ও প্রিয়। আমার প্রাণের প্রণাম নাও। নাও আমার গভীর প্রিয়সম্ভাষণ।
গিরিশ বললে, 'শুধু প্রণতিপরায়ণ হও। নিয়ত নমো-নমো করাই প্রকৃত যোগ-সাধন।'
কে একজন ভক্ত ক-গাছা ফুলের মালা এনে দিল ঠাকুরকে। একে-একে সবগুলি ঠাকুর গলায় পরলেন। এ কি আমি পরলাম? আমার হৃদয়মধ্যে যে হরি আছেন তাঁকে পরিয়ে দিলাম।
দু-গাছি মালা আবার তুলে নিলেন গলা থেকে। নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন গিরিশকে।
এ কি শুধু কৃপা? এ পুজোও। আমি যে তোমার মাঝে দেখলাম সেই ভৈরবকে। এক হাতে সুধা আরেক হাতে সুরা। এক হাতে বিষসর্প আরেক হাতে অভয় কবচ।
তুমিই সেই বিরূপাক্ষ, বিষমলোচন! নিরাভাস নিরাময়, নিঃসংশয় নিরঞ্জন। তোমার গঙ্গা তোমার গদ্যপদ্যময়ী বাণী, তোমার চৈতন্যলীলা বিল্বমঙ্গল।
খুব মদ খেয়ে এসেছে গিরিশ। কাঁদছে অঝোরধারে। ঠাকুরের পায়ের উপর মাথা ঢেলে দিয়ে কাঁদছে।
ঠাকুর তার পিঠের উপর হাত রাখলেন। গিরিশও মাথা তোলে না, ঠাকুরও হাত সরান না। এক দিকে সমস্ত ঢেলে দেওয়া, আরেক দিকে সমস্ত তুলে নেওয়া।
'ওরে একে তামাক খাওয়া।' ঠাকুর হাঁক দিয়ে বললেন এক ভক্তকে।
প্রত্যাখ্যান তো নয়ই, আপ্যায়ন। গিরিশ মাথা তুলল। হাত জোড় করে দাঁড়াল স্থির হয়ে। বললে, 'প্রভু, তুমিই পরব্রহ্ম। তুমিই চরাচর ও চিরন্তন। তুমিই ভুবনাকার বৃক্ষ, তুমিই এর মূল, তুমিই এর শাখা-পল্লব।'
ঠাকুর শুনেও শুনছেন না।
'তুমিই পরশুপাণি মহাদেব। রাজীবলোচন রাম। লোকপিতামহ ব্রহ্মা। পুণ্য-পরিপূর্ণ পাবনপুরুষ নারায়ণ।'
কথা কানেও তুলছেন না ঠাকুর। বলছেন হাঁক দিয়ে, 'ওরে, এর জন্যে তামাক আন।'
আবেশে গলার স্বর বিহ্বল হয়ে এল গিরিশের। 'বড় দুঃখ রইল মনে প্রাণ ভরে তোমার সেবা করতে পেলুম না। বর দাও ভগবান, এক বছর, শুধু একটি বছর তোমার সেবা করব। মুক্তিফুক্তি কিছু চাই না, শুধু সেবা, শুধু গুরুশুশ্রূষা'—
ঠাকুর তাকালেন চোখ তুলে। যেন জনান্তিকে বললেন, 'ওরে এখানকার লোক ভালো নয়। কেউ আবার কিছু বলবে। বর-টর চলে না এখানে।'

'ও সব কথা আমি শুনব না। বলো রাখবে কি না প্রার্থনা।' গিরিশ এগিয়ে এল দৃঢ় পায়ে। 'বলো। অন্তত আর এক বছর। সেবা করব, দেহ ঢেলে প্রাণ ঢেলে'—
'আচ্ছা, হবে' খন।' ঠাকুর পাশ কাটাতে চাইলেন। 'যখন তোর বাড়িতে যাব তখন করিস।'
'না, আমার বাড়িতে নয়। এইখানে। তুমি যেখানে বসছ-শুচ্ছ সেইখানে। আমার বাড়ি কী আবার একটা জায়গা?'
অনমনীয় জিদ গিরিশের। কারুণ্যবশংবদ ঠাকুর হার মানলেন। বললেন, 'আচ্ছা, তাই। কিন্তু সব ঈশ্বরের ইচ্ছা।'
আরো এক পা এগিয়ে এল মাতাল। বললে, 'তোমার অসুখ আমি ভালো করে দেব।'
'সে কি রে, তুই ভালো করে দিবি?'
'হ্যাঁ, আমার কাছে ওষুধ আছে।'
'ওষুধ?'
'হ্যাঁ, মন্ত্র। তোমাকে শুধু মুখে একবার উচ্চারণ করতে হবে। তা হলেই ব্যাধি-মুক্তি।'
ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে আবার কি মন্ত্র?'
'শুধু মুখে একবার বলবে, আমার এই অসুখ আরাম হয়ে যাক। ব্যস, তাহলেই হল।' গিরিশ লাফিয়ে উঠল, 'তাহলেই উড়ে যাবে এক ফুঁয়ে।'
'ও আমি পারব না।'
'পারতেই হবে। বেশ, না পারো তো, আমিই ঝেড়ে দেব। আমি জানি কি করে ঝাড়তে হয় রোগের ভূত। কালী, কালী, মহাকালী।' বলে ঠাকুরের গা-সই করে শুন্যের উপর দিয়ে হাত চালাল গিরিশ। তার পর কটা ফুঁ দিল। 'ফুঁ! ফুঁ।'
'ওরে এতে আমার লাগবে।' ঠাকুর সঙ্কুচিত হলেন।
লাগুক গে। তুমি ভালো হয়ে গেলে আর লাগবে না। আপনমনে হাত চালাতে-চালাতে বলতে লাগল গিরিশ, 'যা যা, ভালো হয়ে যা। ভালো হয়ে যা। যদি ও-পায়ে আমার কিছু ভক্তি থাকে, তবে ভালো হয়ে যা। বলো, গেছে, ভালো হয়ে গেছে।'
এ এক আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে! ঠাকুর বিরক্ত হলেন। বললেন, 'যা বাপু, ওসব আমি বলতে পারি না।'
'কাকে বলতে পারো না?'
'মাকে।'
'মা আবার কে। তুমিই মা। তুমিই সব। আমার যদি ও-পায়ে কিছু ভক্তি থাকে, বলো, আছে কিনা ভক্তি, তাহলে বলতেই হবে তোমাকে—'
'আচ্ছা, যা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।'
'বলো, তোমার ইচ্ছায়।'
'ছিঃ, ও কথা বলতে নেই।' কুণ্ঠিত হলেন ঠাকুর। 'আমি ঈশ্বরের আজ্ঞায় চলেছি। আমি সেই মহান প্রভুর দাস, সেই মহান গুরুর সেবক।'

'কেন অত কথা বাড়াও?' গিরিশ অস্থির হয়ে উঠল। 'ছোট্ট সোজা কথা সেটুকু বলে ফেললেই তো চুকে যায়। তুমি কি বা কে, সে কথা পরে হবে'খন। এখন শুধু বলো, ভালো হয়ে যাবে। ভালো হয়ে যাবে।'
কি একগুঁয়ে নাছোড়বান্দার হাতেই পড়েছি! শেষ পর্যন্ত হার মানলেন ঠাকুর। বললেন, 'আচ্ছা, যা। যা হয়েছে তা যাবে।'
যা বললেই কি যাওয়া যায়?
কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। গাড়োয়ান ডাকাডাকি করছে।
বড় বেআক্কেল তো এই গাড়োয়ান! গিরিশ উঠে দাঁড়াল। রোক করে চলল বাইরে, গাড়োয়ানকে শায়েস্তা করতে।
কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরে এল। করজোড়ে বললে, 'আমায় ভুলো না।'
ওদিকে গাড়োয়ানও ভুলছে না। আবার শুরু করেছে হাঁকডাক।
বেগে বেরিয়ে গেল গিরিশ।
ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে মাস্টারকে বললেন, 'দেখ, দেখ, কোথায় যায়! গাড়োয়ানকে মারধোর করে না যেন।' মাস্টার গেল সঙ্গে-সঙ্গে।
এই গিরিশকেই গেরুয়া-রুদ্রাক্ষ দিলেন ঠাকুর।
বুড়ো গোপালের শখ হয়েছে সাধুদের গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালা দেয়। সাধু কোথায়? গঙ্গাসাগরে যাবার জন্য দেশ-বিদেশের বহু সাধু জমায়েত হয়েছে কলকাতায়, তাদের থেকেই বাছাই করব। বিশ্রুত-বিখ্যাত সাধু।
ঠাকুর শুনে খুব খুশি হলেন। কিন্তু বলিহারি তোকে গোপাল, তুই সাধু খুঁজতে গঙ্গাসাগর গেলি?
গোপাল ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।
'ভুললি জটা দেখে, দাড়ি দেখে, ত্রিশূল-চিমটে দেখে? চোখের সামনে জ্বলছে যে দ্বাদশ আদিত্য তা তোর চোখে পড়ল না? সেই যে কথায় বলে না, ঘরের কাঠ উইয়ে খায়, কাঠ কুড়োতে বনে যায়—তোর দেখি সেই দশা।'
দ্বাদশ আদিত্য!
'হ্যাঁ, আমার ভক্ত ছোকরার দল। তোর ও-সব বাজারে সাধুর চাইতে ঢের-ঢের খাঁটি। যা বারোখানা গেরুয়া কাপড় আর বারোটা রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে আয়। আমিই বিতরণ করে যাই। অভিষেক করে যাই আমার রাজকুমারদের।'
তথাস্তু। বুড়ো গোপাল কিনে নিয়ে এল বস্ত্র-মাল্য।
হিসেবে তো মোটে এগারোজন হয়। নরেন রাখাল তারক বাবুরাম শরৎ যোগীন নিরঞ্জন কালী হরি লাটু আর বুড়ো গোপাল নিজে। বারো নম্বরের কোন জন?
এক-এক করে এগারোজনকে বিতরণ করা হল। আরেকজন?
সেই আরেকজনই গিরিশ।
গিরিশ? সে গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের অধিকারী?
'হ্যাঁ, এই কাপড় আর মালা তুলে রাখো তার জন্যে। সে এলে তাকে দিয়ো।' বললেন ঠাকুর, 'কিংবা কেউ গিয়ে দিয়ে এস তার বাড়িতে।'

সবাই অবাক। সে তো মশাই পাপী, অপবিত্র।
তার জ্বলন্তপাবক বিশ্বাস। প্রচণ্ডতরঙ্গ ভক্তি। সেই বিশ্বাস-ভক্তিই তার পবিত্রতা। তার দেহে-মনে জাগ্রত আনন্দ। এই আনন্দেই তার পাপক্ষয়।
গিরিশ বললে, 'ভগবান, আমাকে পবিত্রতা দাও।'
'তুমি পবিত্র তো আছ।' ঠাকুর বললেন দৃঢ়স্বরে, 'তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি। তোমার যে আনন্দ-নিবাস।'
অভেদদর্শনই জ্ঞান, মনের বিষয়শূন্যতাই ধ্যান, মনের অশুদ্ধিত্যাগই স্নান আর ইন্দ্রিয়সংযমই শৌচ।
কিন্তু গিরিশ যে ঘোরতর গৃহী। ও তো গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হবে না, মান রাখবে না রুদ্রাক্ষের।
গৃহই তো ঈশ্বরসাধনার নবতম পীঠস্থান। আর বৈরাগ্য তো মনে। আর মনোমালাই তো জপমালা।
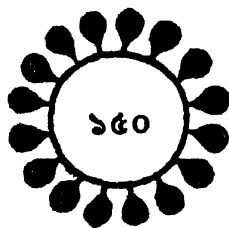
ঠাকুরের ব্যাধির দ্বিতীয় কারণ, ভক্তসেবকদের তাঁর চার পাশে একত্র করা, একসূত্রে গেঁথে নেওয়া, এক সঙ্ঘে সংহত করা।
সূত্রটি কি? সূত্রটি সেবা।
সঙ্ঘটি কিসের? ভগবানের কাজে আত্মোৎসর্গের।
'ওরে আমাদের সেবা নেবেন, তাই তিনি এমন অসুখ করেছেন।' বললে নরেন। 'আর কিছু নয়, শুধু সেবা লাগিয়ে দে। সেবাই আমাদের পুজো, সেবাই আমাদের উপাসনা।'
এই কষ্টের মধ্য থেকে আনন্দের মধ্য থেকে চরমতম দীক্ষা নে। এখন ভগবানের সেবা করছিস, পরে জগজ্জনের সেবা করবি। জগজ্জনের সেবাই ভগবানের সেবা!
'আপনাদের সব সময়েই তো তাঁর সেবা করতেই দেখি, উপাসনা করেন কখন?' কৌতূহলী কে একজন জিগগেস করলে।
উত্তর দিলে লাটু। যে বলে, 'হামনে ঠাকুরের মেথর আছে।' বললে, 'তাই আমাদের আবার উপাসনা কি? তাঁর যে সেবা করতে পারছি এই আমাদের উপাসনা।'
উপাসনা কাকে বলে? অমুক দিকে মুখ করে অমনি ভাবে বসো, চোখ বোজো, অমনি

করে নিশ্বাস ফেল, অতগুলো মন্তর বলো—এই কি উপাসনা? ঠাকুর বলেছেন, উপাসনার সময় ভাববে তিনি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, তুমি তাঁকে নাওয়াচ্ছ খাওয়াচ্ছ, সাজাচ্ছ-গোছাচ্ছ, হৃদয়ে এনে বসাচ্ছ, করছ কত সুখ-দুঃখের আলাপন। আমরা যে এই প্রত্যক্ষভূতকে সেবা করছি এই আমাদের উপাসনা।

যোগীনের অসুখ করেছে।

'আমি আগেই জানি। আমার সেবার ত্রুটি হবে বলে নিজের শরীরের যত্ন নিত না এতটুকু। ওরে তা কি হয়?' ঠাকুরের স্বরে করুণার সঙ্গে কাতরতা ফুটে উঠল। 'তোদের শরীর যদি ভেঙে পড়ে আমার তবে যত্ন করবে কে? কথা শোন বাপু, ঠিক সময়ে সব খাওয়া দাওয়া কর, ঘুমুতে যা।'

শশী বসে-বসে পাখার হাওয়া করছে। বেলা প্রায় গড়িয়ে যায়, তবু ওঠবার নাম নেই।

তার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিলেন ঠাকুর। বললেন, 'ওগো যাও, নেয়ে-খেয়ে নাও। আমি এখন দিব্যি ভালো আছি। খেয়ে-দেয়ে না হয় আবার বোসো।'

ওরে গোপাল কোথায়, বুড়ো গোপাল? আমার যে এখন ওষুধ খাবার সময়। আর সেই যে আমাকে ওষুধ খাওয়ায়।

বুড়ো গোপাল ঘুমুচ্ছে। কে এসে বললে ঠাকুরকে।

'আহা ঘুমোক।' চিদঘনলীলাবিগ্রহ ঠাকুর আনন্দ করে উঠলেন : 'কত রাত জেগেছে, কত কষ্ট করছে আমার জন্যে। ওকে তোমরা জাগিও না, ঘুমুতে দাও চোখ ভরে!'

ঠাকুরের সেই আমলকী খাবার সাধ হল, বেরিয়ে পড়ল দুর্গাচরণ। স্বর্গ-মর্ত মন্থন করে তিনদিন পরে সে আমলকী নিয়ে এল। এই তিনদিন তার নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। কোথায় আমলকী! কিন্তু ঠাকুর যখন খেতে চেয়েছেন তখন নিশ্চয়ই অকাল-ফলোদয় হবে।

হলও তাই। কোত্থেকে কে জানে টাটকা আমলকী নিয়ে এল দুর্গাচরণ।

তার রুক্ষ-শ্রান্ত চেহারা দেখে মমতায় উথলে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'আগে স্নান করো, কিছু খেয়ে নাও।'

ভাতের থালা সামনে, বসে আছে চুপ করে। 'কি, খাচ্ছেন না কেন?'

'আজ একাদশী।'

তিনদিন অভুক্ত, তারপর আজ আবার উপবাস! কিন্তু দুর্গাচরণকে টলায় এমন কার সাধ্য নেই।

ঠাকুর বললেন, 'ওরে কেউ গিয়ে ভাতের পাতাটা এখানে নিয়ে আয়।'

শশী নিয়ে এল ভাতের থালা। ঠাকুর তার থেকে এক কণা তুলে মুখে দিলেন। আর যায় কোথা! হোকগে একাদশী, কিন্তু যখন অন্ন প্রসাদ হয়ে গেছে তখন আর ভাবনা কি। নিয়ে এস।

শুধু ভাত-ডাল নয়, পাতাশুদ্ধ খেয়ে ফেলল দুর্গাচরণ।

ঠাকুর তাকে বলে দিলেন, 'তুমি গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় পেলে গৃহীরা ঠিক-ঠিক বুঝবে গৃহস্থের ধর্ম কি।'

আহা, কি সুন্দর গৃহই দিয়েছে প্রভু! চারখানা ঘর, তার মধ্যে তিনখানারই ছাদ ফুটো। সেবার অঢেল বর্ষা নেমেছে, যে ঘরখানা নিটুট সে ঘরেই সস্ত্রীক থাকে দুর্গাচরণ। হঠাৎ দুজন অতিথি এসে উপস্থিত। খাওয়ানো না হয় হল কিন্তু রাত্রে শুতে দিই কোথায়? এদিকে যে অবিচ্ছেদ বৃষ্টি।

স্ত্রী একবার তাকাল স্বামীর দিকে।

দুর্গাচরণ বললে, 'যে ঘরখানা আমাদের তাই ওদেরকে ছেড়ে দেব। আজ তো আমাদের মহা ভাগ্য। অতিথি-নারায়ণের সেবায় আমাদের ঘুম ও আরাম উৎসর্গ করতে পারছি।'

অতিথিদের ভালো ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে দুর্গাচরণ আর তার স্ত্রী ভাঙাঘরে গিয়ে বসল। চতুর্দিক দিয়ে জল পড়ছে। কোথাও এতটুক শুকনো নেই, কোণটুকুও নয়। সেই জলকে মাথা পেতে নিয়ে দুজনে বসল পাশাপাশি। ভয় কি। মুক্ত কণ্ঠে শুরু করে দিল শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম।

সেই নামই তো আনন্দাম্বুধিবর্ধন। সেই নামের কাছে দান ব্রত তপ তীর্থ কিছু নয়। সেই নামই সংসার-ব্যাধিভেষজ, সেই প্রাণপ্রয়াণ-পাথেয়।

হে ভগবান, নামব্যাপারে আমাকে কৃপণ করো। কৃপণ যেমন নানা জায়গা থেকে ধন সংগ্রহ করে, ধনের মনোহারিতা ও বহুমূল্যতা বিচার করে আর সর্বক্ষণ ধনের রক্ষণ বিষয়ে চিন্তা করে, তেমনি তোমার নাম আমার সঞ্চয়ের, বিচারের ও চিন্তনের বিষয়ীভূত করো। হে ভুবনমঙ্গল, দিব্যনামধেয়, তোমার নামামৃতসিন্ধুর লহরী-কল্লোলে নিত্য আমাকে নিমজ্জিত করো, আমি যেন গলদশ্রুনেত্র ও অবশ হয়ে থাকি। হে বৈদগ্ধিসারসর্বস্ব মূর্ত লীলেশ্বর, আমার রসনায় তোমার বাসা হোক।

দুর্গাচরণের স্ত্রী ঘর ছাওয়াবার জন্যে ঘরামি লাগিয়েছে।

দুর্গাচরণ বাড়ি এসে দেখল চালের উপর ঘরামি। অমনি হায়-হায় করে উঠল। ওরে, নেমে আয় শিগগির, নেমে আয়। আমি যে এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না।

কি দৃশ্য?

'আমার সুখের জন্যে অন্য লোকে খাটবে, এ যে আমার কাছে অসহ্য! এ আমাকে ঠাকুর কী গৃহস্থাশ্রমে থাকতে বললেন!' দুর্গাচরণ রোল তুলে কাঁদতে লাগল। 'ওরে নেমে আয়, যদি পারি নিজে ঘর ছাইব, নইলে ভিজব বসে বৃষ্টিতে। আমার জন্যে তুই খাটতে যাবি কেন?'

ঘরামি তো হতভম্ব।

কপালে করাঘাত করতে লাগল দুর্গাচরণ। ওরে নেমে আয়। নেমে আয় বলছি।

কি আর করে, নেমে এল ঘরামি। পাখা নিয়ে দুর্গাচরণ তাকে হাওয়া করতে লাগল। নিজে বসে তাকে তামাক সেজে দিল। চুকিয়ে দিল সমস্ত দিনের মজুরি।

পেটে শূলব্যথা, ঘরে পড়ে আছে দুর্গাচরণ, অতিথি এসে হাজির। দু-একজন নয়, আট-দশজন। বাজারে বেরোতে হয়, নইলে অতিথিসৎকার হয় কি করে? ব্যথা নিয়েই বেরিয়ে পড়ল। আট-দশজনের বাজার, তা ছাড়া ঘরে চাল নেই, চাল কিনতে হল, সব মিলে প্রকাণ্ড একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াল। একটা মুটে ডাকলেই তো হয়। সর্বনাশ!

নিজের বোঝা অন্যকে দিয়ে বওয়াব? কখনো না। মুটে না ডেকে নিজেই সে মোট মাথায় তুলল দুর্গাচরণ। কিন্তু কত দূর যাবে? পেটে নিদারুণ যন্ত্রণা। পড়ে গেল চলতে-চলতে। পড়ে-পড়ে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, 'খুব তো সংসারাশ্রম করতে বলে গেছ। কিন্তু অতিথি-নারায়ণের সেবা করতে দিচ্ছ কই?'

ব্যথার উপশম হলে মোট মাথায় নিয়ে ফের চলতে লাগল দুর্গাচরণ। বাড়ি পৌঁছে আবার কান্না : 'আপনাদের কাছে অপরাধী হয়ে রইলাম। কত দেরি হয়ে গেল আপনাদের সেবা করতে।'

'যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে সেই বীরভক্ত। যে সংসার ত্যাগ করেছে, সে ঈশ্বরকে ডাকবে তার মধ্যে বাহাদুরি কি!' বললেন ঠাকুর। 'যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে সেই বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখে গহ্বরে কি আছে। সেই-ই বাহাদুর, সেই-ই বীরপুরুষ।'

সংসারী লোকের এই বেলা বিশ্বাস তো ঐ বেলা সংশয়। এই বেলা আশা তো ঐ বেলা নৈষ্ফল্য। এই বেলা স্বীকার তো ঐ বেলা প্রত্যাখ্যান। অস্তি-নাস্তির মধ্যে দুলছে অহরহ। কত দুঃখে ক্লান্ত, কত অপমানে বিশীর্ণ, কত অবিশ্বাসে কলুষিত। কত তার বাধার কণ্টক-ক্লেশ কত তার বুদ্ধির বৈগুণ্য। পিছনে সর্বসময়ে তার অপ্রতিবিধেয় নিয়তি। তন্তুবন্ধ শকুনির ন্যায় সে পরাধীন। তবু তারি মধ্যে বিনির্মল মুহূর্ত খুঁজে বসছে প্রশান্ত হয়ে, নিজের হৃদয়ের গভীরে ডুবে গিয়ে খুঁজছে সেই হৃদয়নিহিতকে। এত বাধাতেও যে হটে না, এত জ্বরেও যে জ্বলে না, সে বীর নয় তো আর বীর কে?

'সংসারচারিণী সেই পতিব্রতার গল্প জানো না?'

এক তপস্বী গিয়েছিল এক পতিব্রতার বাড়িতে ভিক্ষে করতে। গিয়েছিল অসময়ে। পতিব্রতার স্বামী তখন ঘরে ফিরেছে, পতিব্রতা তার সেবায় ব্যস্ত। আগে জল দিয়ে নিজের হাতে পা ধুয়ে দেবে, মাথার চুল দিয়ে পুঁছে দেবে, তারপর খেতে দেবে, খাওয়ার সময় পাশে বসে হাওয়া করবে। একটু দাঁড়াতে হবে তপস্বীমশাই। তপস্বী তো রেগে টং। এতদূর স্পর্ধা, এক ডাকে ভিক্ষে দিচ্ছে না? আমি একবার রোষ-দৃষ্টিতে তাকালে কাক-বক ভস্ম হয়ে যায়, একি জানে না ঐ গৃহস্থ-স্ত্রী? চেঁচিয়ে হাঁক দিল তপস্বী, দেরি কোরো না বলছি, শিগগির ভিক্ষে দাও, নইলে এমন চোখে তাকাব ভস্ম হয়ে যাবে। পতিব্রতা হাসল, বললে, আমাকে তোমার কাকী-বকী পাওনি, আমি পতিব্রতা। আমার আগে পতি, পরে অতিথি। আমি সংসারব্রতিনী। তপস্বী রোষপরুষ চোখে তাকাল। কিচ্ছু হল না।

বলরাম বোস দুর্গাচরণকে বললে, পুরী চলো। তোমার যা খরচ লাগে আমি দেব। দুর্গাচরণ বললে, 'ঠাকুর বলে গেছেন ঘরে থাকতে। তাঁর কথা এক চুল লঙ্ঘন করি আমার সে সাধ্য নেই। ঘরে থাকা মানেই তাঁকে ধরে থাকা।'

স্বয়ং বিবেকানন্দ বলে পাঠালেন : 'আপনি মঠে এসে থাকুন।'

সেখানেও দুর্গাচরণের সেই এক উত্তর : 'ঠাকুর যে আমাকে ঘরে থাকতেই বলে গেছেন। তাঁর আজ্ঞার লঙ্ঘন করি কি করে?'

শীতবস্ত্র নেই, গিরিশ ঘোষ একখানা কম্বল পাঠিয়ে দিয়েছে দুর্গাচরণকে। দেবেন মজুমদার স্বয়ং বয়ে এনে দিয়ে গিয়েছে। নিয়েছে দুর্গাচরণ। গিরিশ ঘোষ জানত পরের থেকে কোনো জিনিসই সে গ্রহণ করে না, তাই এই জিজ্ঞাসা। নিয়েছে, মাথায় করে নিয়েছে। শুনে আশ্বস্ত হল গিরিশ।

কিন্তু ঐ মাথায় করে নেওয়াই। কদিন পর গিরিশের কানে এল, কম্বল দুর্গাচরণ গায়ে দেয়নি, সেই মাথায় করেই রেখেছে। খোঁজ নিতে পাঠাল দেবেনকে। তুমি একবার গিয়ে দেখে এস তো।

দেবেন মজুমদার দেখে এল। কি দেখে এলে? দেখে এলুম কম্বল মাথায় করে বসে আছেন নাগমশাই।

জেলে মাছ বেচতে এসেছে। কই, মাগুর, সিঙিগ। কাছেই এই পুকুরের মাছ মশাই, জ্যান্ত, দেখুন লাফাচ্ছে চুপড়িতে। লাফাচ্ছে না ছটফট করছে? সমস্ত মাছগুলি কিনল দুর্গাচরণ। আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে মাছগুলি পুকুরে ছেড়ে দিয়ে এল। জেলে তো থ! দাম আর চুপড়ি যেই ফিরে পেল অমনি ছুট দিল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

ভাত-ডালের পিণ্ড হাতে নিয়ে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াল দুর্গাচরণ। পোষা কটি মাছ আছে তাদের নাম ধরে ডাকে। জলের কোন গভীর স্তর থেকে উঠে আসে মাছগুলি। জলের মধ্যে খাবার ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারে না, দুর্গাচরণ জলের ধারেই বসে পড়ে, জলে হাত ডুবিয়ে রাখে, হাতের থেকেই মাছগুলি খাবার তুলে নেয়।

উঠোনে বসে তামাক খাচ্ছে দুর্গাচরণ, দুটো বুনো শালিক উড়ে এসে বসেছে তার পাশটিতে। প্রথমটা খেয়াল করেনি, পাখি দুটো শেষে তার পা ঠোকরাতে লাগল। এসেছিস মা? তাদের গায়ে দুর্গাচরণ হাত বুলুতে লাগল। দাঁড়া, তোদের খাবার দি, জল দি। চাল নিয়ে এসে হাতে করে খাওয়াতে লাগল তাদের, বাটি করে জল দিল। খেয়েছিস, পেট ভরেছে? এবার যা, বনে গিয়ে খেলা কর। কাল আবার আসিস। পা ঠুকরে তন্দ্রা ভাঙাস।

এই যে তোদের খেলা আমার সঙেগ এই তো আমার ঠাকুরের খেলা।

একটা গোখরো সাপ বেরিয়েছে উঠোনে। মারো, মারো, সবাই ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠল। শুধু দুর্গাচরণ নির্বিচল। বললে, 'বনের সাপে খায় না মনের সাপে খায়। যদি ওর অনিষ্ট ইচ্ছা না করো ও-ও করবে না কিছু অনিষ্ট। যেমন ব্যবহার তেমন ব্যবহার। যেমন দেবে তেমনি পাবে।'

নাগরাজ! নাগরাজ! সাপকে ডাকতে লাগল দুর্গাচরণ।

'আসুন আমার সঙেগ। জঙগলে থাকেন, কেন এই ক্ষুদ্র মানুষের ঘরে পদার্পণ করেছেন? এখানে কে বোঝে আপনার মর্যাদা?'

তুড়ি দিতে-দিতে দুর্গাচরণ চলতে লাগল আগে-আগে আর বিষধর সাপ তার অনুগমন করতে লাগল নতশিরে। গৃহাঙগন ছেড়ে চলে গেল জঙগলে।

নিজেও মাঝে-মাঝে ফণাধারী ভুজঙগ সেজেছে।

দুর্গাচরণের কাছে কে একজন ঠাকুরকে নিন্দে করছে। দুর্গাচরণ প্রথমে তাকে বিনয় করে বললে, থামুন, ও সব মিথ্যে কথা।

নিন্দুকের রসনা আরো লেলিহান হয়ে উঠল। মিথ্যে কথা? আরো সে কুৎসাবর্ষণ করতে লাগল।
'এ বাড়িতে বসে এ সব নিন্দাবাদ করতে পারবেন না বলছি। এই কানে শুনতে পাব না গুরুনিন্দা।' দুর্গাচরণ হুমকে উঠল।
গালাগালেরও একটা নেশা আছে। তাই তখন পেয়ে বসেছে লোকটাকে। সে নিরস্ত হল না।
'বেরোও, বেরোও, তুমি এখান থেকে। নইলে মহা বিভ্রাট হবে বলে দিচ্ছি।'
কে কার কথা শোনে! লোকটার মাথায় তখন ভূত চেপে বসেছে। গলার সুর সে শেষ পর্দায় তুললে। 'তবে রে—' সেই লোকটার পায়ের জুতো কেড়ে নিয়ে লোকটাকে পিটতে লাগল দুর্গাচরণ। 'বেরোও, বেরোও এখান থেকে।'
চলে যেতে-যেতে লোকটা বললে, 'আচ্ছা দেখে নেব তুমি কেমনতরো সাধু। পাবে এর প্রতিফল।'
দুর্গাচরণ ঘন-ঘন ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে লাগল। ঠাকুর, কেন, কেন তুমি আমাকে গৃহস্থ হতে বললে? তারই জন্যে তো এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা। শুনতে হয় তোমার নিন্দা, করতে হয় তার প্রতিকার। তারপর আবার প্রতীক্ষা করতে হয় দোর্দণ্ড প্রতিফল।
মুহূর্তে কি ভোজবাজি হয়ে গেল নাকি? সেই লোকটা দেখি ফিরে আসছে। লাঠি-সোটা নিয়ে নয় দুটি হাত জোড় করে। দুর্গাচরণের কাছে বসে দীন বচনে বললে, আমাকে ক্ষমা করুন।
জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! আনন্দে লাফিয়ে উঠল দুর্গাচরণ। আরে বসুন-বসুন উঠছেন কেন? গ্রামের এত বড় একজন আপনি গণ্যমান্য লোক, অমনি-অমনি কি ফিরে যেতে আছে? তামাক খেয়ে যান। দুর্গাচরণ তামাক সাজতে বসল।
পাটের কলের দুটো সাহেব পাখি মারতে এসেছে দেওভোগে দুর্গাচরণের গ্রামে। দুর্গাচরণ ছুটে গিয়ে তাদের অনুরোধ করলে, মারবেন না পাখি।
একটা রুক্ষশুষ্ক পাগলের মত দেখতে। এর কথা কে কবে গ্রাহ্য করে! সাহেব পাখির দিকে তাক করল বন্দুক।
খপ করে বন্দুক ধরে ফেলল দুর্গাচরণ। কি স্পর্ধা, সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বন্দুকের গুলি পাখির নয় তোমারই হৃদয় ভেদ করবে দেখ। কিন্তু সাধ্য কি দুর্গাচরণের মুঠোর থেকে ছিনিয়ে নেয় বন্দুক। রোগা লিকলিকে শরীরে এখন শত সিংহের শক্তি। ধস্তাধস্তিতে সাহেব তাকে কিছুতেই টলাতে পারছে না। আরেকজন সাহেব এল তার সাহায্যে। তবুও নয়। দুর্গাচরণ বন্দুক কেড়ে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে। বাড়ি এসে জলে হাত ধুয়ে ফেলল দুর্গাচরণ। কি ভীষণ প্রাণঘাতী অস্ত্র স্পর্শ করেছি।
ঠাকুরের মাথায় হাত বুলুচ্ছে লাটু। কি আশ্চর্য, হাত বুলুতে-বুলুতে ঘুমিয়ে পড়েছে! শশী কাছাকাছি ছিল, এসে দেখল, ঠাকুর চোখ চেয়ে আছেন, আর তাঁর মাথায় নিশ্চল হাত রেখে দিব্যি ঘুম মারছে লাটু।

লাটু, লাটু, ডাকতে লাগল শশী। এত সজাগ ঘুম লাটুর, তবু সাড়া দেবার নাম নেই। গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিল তবু ওঠে না।
'ওকে বিরক্ত করিসনি।' স্নেহমধুর স্বরে ঠাকুর বললেন, 'ও কি এখন আর এ জগতে আছে! চলে গিয়েছে সমাধির দেশ দেখতে।'
শশী তখন এক পাশে বসে ঠাকুরের মাথায় হাত বুলুতে লাগল।
মাদ্রাজ মঠের ছাদ ফেটে বৃষ্টির জল পড়ছে মেঝেতে। ঠাকুরঘরেও পড়ছে নাকি? শশী বারে-বারে উঠে-উঠে গিয়ে দেখে আসছে। হ্যাঁ, এখন দেখছি ঠাকুরঘরেও পড়ছে। ঠিক যেখানটাতে ঠাকুরের ছবি, সেইখানে। কি হবে?
একটা ছাতা খুলে ঠাকুরের মাথার উপর ধরল শশী। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। ধরে দাঁড়িয়ে রইল এক ঠায়ে। সমস্ত রাত ধরে বৃষ্টি। সমস্ত রাত ধরে দাঁড়িয়ে।
সবাই বললে, শুকনো জায়গায় ফোটোটি সরিয়ে দিলেই তো হয়।
কি সর্বনাশ, নাড়াচাড়া করতে গেলে ঠাকুরের ঘুম ভেঙে যাবে যে।
সেদিন গ্রীষ্মের দুপুরে কি অসহ্য গরম। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করতে বসেছে শশী, সাধ্য কি একটু তন্দ্রার স্পর্শ পায়! আহা ঠাকুরের না জানি কী অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। মনে হওয়া মাত্রই উঠে পড়ল শশী, ছুট দিল ঠাকুরঘরে। হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। প্রভু আমার প্রিয় আমার পরমধন হে। চির-পথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।
নিজের ফোটো নিজে সেদিন দেখছেন ঠাকুর। বললেন, 'এ যে দেখছি এক মহাযোগীর মূর্তি। ওরে ফুল নিয়ে আয়, একে আমি পুজো করব।'
ভবনাথ ফুল নিয়ে এল। নিজের ফোটো নিজেই ঠাকুর পুজো করলেন।
শ্রীশ্রীমাকে বললেন, 'দেখ, ঘরে-ঘরে এর একদিন নিত্যপুজো হবে।'
শুধু ঘরে-ঘরে? হৃদয়ে-হৃদয়ে।
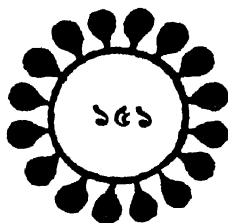
যিনি মহাকাশে মহাতপস্বী মহাকাল তাঁকে মনের ইয়ত্তার মধ্যে মনন করা যায় কই?
'আমার অবস্থা তবে তুমি কি মনে করো?' ডাক্তার সরকারকে জিগগেস করলেন ঠাকুর : 'ঢং?'

মৃদু হাসল ডাক্তার। বললে, 'ঢং মনে করলে কি এত আসি? ছ-সাত ঘণ্টা ধরে বসে থাকি? কিন্তু তাই বলে মনে করো না অমুককে তোমাকে মেনেছে বলে আমিও তোমাকে মানব।'
'আমি কি তোমাকে মানতে বলছি?'
'তবে কি বলছ?'
'সব ঈশ্বরের ইচ্ছা।'
'সব?'
'সমস্ত। ঘাসের ডগাটিও নড়ে না ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া। অর্জুন তো কত বললে, কিছুতেই যুদ্ধ করব না, জ্ঞাতিহত্যা করা আমার কর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন, বললেন, তুমি কি আর করবে, তোমার স্বভাবে করাবে।*এই দেখ আমি আগের থেকেই সবাইকে মেরে রেখেছি। তুমি নিমিত্ত মাত্র।'
'সব যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা তবে তুমি বকো কেন? কি দরকার কথা কয়ে?' ডাক্তার তীক্ষ্ন কটাক্ষ করল।
'বলাচ্ছেন তাই বলি,' প্রশান্ত মুখে বললেন ঠাকুর। 'তিনি যন্ত্রী আর আমি তাঁর যন্ত্র।'
তিনি লেখক আর আমি তাঁর লেখনী। তিনি শিল্পী আর আমি তাঁর তুলিকা।
'চুপ করে থাকলেই পারো।' ডাক্তার আবার ফোড়ন দিল। 'কেন আর তবে পরমহংস-গিরি করছ? আর এরাই বা তোমার সেবা করে মরছে কেন? আর কেনই বা বলছ অসুখটি সারিয়ে দাও ডাক্তার।'
কি আর করি বলো। সব তাঁর ইচ্ছাতেই করা। যতক্ষণ এই দেহ রয়েছে এই আমি-ঘট রয়েছে ততক্ষণ হবেই এই আর্তনাদ।
'মনে করো মহাসমুদ্র।' বললেন ঠাকুর, 'তার মধ্যে রয়েছে একটি ঘট। আত্মার সমুদ্রের মধ্যে অহংএর ঘট। সে ঘটের ভিতরেও জল বাইরেও জল। কিন্তু বাইরের জলের সঙ্গে ভিতরের জলের একাকার হতে হলে ঘটটি ভেঙে ফেলা চাই। যাঁর মহাসমুদ্র তাঁরই আবার এই ঘট। তিনিই এই আমি-ঘটটি রেখে দিয়েছেন সমুদ্রের মধ্যে। তিনি এই পোড়া-মাটির দেয়ালটুকু ভেঙে না দিলে কিছুতেই জলে জলময় হওয়া যাবে না।'
ডাক্তার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'তবে কি বলতে চাও এই যে লক্ষ-কোটি "আমি" এ সব শুধু ঈশ্বরের চালাকি? তিনি কি চালাকি করছেন আমাদের সঙ্গে?'
গিরিশ কাছেই ছিল, সেও খাপ্পা হয়ে উঠল। বললে, 'আপনি কি করে জানলেন যে করছেন না চালাকি?'
ঠাকুর বললেন, 'যেমন করেই বলো না কেন সব তাঁর লীলা। এই খেলার মেলা বসবার জন্যেই এতগুলো আমির খেলোয়াড়। বলতে চাও তো বলো একটা ভোজ-বাজি। সেই রাজার সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছিল। একটু দূরে সরে গিয়ে জিগগেস করলে, কি দেখছ বলো তো? একটা ঘোড়ার উপর সওয়ার দেখছি। সওয়ার কেমন দেখতে? খুব সাজগোজ, খুব জেল্লাজমক, হাতে রাজ্যের অস্ত্রশস্ত্র।

সভাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত। রাজা সবাইকে বললেন, এবার তবে বিচার করে দেখ। সবাই বিচারে বসল। বিচারে সাব্যস্ত হল, ঘোড়া সত্য নয়, সাজগোজ জেল্লাজমক অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়, সত্য হচ্ছে সওয়ার। সে সওয়ারই একলা দাঁড়িয়ে। বাজিকর যে সওয়ারও সে।'

কিংবা আরেক রকম করে বলি।

'মনে করো, একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ, আলু বেগুন ছেড়ে দিয়েছ তাতে। কতক্ষণ পরে আলু-বেগুন নড়তে-চড়তে লাফাতে সুরু করল। ছোট ছেলে যার জ্ঞান হয়নি সে ভাবছে আলু-বেগুন বুঝি নিজের থেকেই লাফাচ্ছে। কিন্তু লাফাবার আসল কারণ হচ্ছে ঐ হাঁড়ির নিচেকার আগুন। যতক্ষণ আগুন ততক্ষণই লাফ-ঝাঁপ। জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিয়ে যাঁও উনুন থেকে, সব ঠাণ্ডা। সব আমরা ঈশ্বরের শক্তিতেই শক্তিমান। আমরা সব তাঁর খেলার পুতুল।'

সব তাঁর খেলা বা খেয়াল। 'খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা।' শুধু জগৎ নয় আমার হৃদয়টুকুও। আমার হৃদয়টুকুই যে তাঁর খেলবার আঙিনা। আমি না হলে তাঁর খেলা জমবে কেন? দুজন না হলে কি খেলা জমে?

ঈশ্বরের আস্বাদন ও উপভোগের জন্যেই আমরা। এর বাইরে আর কি প্রয়োজন আছে জীবনের? এই বোধই তো মানুষের চরমবোধ। যার জীবনে ঈশ্বরের উপভোগ ও আস্বাদন অব্যাহত সেই ভক্ত। ভক্তের হৃদয়েই কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা।

ভক্ত মুক্তি চায় না। সে চায় ঈশ্বরের রূপ দেখতে, আলাপ করতে। জগৎকে সে বলে না স্বপ্নবৎ। বলে তিনিই এ সব হয়েছেন। মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ, নানা ছাঁদ। সবই ঈশ্বরের ঝিলিক, ঈশ্বরের চাকচিক্য। বলে, বা, এ সব বেশ হয়েছে, দিব্যি হয়েছে।

ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। ভক্ত মায়া ছাড়ে না। মহামায়ার ভজনা করে। জ্ঞানী জোর করে খুলে দেয় ঘোমটা। ভক্ত স্তব করে ঘোমটা খোলায়।

একটু অহং থাকে ভক্তের। সে অহং আস্বাদনের অহং, সে অহং তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি মা, আমি সন্তান।

'এই বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, এতে দোষ নেই।' বললেন ঠাকুর, 'বজ্জাত আমিতেই দোষ। ভক্তের আমি মানে বালকের আমি। কেমন জানো? যেন আর্শির মুখ। আর যাই করুক গালাগাল দেয় না। যেন পোড়া দড়ি। পোড়া দড়ি দেখতেই দড়ির আকার। কিন্তু ফুঁ দাও উড়ে যাবে। জ্ঞানাগ্নিতে অহঙ্কার পুড়ে গেছে। এখন আর কারু অনিষ্ট করে না। এখন নামমাত্র আমি।'

'সেদিন মহিম চক্কোত্তির বাড়ি গিয়েছিলাম।' বললে নরেন।

'তাই নাকি?' ঠাকুর উৎসুক হয়ে উঠলেন।

'ওরকম শুষ্কজ্ঞানী দেখিনি।'

'বটে? কি হল ওখানে?'

'আমাদের গান গাইতে বললে। গঙ্গাধর গাইলে—"শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি-উতি

চায়, সম্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায়।" গান শুনে কি বললে জানেন?'
'কি বললে?'
'বললে, ও সব গান কেন? প্রেম-ট্রেম ভালো লাগে না। তা ছাড়া মাগ-ছেলে নিয়ে থাকি, ও সব গান এখানে কেন?'
'দেখলে, কি ভয়!' ঠাকুর হেসে উঠলেন।
জ্ঞানীরই ভয়, ভক্তের ভয় কি! যে মায়ের সন্তান সে তো অকুতোভয়। তার মুখে মা-মন্ত্র সে তো অভী-মন্ত্র। আমার মা আছেন আর আমি আছি, আমার আবার কিসের ভাবনা!
বোশেখ মাস, রোদের দিকে তাকানো যায় না। ঘরেও দুঃসহ গরম। নিঃসন্দেহ কষ্ট হচ্ছে ঠাকুরের। সুরেন মিত্তির খসখস এনে দিয়েছে। পরদা বানিয়ে টাঙিয়ে দাও জানলায়। জলের ছিটে দাও। ঘর ঠাণ্ডা হবে।
কিন্তু কে দেয়। কার আর এ সব দিকে নজর আছে!
সুরেন হৈ-চৈ করে উঠল। 'এ কি, কেউ পরদা করে টাঙিয়ে দিলে না খসখস? কি আশ্চর্য, এ দিকে কারু মনোযোগ নেই।'
'কি করে হবে!' কে একজন পাশের থেকে টিপ্পনি কাটল : 'শিষ্য সেবকদের যে এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এখন কেবল সোঽহং চলছে। আবার যখন তুমি প্রভু আমি দাস চলবে তখন এসব দিকে নজর আসবে। তার আগে নয়।'
কিন্তু নরেন কি ভক্ত না জ্ঞানী?
নরেনের হাত মুখ স্পর্শ করছেন ঠাকুর। বলছেন গাঢ়স্বরে, 'মায়াবাদ? মায়াবাদ বড় শুকনো।' তাকালেন নরেনের দিকে। 'কি বললাম বল তো।'
'শুকনো।'
'কিন্তু তুই? তুই তো শুকনো নোস। তোর মুখ-চোখ তো শুকনো নয়। তোর সর্বাঙ্গে যে ভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানের পর যে ভক্তি সেই ভক্তির ব্যঞ্জনা।'
ভক্তি নইলে জ্ঞান দাঁড়াবে কোথায়? জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করার পর কি করবে? থাকবে বিদ্যামায়া নিয়ে। ভক্তি দয়া বৈরাগ্য নিয়ে। তার দুই উদ্দেশ্য। এক উদ্দেশ্য লোক-শিক্ষা, দ্বিতীয় রসাস্বাদন। জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকে তবে লোকশিক্ষা হয় না। তেমনি ঈশ্বরের আনন্দকে কি করে সম্ভোগ করবে যদি ভক্তি না থাকে?
তাই নরেন ভক্তশ্রেষ্ঠ। তার এক দিকে ঈশ্বরসম্ভোগ অন্য দিকে লোকশিক্ষা।
লোকশিক্ষা?
সমাধিতে বসেছে নরেন। উঠব না বসব না নড়ব না। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করব।
সমস্ত দেহ নিঃসাড় নিস্পন্দ। মৃত্যুশীতল। মধ্যরাত্রির পাথরে নেই এতটুকু একটা নিশ্বাসের রেখা।
পাশে বুড়ো গোপাল বসে ছিল। তার ধ্যানে ছেদ পড়ছে বারে-বারে। আড় চোখে দেখছে নরেনকে। কিন্তু এ কি, ঘুমন্ত লোকেরও একটা অস্তিত্ব থাকে। নরেনের গায়ে সে ঠেলা মারল। ডাকল, নরেন, নরেন! কে সাড়া দেবে! গা একেবারে নিষ্প্রাণ ঠাণ্ডা।

ছুটে দোতলায় একেবারে ঠাকুরের কাছে এসে হাঁপাতে লাগল গোপাল। বললে, 'নরেন নেই।'
'নেই, গেল কোথায়?'
'মরে গেছে।'
'বেশ হয়েছে। থাক অমনি কতক্ষণ শূন্য হয়ে। সমাধি-সমাধি করে আমাকে কম জ্বালিয়েছে! এখন ঘুরুক একটু সমাধির দেশ।'
দেহজ্ঞান ফিরে এলে পর টলতে-টলতে ঠাকুরের কাছে উঠে এল নরেন। ঠাকুর বললেন, 'কি রে, বেড়ানো হল একটু সমাধিভূমি? কেমন দেখলি? কিন্তু যাই বল, ঘর তোকে দেখিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু তার দরজায় চাবি এ'টে বন্ধ করে দিলাম।'
'বন্ধ করে দিলেন?' যেন চমকে উঠল নরেন। 'কিন্তু তার চাবি?'
'তার চাবি আমার কাছে থাকল। সে ঘরে যে তোর হামেসা যাওয়া চলবে না। তোর যে অনেক কাজ।'
'কাজ? কিসের কাজ? কার কাজ?' নরেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।
'আমার কাজ।' ঠাকুর তাকালেন নরেনের চোখের দিকে। 'সে কাজ যখন ফুরুবে তখন আমিই চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ ঘর আবার খুলে দেব, দেখিস।'
'কিন্তু কাজটা কি শুনি?'
কাগজ-পেন্সিল তুলে নিলেন ঠাকুর। যেন কী গূঢ় কথা জানাচ্ছেন গোপনে এমনি করে লিখলেন। লিখলেন, 'লোকশিক্ষা।'
'বয়ে গেছে।' প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়া দিল নরেন। বললে, 'পারব না, কিছুতে পারব না।'
ঠাকুর দৃঢ় স্বরে বললেন, 'তোর ঘাড় পারবে।'
তুই যে ভক্তশ্রেষ্ঠ। তোর এক দিকে ঈশ্বরসম্ভোগ অন্য দিকে লোকশিক্ষা।
কিন্তু ভক্তিই সব? বিজ্ঞান বা সায়ান্স কিছু নয়? ডাক্তার সরকার উসখুস করে উঠল।
কে বললে কিছু নয়? প্রতীয়মান সত্যকে কে অমান্য করবে, কে মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হবে? ঈশ্বরেরই যে ইচ্ছা, বুদ্ধির জগতে বিজ্ঞানই সিংহাসন নিক। স্বচ্ছ দৃষ্টি ও দৃঢ় প্রমাণেরই জয়জয়কার হোক। জড়বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান—এরাই তো প্রকৃতীশ্বরের জীবন্ত ধর্মগ্রন্থ। এদেরকে বাদ দিলে চলবে না, কিন্তু ওদের বাইরে আর জায়গা নেই তাও নয়। বুদ্ধির জগতের বাইরে রয়েছে আরেকটা বোধির জগৎ। স্বল্প কল্পনার স্বপ্নরহস্যের জগৎ নয়, প্রতীয়মানের ঊর্ধ্বে অননুভূয়ের জগৎ। আপেক্ষিকের ঊর্ধ্বে অব্যাহতের। তাকেই বা বাদ দেব কেন? ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক বুদ্ধির বিজলির আলোর ঊর্ধ্বে স্বয়ম্প্রভ বোধির জ্যোৎস্নাকেও উপভোগ করব না কেন?
সেই উপভোগের কৌশলটিই ভক্তি।
কাচের বোয়মের মধ্যে জল, তাতে লাল মাছ খেলা করছে। ডাক্তার সরকার তাতে একটা এলাচের খোসা ফেলে দিল। মাছের খাবার সেই এলাচের খোসা।

'দেখলে, দেখলে', কাছে বসেছিল মাস্টার, তাকে লক্ষ্য করে ডাক্তার বললে, 'মাছগুলো আমার দিকে চেয়ে আছে। এদিকে যে এলাচের খোসা ফেলে দিয়েছি তা দেখছে না। তাই তো বলি শুধু ভক্তিতে কিছু হবে না, জ্ঞান চাই।'
কটা ময়দার গুলি পাকিয়ে খোলা ছাদের উপর ছুঁড়ে দিল ডাক্তার। কটা চড়ুইপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে, খাক এই ময়দার গুলি।
'দেখলে, চড়ুইপাখি উড়ে পালাল। ময়দার গুলি দেখে ভয় পেল। ওটা যে খাবার জিনিস তা জানে না। ওর খাওয়া হল না জানে না বলে। ওর ভক্তি হল না জ্ঞান নেই বলে।'
নিশ্চয়। জ্ঞানের পরেই তো ভক্তি। এত জেনেও তোমাকে জানা হল না, তাইতো তোমাকে ভালোবাসা।
পাশাপাশি দুটো পাতকুয়ো আছে। একটার জল আসছে নিচে ঝরনার থেকে, আরেক-টার আসছে বর্ষার থেকে। দুটোই সমান পরিপূর্ণ। কিন্তু বর্ষার পাতকুয়োর জল কতক্ষণ টিকবে? যেই বর্ষা শেষ হবে অমনি জলও শেষ হবে। কিন্তু যে-পাতকুয়োর নিচে ঝরনা তার অনন্ত পরমায়ু। তার জলের আর শেষ নেই। সে সব সময়েই কানায়-কানায় ভরা। তেমনি তোমার সায়ান্সের জ্ঞান ঐহিকের জ্ঞান দুদিন পরেই শুকিয়ে যাবে। কিন্তু যে ভক্ত তার মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের উৎস, সে সব সময়েই ভাবে-রসে-সুখে-প্রেমে পরিপূর্ণ।
'কিন্তু ভক্তিপথে মানুষ যে আটকে যায়।' বললে ডাক্তার।
'তা যায় বটে কিন্তু তাতে হানি হয় না।' বললেন ঠাকুর। 'সেই সচ্চিদানন্দের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। তুমি বিচারের পথে জ্ঞানের পথে যেখানে এসে পৌঁছুবে, আমি যে শুধু ভক্তির জোরেই সেখানে পৌঁছুতে পারি।'
'কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম কি অমনিতে হয়?' বললে ডাক্তার। 'ঘোড়ার চোখের দুদিকে ঠুলি দাও। তেমন বেয়াড়া হয় ঘোড়া একেবারে বন্ধ করে দাও চোখ। ঐটেই বিচার।'
'ভক্তিপথেও তাই হতে পারে।' ঠাকুরের কণ্ঠস্বর আবেগমধুর হয়ে উঠল : 'যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর গুণগান করতে ভালো লাগে, তাহলে আর চেষ্টা করে ইন্দ্রিয়সংযম করতে হয় না। রিপুবশ আপনা-আপনি হয়ে যায়।'
সেদিন নরেন গান গাইল। আর গান শুনে নাচতে শুরু করলেন ঠাকুর।
ডাক্তার তো স্তম্ভিত! এত-বড় একটা কঠিন রুগী, দুর্বল যন্ত্রণাজর্জর সে কিনা মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু করেছে! শরীরের দুঃখদৈন্য চলে গিয়েছে নির্বাসনে, মন শুধু সুধাস্নানে মাতোয়ারা।
এ কি, ডাক্তারের চোখেও ঘোর লাগল নাকি। সে কি চোখের সামনে একজন ব্যাধি-ক্লিষ্ট রুগী দেখছে, না, আর কেউ?
যা এমন অসাধ্য ব্যাধির অসহ্য কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে, সে না জানি কি দ্রব্য!
শুধু ঠাকুর নন, যারা-যারা ভক্ত সেখানে জমায়েত হয়েছে, ছোট-নরেন, লাটু, সবাই সমাধিস্থ। নাড়ী চলছে না, নড়ছে না হৃৎপিণ্ড। সবাই জড় জিনিসের মত নিশ্চল-স্তূপ হয়ে আছে।

ঠাকুরের চোখের পাতা মেলে আঙুল ঢুকিয়ে দিল ডাক্তার, চোখের পাতা কাঁপল না এতটুকু।

বিজ্ঞান কি পঙ্গু হয়ে গেল নাকি? পর্বতের গা বেয়ে কত দূর উঠে, বসে পড়ল নাকি? থেমে পড়ল নাকি? পাথেয় ফুরিয়ে গেল নাকি তার?

ভাবের উপশম হবার পর আরেক বিচিত্র কাণ্ড। ভক্তেরা কেউ হাসছে কেউ কাঁদছে। এতে হাসবারই বা কি আছে, কাঁদবারই বা কি আছে! সুস্থসমর্থ ছেলেগুলো সহসা পাগল হয়ে গেল নাকি? পাগল না হবে তো এ কেমন ব্যবহার!

'কিন্তু, যাই ভাবো আর বোঝো, তুমি রসবে।' ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ঠাকুর।

তোমাকে শুকনো থাকতে দেব না। এমনি যা জানবে সব শুকনো। যখন ঈশ্বরকে জানবে তখনই তুমি সরস-তরল। আর ঈশ্বরকে জানাই সমস্ত জানার চরম। সমস্ত বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান।

ঈশ্বরই অপ্রমেয়। তিনি সর্বভূতের বাসস্থান, তাই তিনি বাসুদেব। বৃহৎ বলে তিনি বিষ্ণু। মা শব্দের অর্থ বুদ্ধি। মৌন ধ্যান ও যোগশক্তিতে আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে দূরীকৃত করেন বলে তিনি মাধব। কৃষি-শব্দের অর্থ সত্তা আর ন-শব্দের অর্থ আনন্দ। সৎ ও আনন্দস্বরূপ বলে তিনি কৃষ্ণ। পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরমস্থান ও অক্ষ শব্দের অর্থ অব্যয়। পরম স্থানে বাস করেন আর তাঁর লয় নেই বলে তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ। দস্যুদের বিত্রাসিত করেন বলে জনার্দন। কারু গর্ভে জন্মান না বলে অজ। সাতিশয় দান্ত ও ইন্দ্রিয়দের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলে দামোদর। হৃষ্ট ও ঐশ্বর্যবান বলে হৃষীকেশ। নরগণের আশ্রয় বলে নারায়ণ। সর্বভূতের পূরণকর্তা বলে পুরুষোত্তম।

সেদিন আবার গান শোনাবার জন্যে নরেনকে পীড়াপীড়ি করছেন ঠাকুর। আর গান মানেই তো ঈশ্বরগুণগান।

মাস্টারকে ইশারা করল ডাক্তার। বললে, গান-টান আর নয়। উত্তেজিত হবেন আর তাতে মহা অনর্থ হবে। বারণ করে দাও।

কে কাকে বারণ করে!

ঠাকুর নিজে থেকেই জিগগেস করলেন, 'কি হে গান শুনবে?'

'আমি তো শুনতে পারি কিন্তু তুমি শুনো না।'

'আমি শুনব না?'

'না, গান শোনা তোমার অপকার।'

'অপকার?'

'হ্যাঁ, গান শুনলেই যে তুমি তিড়িং-মিড়িং করে ওঠো।'

মুখখানি ম্লান করলেন ঠাকুর। বললেন, 'কি করতে হবে?'

'ভাব চেপে রাখতে হবে।'

'তাই রাখব। চুপ করে থাকব। তবু গান হোক।'

নরেন গান ধরল। 'এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!'

দেখতে-দেখতে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়ে গেল। ডাক্তার কোথায় বিরক্ত হবে, তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল সেই আশ্চর্য মুখের দিকে। এমন মুখ, পলকপতনকালেও না দেখে হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে। এ কি মানুষের মুখ? এ কি জ্বরজরাপীড়িত মর্ত দেহ, না কি সূর্যাগ্নিসঙ্কাশ দিব্যপুরুষ?
এ কি, গান শুনতে-শুনতে যে ডাক্তারের চোখেও জল ভরে এল!
'তুমি রসবে।' ঠাকুরের কথা না ফলে যায় না।
শুধু তাই নয়, ভাবাবেশে ডাক্তারের কোলের মধ্যে পা তুলে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'আহা তুমি তখন কি কথাই বলেছ! তাঁরই কোলের মধ্যে বসে আছি, দুঃখ-কষ্টের কথা আধি-ব্যাধির কথা তাঁকে বলব না তো কাকে বলব!'
ঠাকুরেরও দু-চোখ ভেসে গেল জলে। ডাক্তারকে বললেন, 'ডাক্তার, তুমি খুব শুদ্ধ, খুব খাঁটি। তা না হলে কি তোমার গায়ে পা রাখতে পারি?'
তিন যুদ্ধে জয়ী হলেন ঠাকুর। প্রথম যুদ্ধ সংশয়ের সঙ্গে, অবিশ্বাসের সঙ্গে, যার প্রতিনিধি নরেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ পাপের সঙ্গে, উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে, যার প্রতিনিধি গিরিশ। তৃতীয় যুদ্ধ বিজ্ঞানের সঙ্গে, প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে, যার প্রতিনিধি ডাক্তার, মহেন্দ্র সরকার।

১৫২
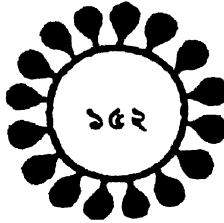
প্রতীক্ষা করে থাকো। বিশ্বাস হারিও না। নিরাময় হতে পারে না এমন রোগ নেই। অপসৃত হতে পারে না এমন বাধা নেই। বিগলিত হতে পারে না এমন কাঠিন্য নেই। আর ঈশ্বরের শক্তি? কোথাও তার সীমারেখা টানতে চেয়ো না। আরোপ করো না কোনো সর্তের ঘেরাটোপ। সমস্ত নিয়ম নির্দেশের বাইরে তাঁর ইচ্ছা।
আনন্দ পাও বা না পাও তাঁকে ধরে থাকো। চালিয়ে যাও ধ্যান-ধারণা। অভ্যাসযোগের পৃষ্ঠা উলটিয়ে যাও। পড়ে থাকো, লেগে থাকো, বাকি রাতটুকু কোনো রকমে কাটিয়ে দাও জেগে থেকে।
দেখনি, পিত্তদোষ হলে মুখে চিনি ভালো লাগে না। কিন্তু রোজ যদি অভ্যেস করে একটু চিনি খাও, পিত্তদোষ তো সেরে যাবেই, চিনিকেও মিষ্টি বলে অনুভব করবে। পিত্তদোষ মানে অবিদ্যাদোষ আর চিনি মানে ঈশ্বরপ্রীতি। একটু-একটু রোজ সাধন-ভজন নাম-জপ করো, দেখবে অবিদ্যাদোষ কেটে যাচ্ছে অন্নর সুস্বাদু লাগছে

ভগবানকে। হবে না হচ্ছে না বোলো না, শুধু লেগে থাকো। জেগে থাকো। বীজ বুনতে-বুনতেই কি ফল হয়? ধৈর্য ধরো, বীজ বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর হও। জল সেচ, নিড়েন দাও, পোকার কামড় বা পাখির ঠোকর যেন না লাগে। তার পর বেড়া দাও, ছাগল-গরু যেন না মুখ বাড়ায়। এত হ্যাঙ্গাম-হুজ্জতের পরেই না ফসলের হাতছানি।

সমস্ত খাটুনির মজুরি মেলে, ঈশ্বর খাটুনির মজুরি মিলবে না?

আর যাই করো, তালে ভঙ্গ দিয়ো না।

সেই কৃপণ রাজার গল্প শোনো। বুড়ো হয়েছে, রাজকাজ দেখবার ক্ষমতা নেই, অথচ শাসনভার যে ছেড়ে দেবে ছেলের উপর তারও প্রবৃত্তি হয় না। ছেলে বড়ো হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে তাতে কি। রাজ্য পেলে পাছে বেশি খরচ করে সেই ভয়েই অভিভূত। মেয়ে বড় হয়েছে কিন্তু তার বিয়ে দিতে গেলেই বেরিয়ে যাবে অনেক টাকা। তাই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেও রাজা উদাসীন।

সেই রাজ্যে নামজাদা নট-নটী এসেছে। ইচ্ছে রাজাকে তাদের নাচ দেখায়। এত বড় নাচিয়ে-বাজিয়ে, না দেখলেও রাজার মান থাকে না। অথচ দেখতে গেলেই তো এক-গাদা খরচ। নট-নটীকে সরাসরি 'না'ও বলছে না। অথচ আসরও বসাচ্ছে না। হবে—হচ্ছে—বলে ঠেকিয়ে রাখছে। নট-নটী মন্ত্রীর দ্বারস্থ হল। মন্ত্রী রাজাকে গিয়ে বললে, আপনার কিছু খরচ হবে না, আপনি আসর ডাকুন।

কিছু খরচ হবে না জেনে রাজা আশ্বস্ত হল। তবে আসর জমাও। ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে দাও।

সভায় তিলধারণের স্থান নেই। রাত্রির প্রথম প্রহরেই শুরু হল তামাশা। নটী নাচছে আর নট তাল বাজাচ্ছে। একেকটা নাচ শেষ হয়, নটী তাকায় এদিক-ওদিক, যদি কোথাও থেকে আসে কোনো উপঢৌকন। একটা কাণাকড়িও কেউ ছুঁড়ে মারে না। বিষাদভাব কাটিয়ে নটী আবার নাচ শুরু করে, নট আবার ঢোল তুলে নেয়। নৃত্য-শেষে আবার সেই রিক্ততা। সেই শূন্যাঞ্জলি।

ক্লান্ত হয়ে পড়ল নটী। রাত্রির দ্বিপ্রহর কখন কেটে গিয়েছে, তবু একটা পয়সা উপার্জন হল না। আশার শেষ নেই, আবার তাল বাজাল নট। তৃতীয় প্রহর গিয়ে এখন শেষ প্রহরও প্রায় যায়-যায়। নটী বোধ হয় এবার ভেঙে পড়বে। ম্লান কণ্ঠে বললে এবার নটকে, 'রাত তো প্রায় কাবার হতে চলল। শরীরও অবসন্ন। একটা ফুটো পয়সাও মিলল না এ পর্যন্ত। হে নট, বিরথা তাল বাজাও। তোমার তাল বাজানো অনর্থক।'

বিমর্ষ চোখে ক্ষীণ হাসির আভা এনে শান্ত স্বরে নট বললে, 'বহুৎ গেয়ি, থোরি রহি, থোরি ভি আভি যায়; নট কহে দায়িতাকো, তালমে ভঙ্গ্ ন পায়।' রাতের অনেকটাই চলে গেছে, তবু অল্প কিছু এখনো আছে। নট তার প্রিয়াকে বলছে, এখনি তালে ভঙ্গ দিও না।

এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এখনো আশার জলসেক নিঃশেষ হয়নি। এখনো প্রদীপে খানিকটা তেল আছে;

সম্পূর্ণ পুড়ে যায়নি মোমবাতি। যতক্ষণ বর্ষে ততক্ষণ অর্শে। হেরে যেও না, ছেড়ে দিও না। নেচে যাও, আমিও যাই বাজিয়ে।

নটের কথা শুনে অঘটন ঘটে গেল। এক সাধু ফকির ছিল দর্শকদের মধ্যে, সে তার কম্বলখানা, তার একমাত্র সম্পত্তি, দিয়ে দিল নটকে। যুবরাজ তার হাত থেকে খুলে দিল সোনার তাগা। আর রাজকুমারী? রাজকুমারী তার গলার থেকে তুলে নিল রত্নমাল্য।

রাজা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। সাধুকে বললে, 'এ কি ব্যাপার?'

সাধু বললে, 'নটের ঐ মন্ত্র শুনে দিব্যচক্ষু খুলে গেল।'

'মন্ত্র?'

'হ্যাঁ। ঐ যে বললে তালমে ভংগ্ ন পায়, সেই মন্ত্র। অনেক দিন থেকে সাধুগিরি করে ঘুরছি দেশে-দেশে, সেই ছেলেবেলা থেকে, বুড়ো হয়ে পড়েছি এখন। কি কষ্টের যে এই সাধুগিরি, আর পোষাচ্ছে না এই বার্ধক্যে। ঠিক করেছিলুম গৃহস্থজীবনে আবার ফিরে যাব। বাকি দিন কটা কাটাব একটু আলস্যে আরামে। এমন সময় এই নটের মন্ত্র কানে এল। অনেক গেছে, অল্প আছে—কে জানে এই অল্পই হয়তো অনেক। অল্প যেতে-যেতেও হয়তো অনেক। নেচে যাও বাজিয়ে যাও। তাল কাটিয়ে দিও না। স্বস্থানে নিয়তস্থিত থাকো। তাই ঠিক করলাম জীবনের বাকি কটা দিন যেমন সাধুগিরি করছিলাম তেমনি সাধুগিরিই করে যাব।'

'আর তুমি?' রাজা জিগগেস করলে যুবরাজকে।

'ঠিক করেছিলাম গোপনে আপনাকে হত্যা করে রাজা হব। এমন সময় অতালভঙ্গের মন্ত্র এল। ভাবলাম বৃদ্ধ রাজা কদিনই বা আর বাঁচবে। বাকি অল্পকালের জন্যে কেন পিতৃহত্যার পাতকে লিপ্ত হই? যাক না যেমন যাচ্ছে। আর কটাই বা দিন! কেন সন্তানধর্ম থেকে বিচ্যুত হই? তাই মন্ত্রদাতাকে গুরুপ্রণামীস্বরূপ দিলাম ঐ হাতের তাগা।'

'আর তুমি?' রাজকন্যাকে লক্ষ্য করল রাজা।

'ঠিক করেছিলাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করব। এমন সময় বিদ্যুতের মত মন্ত্রের চমক এল। অনেক গেছে, অল্প আছে—সে অল্পও বুঝি যেতে বসেছে, তবু অল্পের জন্যে স্খলিত হয়ো না। বুড়ো বাপের আয়ুই বা আর কত দিন! কার্পণ্যের জন্যে বিয়ে দিচ্ছেন না, তাঁর তিরোভাবেই আসবে সেই দাক্ষিণ্যের শুভ লগ্ন। কেন দুদিনের জন্যে রাজকুলে কালি দিই, আপনাকে ক্লিষ্ট করি। তার চেয়ে প্রতীক্ষা করে থাকি, বাধা অপসারিত হবে, পাব সেই মনোনীতকে।'

মহাজ্ঞানস্বরূপ ফল লাভ করল রাজা। ছেলেকে রাজপদে অভিষিক্ত করল। মেয়েকে সমর্পণ করল বাঞ্ছিত পাত্রে।

তাই, শুধু লেগে থাকো, পড়ে থাকো, ধরে থাকো। শুধু নাম করে যাও। শুধু সহ্য করে যাও।

ঠাকুর হৃদয়কে বলতেন, 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করব, তবে হবে। তা না হলে ডাকতে হবে খাজাঞ্চীকে।'

আর কিছু করতে না পারি সইতে পারি। একমাত্র সহ্য করে যাওয়াই সাধন করে যাওয়া।

ঢিমে তেতালা বাজালে চলবে না। পনেরো মাসে এক বছর করলে কি হয়? চি'ড়ের ফলার হয়ো না। জোর করো। রোক করো। উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো। এগিয়ে গিয়ে ধরো। এগিয়ে গিয়ে ধরার নামই শরণাগতি। ভক্তিমান কে? যে শক্তিমান সেই আসলে ভক্তিমান।

আর শক্তি হচ্ছে সহ্য করার শক্তি। আঁকড়ে থাকবার শক্তি।

মাস্টারকে বললেন, 'সকলেরই যে বেশি তপস্যা করতে হয় তা নয়। কারু-কারু চট করে হয়ে যায়। আমার কিন্তু বড় বেশি কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল মা-মা বলে ডাকতাম। মা-মা বলে কাঁদতাম।'

সেই তো একমাত্র ডাক, যে ডাকে শ্রান্তি নেই, যে ডাক সাড়া না আনলেও সান্ত্বনা আনে। আর যখনই সান্ত্বনা পেলে তখনই বুঝলে সাড়া এসেছে।

আর কেউ আমার থাক না থাক, আমার মা আছে, এই তো ধরে থাকবার কৌশল-কলা। মা ভুলিয়ে রাখতে চান খেলা দিয়ে। কিন্তু মা যখন বুঝবেন ছেলে খেলনা চায় না মাকেই চায়, তখন আর মা কি করবেন!

তাই শুধু মাকেই ধরে থাকো। যখন তাঁর স্বত্বে আছি তখন তাঁর ঘরে আমারও হিস্‌সা আছে। আমি ভয়-ভাবনাশূন্য।

উঠোনের দোষ দিয়ো না, শুধু নেচে যাও। যারা খেলতে জানে তারা কানাকড়িতেও খেলে। আর সব পুরোনো হয়ে যায়, তেতো হয়ে যায়, শুধু ঈশ্বরপ্রীতিতেই বিস্বাদ নেই, একঘেয়েমি নেই। তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং। নবীনের থেকেও নবীনতর ঈশ্বর। শুধু মা নামেই অরুচি নেই। মা নামেই বিশ্বাস, মা নামেই ব্যাকুলতা। ডাকলেই মনে হয় যেন পাশের ঘরে রান্নাঘরে আছেন, এখুনি ছুটে আসবেন। আছেন—এইটি বুঝিয়ে বিশ্বাস আনান। আর আসবেন—এইটি বুঝিয়ে আনান ব্যাকুলতা। আর যদি একবার বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা আসে তবে ঈশ্বরই চলে আসবেন। আর ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরদর্শনের জন্যেই নরজন্ম। চক্ষের এত তৃষ্ণা শুধু শেষ সেই ঈশ্বরকে দেখব বলে।

তাই সমস্ত বন্ধ কুঠুরির চাবিকাঠি হচ্ছে মা-ডাক। মাতৃস্তোত্র করো।

হে শরণাগতের আর্তিহারিণী, অখিলজগতের জনয়িত্রী, সর্বচরাচরের অধীশ্বরী, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি যদি প্রসন্ন হও তাহলে আর আমার ভয় কি! তাহলে আর আমার কিসের দৈন্য-কাতর্য, কিসের বা অজ্ঞান-অবোধ!

তুমি জগদ্ধাত্রী, মহতী মহীমূর্তি! মৃত্তিকা হয়ে সবাইকে আঁকড়ে আছ, আবার জল হয়ে আপ্যায়িত করছ সবাইকে। আমাকে তাই তুমি কোলে ধরো, স্তন্যদানে স্নিগ্ধ করো। ধারণ-পোষণের উৎস তুমি, তোমার শক্তির সঙ্গে কে এঁটে উঠবে! তুমি অলঙ্ঘবীর্যা।

তোমার বীর্যবিভবের অন্ত কোথায়? তুমিই সর্বব্যাপিনী স্থিতিশক্তি। তুমিই

বিশ্বের বীজ, তুমিই আবার প্রকাশপল্লব। তুমিই পরমা মায়া। তুমিই সম্মোহিনী, তুমিই আবার মোক্ষদাত্রী। তুমি শুধু প্রসন্ন হও। প্রসন্ন হলেই কামকাঞ্চনের লাজ-লজ্জা খসে পড়বে, উদ্ভাসিত হবে তোমার অভয়-অক্ষয় মাতৃমূর্তি।
তাই তুমি সমস্তরূপিণী বিদ্যামূর্তি। যা-কিছু দেখি সব তোমারই ভেদ, তোমারই ভাগ। জগৎজোড়া সমস্ত স্ত্রীই তুমি, তোমারই বিকিরণ। মাতৃস্বরূপে সমস্ত বিশ্বকে তুমি পরিপূর্ণ করেছ, সমাচ্ছন্ন করেছ, তোমার আমি কী স্তুতি করব! তবু তোমার নাম করি, তোমার স্তোত্র পড়ি, সে শুধু আমার বাকশুদ্ধির জন্যে।
তুমি নিত্যস্তুতা, যেহেতু তুমি সর্বভূতা, স্বর্গমুক্তিবিধাত্রী। এমন কি উক্তি আছে যে অবাক্‌গোচরাকে ব্যাখ্যা করে। তুমিই তোমার বেত্তা, তুমিই তোমার ব্যাখ্যাতা।
তুমি সর্বলোকের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে বিরাজমান। তুমিই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। স্বর্গও দাও, অপবর্গও দাও। ভোগ দাও আবার দাও ভোগাতীত সম্ভোগ। তোমাকে প্রণাম।
তুমিই মুহূর্ত, তুমিই পরিণাম। তুমি কালের পরিচ্ছেদ, তুমিই আবার অপরিচ্ছিন্ন সত্তা। সকলের হয়েও প্রত্যেকের। ব্যষ্টির নয় সমষ্টিরও সংহারকর্ত্রী।
তুমি সর্বমঙ্গলের মঙ্গলকারিণী। শুভময়ী। সমস্তবাঞ্ছিতকরী। সর্বাভীষ্টসাধিকা। তুমিই আশ্রয়নীয়া। ত্রিনয়না গৌরী। তোমার ত্রিনেত্র—সূর্য, চন্দ্র আর বহ্নি, স্থূল সূক্ষ্ম আর কারণ, স্মৃতি কল্পনা আর আশা, শব্দ স্পর্শ আর রস, অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। তুমি সৌম্যা, মনোহরা।
তুমি মহতী চিতিশক্তি। তোমার তিন স্পন্দন, সৃষ্টি স্থিতি আর বিনাশ। গুণত্রয় যখন তোমার আধারে প্রকাশিত হয়, তখন তুমিই স্বয়ং গুণময়ী। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিন আবর্তনের অতীত, তুমি আবার নিত্যা সনাতনী।
শরণাগত, দীন ও আর্তের তুমি পরিত্রাণপরায়ণা। তোমাকে বুঝিনি বলেই তো আমি দীন, তোমাকে পাইনি বলেই তো আমি আর্ত। তারপর যখন বুঝি কোথায় আমার আশ্রয়, কোথায় আমার প্রতিষ্ঠা, তখনই দেখি, হে নিবৃত্তিকারিণী, তুমি আমার সর্ব অভাব মোচন করেছ।
তুমি ব্রহ্মাণী। তুমি সর্বব্যাপিনী বিশ্বকল্পনা। জীবমনের হংস-বিমানে চড়ে উড়ে চলেছ সেই ব্যোমবাহিনী বিশ্বকল্পনায়। তোমার কমণ্ডলুর কুশপূত বারি ক্ষরণ করো। তোমার এই বারিসিঞ্চন ছাড়া কর্মপিপাসা নিবৃত্ত হবার নয়।
ত্রিশূল, চন্দ্র আর অহি তুমি ধারণ করে আছ জ্ঞানে আর মনে কুলকুণ্ডলিনী জাগাবে বলে। অধিষ্ঠিত আছ ধর্মরূপী বৃষভে। তুমি স্বপ্রকাশরূপা মাহেশ্বরী।
ময়ূর ভুজঙ্গদলকে বিনাশ করে। তুমি সেই পাপনাশিনী পবিত্রতা। তুমি কুমারী, তুমি অনঘা, তুমি মহাশক্তি।
তুমি শ্রেষ্ঠ আয়ুধধারিণী বৈষ্ণবী। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গশোভিতা। তুমি প্রসন্ন হও। তুমি বারাহীমূর্তিতে উগ্র মহাচক্র ধারণ করে দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধার করেছ বসুন্ধরাকে। তুমি না তুললে কে ভাঙত তার এই তিমিরমগ্নতা? তার কামকর্ম থেকে কে তাকে নিয়ে যেত চিরন্তন মঙ্গলের দিকে? মা তুমি মঙ্গলরূপিণী।

তুমি নারসিংহী। দম্ভের স্তম্ভ বিদীর্ণ করে হিরণ্যকশিপুকে নিধন করলে। তুমি ত্রৈলোক্যত্রাণকারিণী নারায়ণী।

তুমি কিরীটিনী, তুমি মহাবজ্রা। তুমি সহস্রনয়নোজ্জ্বলা। অনাত্মবোধরূপী বৃত্র তোমারই শস্ত্রপ্রহারে পরাভূত। তুমি অসুরঘাতিনী ব্রাহ্মীশক্তি।

তুমি শিবদূতী। ঘোররূপা, মহারাবা, সর্বসন্ত্রাসকারিণী। তুমি দংষ্ট্রাকরালবদনা, শিরোমালাবিভূষণা। তুমি চামুণ্ডা, দানবমথনা।

তুমি লক্ষ্মী। তুমি লজ্জা। তুমি পুষ্টি। তুমি শ্রদ্ধা। তুমি স্বধা। তুমি ধ্রুবা বিনিশ্চলা। তুমি অজ্ঞানরূপা মহারাত্রি। অনাত্মপ্রত্যয়রূপা অবিদ্যা। তুমি আবার পরমা সুমহতী ব্রহ্মবিদ্যা।

তুমি মেধা, ধারণাবতী বুদ্ধি। তুমি সরস্বতী, শুদ্ধজ্ঞানবাসিনী অখিলবিদ্যা। তুমি বরা, অভয়পদপ্রদা। তুমি সাত্ত্বিকী, তুমি রাজসী, তুমি তমোভূতা। তুমি নিয়তা, নিশ্চয়াত্মিকা।

তুমি সর্বস্বরূপা সর্বেশা। সর্বশক্তিসমন্বিতা। তুমি আমাদের ভয় থেকে ত্রাণ করো। ত্রাণ করো জন্মমৃত্যুপীড়িত অল্পজ্ঞতা থেকে। হরণ করো আমাদের জীবত্বের দুর্গতি।

তোমার লোচনত্রয়ভূষিত সৌম্য মুখমণ্ডল আমাদের সর্বভূত থেকে রক্ষা করুক। রক্ষা করুক জড়ত্বের শাসন থেকে। তুমিই তো জড়ত্ববাসিনী চৈতন্যশিখা।

তোমার জ্বালাকরাল ত্রিশূল আমাদের রক্ষা করুক। রক্ষা করুক তোমার জগৎ-পরিপূরণী আনন্দিনী ঘণ্টাধ্বনি। রক্ষা করুক অসুররক্তপঙ্কলিপ্ত তোমার করোজ্জ্বল খড়্গ। রক্ষা করুক ভয় থেকে পাপ থেকে বদ্ধতা থেকে।

তুষ্ট হয়ে তোমার রোগনাশন, রুষ্ট হয়ে তোমার রোগশাসন। তোমার তুষ্টি-রুষ্টি দুই-ই তোমার মঙ্গলস্পর্শ। তোমার তুষ্টিতে অভীষ্টপূর্তি রুষ্টিতে অভীষ্টবিলয়। কখনো সঞ্চিত করো কখনো বঞ্চিত করো। কিন্তু যে তোমাকে আশ্রয় করেছে তার আর কিসের ভয়, কিসের অভাব।

মা, তুমিই মমত্বগর্তে বিবেকদীপ। তুমিই বিভ্রান্ত হয়ে অনুসন্ধান করছ নিজেকে। আবার ভ্রান্তিও যে তুমি। আবার উদ্ভাসিনী উন্মুক্তিও তুমি। অনেকরূপে আত্ম-মূর্তিকে বহুধা করে পরিব্যাপিনী হয়ে আছ। রূপে-রূপে প্রতিরূপা হয়ে আছ! কান্যা? তুমি ছাড়া আর কে আছে? বহু হয়েও তোমার একত্ব অক্ষুণ্ণ। অনন্ত আধারে তুমিই একাধেয়া। যেমন অজ্ঞানে তেমনি অধ্যবসায়ে। যেমন অন্ধকারে তেমনি বিধূম পাবকে। কা ত্বদন্যা? আর কে আছে তুমি ছাড়া? তুমি সর্বজীবসম্মোহিনী শর্বরী। তুমিই আবার সর্বভূতহিতৈষিণী জ্যোতির্গঙ্গা।

'দ্বিতীয়াকা মমাপরা' আমার দ্বিতীয় কোথায়!

আমিই স্পন্দনাত্মিকা নিত্যপ্রবৃত্তিমতী শক্তি। আমিই প্রবুদ্ধসলিলা বেগবতী স্রোতস্বতী। আমিই লোকবরদা বিশ্বেশবন্দ্যা।

ঠাকুর বলছেন মাস্টারকে। 'আর বিচার কোরো না। আমি রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে-কেঁদে বেড়াতাম আর বলতাম, মা, বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।'

বলছেন আবার মাস্টারকে। 'ভোগের লুচি বেড়ালকে খাইয়েছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন, বেড়াল পর্যন্ত।'
'কিছু হল না তাতে?'
'খাজাঞ্চি সেজবাবুর কাছে চিঠি পাঠালে, অনাচারের শাসন করতে। সেজবাবু লিখলে, উনি যা করেন তাতে কিছু বলতে যেও না।'
আহা কত রূপে মাকে দেখলাম। কত বেশে কত বয়সে।
'কাল মাকে দেখলাম।' ঠাকুর বলছেন প্রাণকৃষ্ণকে, 'গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নেই জামাতে। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন।'
শুধু ভাব-ভক্তিতে দর্শন। ভাবতে-ভাবতে প্রেমের চক্ষু হয়ে যায়। সেই চক্ষুতেই মায়ের আবির্ভাব।
হলধারী কি তা মানত? বলত, তিনি তোমার ভাবের জন্যে বসে আছেন আর কি। তিনি ভাব-অভাবের অতীত।
'আমি তখন মাকে গিয়ে বললাম, মা, হলধারীর কথাই কি ঠিক? তাহলে তোমার এই রূপ-টুপ সব মিথ্যে? মা তখন রতির মা'র বেশে দেখা দিলেন।'
'কে রতির মা?'
'লালাবাবুর রানী কাত্যায়নীর মোসায়েব। গোঁড়া বৈষ্ণবী। কিন্তু বড় একঘেয়ে।'
'রতির মা'র বেশে দেখা দিয়ে মা কি বললেন?'
'বললেন তুই ভাব নিয়েই থাক।'
কিন্তু আমরা সংসারীরা, আছি অভাব নিয়ে।
ঠাকুর বললেন, 'অভাবও পথ। ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ।'
মা, আমার হাত ধরে নিয়ে যাও। ঠাকুর হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাঁদছেন মায়ের জন্যে। আমি ছোট ছেলে, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে চলতে পারছি না। তুমি এগিয়ে এসে আমাকে ধরো। আমাকে কোলে করে নিয়ে যাও। যে পথ দিয়েই হাঁটি না কেন তোমার কোলটুকুই আমার শেষ পৈঁঠা।
'কারণানন্দরূপিণি, মা, বলো, আমি খাব না তুমি খাবে?'

এ সংসারে ডরি কারে
রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর
খাস তালুকে বসত করি।
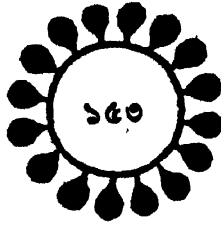
ঠাকুরের ব্যাধির তৃতীয় কারণ কি?

নিজের দিকে ইংগিত করে বলছেন, 'এর ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হল দেখলাম জ্যোতিতে দেহ জ্বলজ্বল করছে। বুক লাল হয়ে গেছে। মাকে বললাম, মা, বাইরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও, ঢুকে যাও। তাইতে এখন এই হীন-দেহ।'

নইলে কি হত?

'নইলে সেই জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোক জ্বালাতন করত। সর্বক্ষণ ভিড় লেগে থাকত। সামলানো যেত না। তিষ্ঠোতে দিত না এক মুহূর্ত।'

এখন কি হচ্ছে?

রূপের প্রকাশ নেই দেখে আগাছারা পালিয়ে যাচ্ছে। বলাবলি করছে, এই অবতার? এ তো আমাদের মতই সামান্য সাধারণ। আমাদের মতই ভুগছে অসুখে, অপ্রতিকার্য যন্ত্রণায়। তবে এ আর আমাদের কী মনস্কামনা পূরণ করবে। নিজের ব্যাধি সারাতে পারে না আমাদের কোন ব্যাধির নিরসন করবে। চলো ফিরে যাই। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি করব! দেখেছ? শরীর কেমন হয়ে গিয়েছে ভুগে-ভুগে! এতই যখন ভুগছে, শরীরের যখন এই হাল, তখন একজন সাধারণ সাধুর সঙ্গে তফাত কি!

'এই ব্যারাম হয়েছে কেন? এর মানেই ঐ।' বললেন ঠাকুর, 'যাদের সকাম ভক্তি তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে। যারা শুদ্ধ ভক্ত, যারা আমাকে অহেতুক ভালোবাসে তারাই লেগে থাকবে, তারাই টিঁকে থাকবে। আগাছার দল শুকিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল ব্যাঙের ছাতা।'

সেইখানেই তো তুমি অবতার। এই সাধারণত্বেই তো তুমি অসাধারণ। তুমি আর-আরদের মত ঐশ্বর্য নিয়ে আসোনি এবার। না রাজসম্পদ না বা শাস্ত্রব্যাকরণ। না বা রূপবল স্বাস্থ্যশক্তি। একটা সিদ্ধাই পর্যন্ত দেখালে না। ছদ্মবেশ ধরে এলে। পাঁচজনের একজন হয়ে রইলে। আমাদের ছেড়ে চলে গেলে না বনে-পর্বতে, মঠে-মন্দিরে, বিদেশে-বিভুঁয়ে। আমাদের মাঝখানেই বাসা বাঁধলে। নিরীহের মত, নিরা-ভরণের মত। আমাদেরই মত দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত রইলে। দুঃখ-কষ্টের পাশ কাটিয়ে চলে গেলে না। ইচ্ছামৃত্যু ঘটালে না। সমাধি অবস্থায় দেহ ছাড়লে না। শূন্যে মিলিয়ে গেলে না হাওয়া হয়ে। তিল-তিল করে ভুগলে, তিল-তিল করে জীর্ণ করলে দেহ। কেন? শুধু এই আশ্বাস দিতে যে তুমি আমাদেরই একজন। আমাদের রোগে

শোকে দুঃখে কষ্টে যদি কেউ পাশে দাঁড়াবার থাকে সে তুমি। তুমিই সাহস তুমিই উৎসাহ। এই বোঝাতে যে দুঃখকষ্টও ঈশ্বরের অভিপ্রায়, আর এই দুঃখকষ্টের মধ্যেও আমি অপাপ, অকলঙ্ক। 'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন, তুমি আনন্দে থাকো।'

'শরীরের রোগ হলে বোধ হয় আমার রোগ হয়েছে।' হীরানন্দকে বললেন ঠাকুর। 'কিন্তু আমাকে কে ছোঁয়? ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না।'

হীরানন্দ সিন্ধী, কলকাতার কলেজে পড়ে বি-এ পাশ করেছে। কিন্তু ভক্ত। সবচেয়ে বড় কথা—শান্ত। আর কথা যেন মধুমাখা।

হীরানন্দ জিগগেস করলে, 'ভক্তের এত দুঃখ কেন?'

নরেনের কি হল, হঠাৎ জ্বলে উঠল। বললে, 'দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা মনে হয় এক শয়তান। আমি যদি হতুম তা হলে এর চেয়ে ঢের-ঢের ভালো জিনিস তৈরি করতুম।'

'কেন? দুঃখ আছে বলে?' হীরানন্দ বললে, 'দুঃখ না থাকলে সুখবোধ কোথায়? অন্ধকার না থাকলে কে আর আলোকে অভ্যর্থনা করত? বিরহ ছিল বলেই তো মিলন এত স্পৃহণীয়। অন্যায় যদি না থাকত তা হলে কে দিত সুবিচারের মর্যাদা?'

সবাই ভালো সর্বত্রই ন্যায় এই নিষ্প্রাণ সমতলতা জীবনের বৃদ্ধির পথে অভিশাপ। নিচুটি ছিল বলেই তো উঁচুর মাথা-উঁচু। মন্দটি ছিল বলেই তো ভালোর জন্যে এত প্রসার প্রচেষ্টা। যদি জন্ম থেকেই ভালো থাকতাম তাহলে আর বড় হতাম কি করে? যদি না পড়তাম কি করে আসত তবে ওঠবার সঙ্কল্প? মৃত্যু ছিল বলেই তো অমৃতের প্রতি অভিসার। সে জন্যেই তো অমৃতলোক থেকে মৃত্তিকালোক এত মধুর। দেবতার চেয়েও মানুষ বড়।

সীতা অযোধ্যায় ফিরে আসবার পথে রামকে নালিশ করলে, 'কেন এত সব ভাঙা বাড়ি? কেন সব সমান সুন্দর নয়?'

রাম বললে, 'সব বাড়িই যদি সুন্দর হয় তাহলে মিস্ত্রিরা কি করবে?'

ঠাকুর সেই মিস্ত্রি। সবাই যদি সৎ ও ধার্মিক হয়, লেশমাত্র গ্লানি ও ম্লানতা কোথাও না থাকে, তাহলে তো আসেন না অবতার। তাহলে তো পেতাম না ঠাকুরকে। নয়ন-মনোহরকে। সংশয়-ক্লেশনাশনকে। কি করে হত তবে পরমতম সুহৃদসাক্ষাৎ? কোথায় তবে পেতাম জীবনের সংক্ষিপ্ত ও সারতম উত্তর? মহাবিরাট থেকে ক্ষুদ্র কীটাণু সবই যে এক অভিব্যক্তি কোথায় তবে পেতাম সেই বিশ্বাসের অকার্পণ্য? সব পথেই যে সেই গতিসত্তম, সেই অখণ্ডমণ্ডন, কে দিত এই শুভদৃষ্টি? কার এত মধুমুক্ষিত কথা, বেদানুসারিণী শোকবিনাশিনী বাণী? কে তেজের আকর, সত্যের আশ্রয়, বলের আধার, ধর্মের আয়তন? কে আমার সতৃষ্ণ নয়নের তৃপ্তি, আমার প্রাণবহনের সমীরণ!

আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে। তমসার তীর থেকে জ্যোতির নির্মল তীর্থে।

অমৃতত্বের ধারয়িতাই এই শরীর।
'দেহ ধরেছি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করব বলে।' বললেন ঠাকুর। 'আর এই বুঝব বলে, শরীরটা দুদিনের জন্যে, এই আছে এই নেই, সত্য শুধু ঈশ্বর।'
সব রকম রাগিণী বাজিয়ে যাব। সব রকম স্পর্শের আস্বাদ নিয়ে যাব তাঁর হাত থেকে। কখনো তাঁর রুদ্রতেজ কখনো বা বরাভয়। ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার কোলে নিচ্ছেন হাত বাড়িয়ে। বিচ্ছেদ-পারাবারের পারে নির্মিত করে রেখেছেন আবার মিলন-নিকেতন। কামকণ্টকের বৃন্তে ফোটাচ্ছেন প্রেমপ্রসূন।
'শরীর এই আছে এই নেই, তাই তাঁকে তাড়াতাড়ি ডেকে নাও।' বললেন ঠাকুর, 'আলোটি নিবতে না নিবতে দেখে নাও তাঁর মুখখানি।'
চোখের পাতাটি খোলো। আলোকে-অন্ধকারে দেখ সেই আনন্দমুখ।
'শরীরটা যেন বাখারি-সাজানো কাপড়মোড়া, সেইটে নড়ছে।' বললেন ঠাকুর, 'কিন্তু ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে।'
ভিতরে একজন আছে বলেই এত আশ্চর্য ব্যাপার! নেপথ্যে একজন রয়েছে বলেই এত রঙ্গলীলা। আমাকে ধরে রেখেছে কে? পৃথিবী। পৃথিবীকে ধরে রেখেছে কে? আকাশ। আকাশকে ধরে রেখেছে কে? কেউ জানে না। আর আকাশে কি একটা সূর্য, একটা চন্দ্র, একটা ধ্রুবতারা? আকাশে নক্ষত্র-পরমাণুপুঞ্জ। কত সেই অমেয় স্থান যাতে অগণন আশ্রয় পেয়েছে। আর সবই কিনা ঘুরছে একটি সুশৃঙ্খল সুষমায়। একটি সুকেন্দ্রিত ছন্দে। সেই সর্বাকর্ষণের কেন্দ্র কে?
সেই কেন্দ্রই আবার বিরাজ করছে আমার হৃদয়ের মধ্যে। আমার শরীরকে বেঁধে রাখতে চাইছে একটি ছন্দের বিধানে।
'শরীরটা যেন হাঁড়ি, মন-বুদ্ধি জল।' বলছেন ঠাকুর, 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি আলু-পটল। আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি।'
'কিন্তু অবতারের বেলায়?'
'অবতারেরও দেহ-বুদ্ধি আছে।' বললেন ঠাকুর, 'শরীর ধরলেই মায়া। সীতার জন্যে রামও কেঁদেছিলেন, ধনুর্বাণ তুলতে পারেননি। তবে অবতারে জীবে প্রভেদ আছে। প্রকাশের প্রভেদ।'
বেলঘরের গোবিন্দ মুখুজ্জে এসেছে। বললে, 'কি রকম?'
'অবতার ইচ্ছে করে নিজের চোখ কাপড়ে বাঁধে। ঐ যে ছেলেরা কানামাছি খেলে—দেখবি? তেমনি। কিন্তু মা ডাকলেই খেলা থামায়।'
'আর জীব?'
'তার অন্য কথা। তার যে কাপড়ে চোখ বাঁধা সেই কাপড়ের পিঠে আটটা ইস্ক্রুপ আঁটা। সেই আট ইস্ক্রুপের নাম অষ্টপাশ। গুরু না খুলে দিলে উপায় নেই।'
আবার বললেন, 'ভগবান অবতার হয়ে আসেন কেন? প্রেম-ভক্তি শেখাবার জন্যে। ঈশ্বরের অনন্ত লীলা। অত আমার দরকার কি? আমার দরকার প্রেম-ভক্তি। আমার দরকার ক্ষীর। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর। অবতার গাভীর বাঁট।'
কিন্তু অবতারেও দেহবোধ আছে।

কে একজন যুবক এসে জিগগেস করলে, 'মশায়, কাম কি করে যায়?'
ঠাকুর বললেন, 'একটু কাম-ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না। তাই তোমরা কেবল তা কমাবার চেষ্টা করবে।'
'কি করে কমাব?'
'শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। বহিঃ শিব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল।'
শ্রীশ্রীমাকে একজন জিগগেস করলে, 'মা, মন বড় চঞ্চল। কিছুতেই ঠিক হয় না।'
মা বললেন, 'ভয় কি, শুধু তাঁর নাম করো। যেমন ঝড়ে মেঘ উড়িয়ে নেয়, তেমনি তাঁর নামে বিষয়-মেঘ কেটে যাবে!'
'কিন্তু মা, কাম যে যায় না?'
'কাম কি একেবারে যায় গা? শরীর থাকলেই কিছু না কিছু থাকে।' মা বললেন অভয়শান্ত মুখে, 'তবে কি জানো, তাঁর নাম করো, দেখবে সাপের মাথায় ধুলোপড়া পড়লে যেমনটি হয় তেমনটি হয়ে যাবে।'
সেই লোকটি আবার জিগগেস করল ঠাকুরকে, 'এত চেষ্টা করি, তবু মাঝে-মাঝে মনে কুচিন্তা আসে।'
'আসুক না।' বললেন ঠাকুর। 'ও নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? আসবে আবার চলে যাবে।' লোকটি অবাক হয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।
'ওরে ভগবানের দর্শন একবার না হলে কাম একেবারে যায় না। তা হলেও বা কি! শরীর যত দিন থাকে তত দিন একটু-আধটু থাকে। তবে কি জানিস? মাথা তুলতে পারে না! তুই কি মনে করিস আমারই একেবারে গেছে?'
যুবক মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।
'একবার মনে হয়েছিল কামটা সম্পূর্ণ জয় করেছি।' প্রসাদবদান্য মুখে ঠাকুর বলতে লাগলেন। 'বসে আছি পঞ্চবটীতে, হঠাৎ এমনি কামের তোড় এল যে সামলাতে পারি না। তখন ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে মাটিতে মুখ ঘষড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, মা, ভীষণ অন্যায় করেছি, অহঙ্কার করে ফেলেছি। আর নিজেকে কখনো ভাবব না কামজয়ী বলে। এত কাঁদবার পর তবে যায়।'
যুবকটির সন্নিহিত হলেন ঠাকুর। অন্তরঙ্গের মত বললেন, 'তোদের এখন যৌবনের বন্যা, তাই পাচ্ছিস না বাঁধ দিতে। বন্যা যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে? তবে তোকে বলি শোন, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'
'নয়?'
'না। ওগুলো শরীরের ধর্মে আসে যায়। মনে যদি কুভাব এসে পড়ে তাতে ঘাবড়াবি কেন? কি ভাব এল গেল নজরও দিবিনে। শুধু হরিনাম করবি আর প্রার্থনা করবি। দেখবি আস্তে-আস্তে সব বাঁধ মেনেছে। হজম ভালো আছে, আর উঠবে না মনের চোঁয়া ঢেঁকুর।'
একটি ভক্ত-মেয়ে মাকে বললে জাঁক করে, 'মা, আমার মনে খারাপ ভাব আসে না।'
মা তখুনি চমকে উঠলেন। বাধা দিয়ে বললেন, 'বোলো না, বোলো না, অমন কথা বলতে নেই।'

কখন দর্পনাশনের বজ্র উদ্যত হয়ে উঠবে বলা যায় না। সুতরাং শান্ত হও, দীনতা আনো, প্রার্থনা করো।

'মা গো, কি করে লাভ হবে ভগবান?' আর্ত হয়ে মেয়েটি জিগগেস করল মাকে। 'জপধ্যান সাধন আরাধনা—এ সবে?'

'কিছুতে না।' মায়ের স্বরটি গাঢ়।

'কিছুতে না?'

'কিছুতে না।' মায়ের স্বরটি দৃঢ়।

'কিছুতেই না?'

'কিছুতেই না।' মায়ের স্বরটি কঠিন-তীক্ষ্ণ।

'তবে কি হবে! কিসে হবে?' চারদিকে যেন আঁধার দেখল মেয়েটি।

'একমাত্র তাঁর কৃপাতে হবে।' সমস্ত গ্রন্থি মোচন করে দিলেন মা। বললেন, 'তাই বলে কি ধ্যানজপ করবে না? করবে। ধ্যানজপে মনের ময়লা কাটবে। মনের ময়লা না কাটলে কৃপার প্রসাদ ধরবে কি করে? যেমন ফুল নাড়তে-নাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে-ঘষতে গন্ধ বের হয় তেমনি ভগবানের আলোচনা করতে-করতে ভগবানের উদয় হয় চোখের সামনে।'

কৃপা—শুনতে অযৌক্তিক, কিন্তু আসলে একমাত্র যুক্তি—ঐ কৃপাই।

'তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হবার জো নেই।' বলছেন ঠাকুর, 'কামকাঞ্চনকে ঠিক-ঠিক মিথ্যে বলে বোধ হওয়া, এই জগৎ তিন কালেই অসৎ এর সম্যক ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়, নইলে যত সাধন-ভজন করই না, সব ফক্কিকার। মানুষের কতটুকু শক্তি? সে শক্তি দিয়ে কতটুকু সে চেষ্টা করবে, কতটুকুই বা আয়ত্ত করবে?'

'জ্ঞানভক্তি দুই-ই একসঙ্গে হতে পারে না?' জিগগেস করল মাস্টার।

'আধারের উপর নির্ভর করছে।' বললেন ঠাকুর, 'কোনো বাঁশের ফুটো বড়, কোনো বাঁশের ফুটো সরু। ঈশ্বরবস্তুর ধারণা কি সকল আধারে সম্ভব? এক সের ঘটিতে কি দু সের দুধ ধরবে?'

'কিন্তু যদি তাঁর কৃপা হয়?' মাস্টার উছলে উঠল। 'তিনি যদি কৃপা করেন তবে তো ছুঁচের মধ্য দিয়ে উটও চালাতে পারেন।'

ঠাকুর হাসলেন। 'কিন্তু কৃপা কি অমনি হয়?'

'অমনি হয় না?'

ঠাকুর আবার হাসলেন। 'ভিখিরি যদি পয়সা চায় দেওয়া যায়, কিন্তু যদি একেবারে রেল-ভাড়া চেয়ে বসে?'

মাস্টার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঠাকুরও স্তব্ধ। হঠাৎ আত্মগতের মত বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হতে পারে। তাঁর কৃপা হলে কারু-কারু আধারে দুই-ই হতে পারে। কেন পারবে না? তাঁর কৃপার কি দাড়ি-বেড়া আছে?'

তার দৃষ্টান্ত আর কে নরেন ছাড়া?

কুঠির উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, দেখা দে, ওরে আমার যে বড় সাধ, ভক্তের রাজা হব।

একে-একে সে সব লোকই জুটছে। যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার আসতেই হবে এখানে। শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী ভক্তের দল। নরেনের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হচ্ছে আজকাল। ছোট-নরেনের কুম্ভক সমাধি।

এমন কি ডাক্তার সরকারও বুঝি দলে ভিড়ল।

'কাল রাত তিনটের সময় তোমার জন্যে বড্ড ভেবেছিলুম।' ডাক্তারের গলা স্নেহ-সিক্ত।

'কেন বলো তো?'

'বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। ভয় হল তোমার ঘরের দোর-টোর সব খুলে রেখেছে না কি করেছে কে জানে!'

ঠাকুর বিহ্বল হয়ে উঠলেন। 'বলো কি গো!'

'আর না বলে করি কি! তোমাকে যে ভালোবেসে ফেলেছি। তোমাকে ছুঁয়ে-ধরে আমারও প্রায় সাধু হবার দশা।'

'উপায় নেই।' বললে মাস্টার। 'ঠাকুর একবার জাদুঘর দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, জানোয়ার ফসিল—পাথর হয়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বলে বসলেন, পাথরের সঙ্গে থেকে-থেকে পাথর হয়ে গেছে। তেমনি সাধুর কাছে থাকতে-থাকতে সাধু হয়ে যায়।'

'কিন্তু তোমার দেহটি টিঁকিয়ে রাখতে না পারলে কি করে দুদিন সঙ্গ করি?'

'কিন্তু সর্বক্ষণ দেখছি যে দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা। যেমন নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা শাঁস আলাদা তেমনি। যেমন খাপ আলাদা তলোয়ার আলাদা। তাই তো দেহের অসুখের জন্যে বলতে পারি না মাকে।'

'দেহটি থাকলেই তো মায়ের নামগুঞ্জন হবে।' ডাক্তার তদ্‌গতের মত বললে।

'তাই তো, সেবার আমার খুব অসুখ, কালীঘরে বসে আছি, কেন কে জানে, মা'র কাছে খুব প্রার্থনা করতে ইচ্ছে হল। নিজের হয়ে বলতে বাধল। হৃদের হয়ে বললাম। বললাম, মা, হৃদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথা বলতে। বলা আর শেষ হল না, চোখের কাছে দপ করে সেই জাদুঘরের ছবি ভেসে উঠল। মা-ই দেখিয়ে দিলেন। দেখিয়ে দিলেন তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ। আমি বললুম, মা, তোমার নামগান করে বেড়াব, দেহটা একটু তার দিয়ে এঁটে দাও।'

দেহের আর কাজ কি! ঈশ্বরের হাতের বীণা হও।

আমাকে তোমার হাতে তুলে নাও, ধুলো থেকে তুলে নাও, তোমার নন্দননিকুঞ্জ থেকে সুর এনে একে প্রাণময় করো, গীতময় করো, রসবর্ষণময় করো। তোমার নম্রনখস্পর্শে বধির অন্ধকারে আলোর পুলকিত তারকার কণিকাগুলি জ্বলে-জ্বলে উঠুক। হৃদয়হারা রুক্ষ পাথর গলে-গলে যাক অশ্রুর উদ্বেলতায়। আমাকে বেদনায় চেতনায় জর্জরিত করো। নবীন আঘাতের স্নানে নবজন্মের নির্মল আয়ু আনো জীবনে।

আর মনের কাজ কি? সপ্ততীর্থে উপনীত হও।

সত্যতীর্থ, ক্ষমাতীর্থ, দমতীর্থ, দয়াতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, তপতীর্থ আর তীর্থ প্রিয়-

বাদিতা। এই সপ্ততীর্থ মানসতীর্থ। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, পুরী আর দ্বারাবতী এই সপ্ত স্থানতীর্থে কি হবে, যদি মানসতীর্থে না অবগাহন করতে পারো! তীর্থফল হচ্ছে মনের নির্মলতা। মানসতীর্থে সেবা না করলে সেই ফলপ্রাপ্তি হবে কি করে? তোয়পূত দেহ দিয়ে কি হবে, তোয়পূত মন চাই। যার চিত্ত সুবিশুদ্ধ সেই যথার্থ স্নাত।

'তীর্থে গেলে কী হয়? আর কিছু হয় না, উদ্দীপন হয়।' বললেন ঠাকুর, 'মথুরবাবুর সঙ্গে সেই বৃন্দাবন গিয়েছিলাম না? কালীয়দমন ঘাট দেখামাত্রই উদ্দীপন হত, বিহ্বল হয়ে যেতাম। ছোট একটি ছেলের মতন করে হৃদে নাওয়াতো আমাকে। বৃন্দাবনের বেশ ভাব তাই না? নতুন যাত্রী এলে বৃন্দাবনের ব্রজবালকেরা কলরব করতে থাকে, হরি বোলো গাঁঠরি খোলো। হরি বোলো গাঁঠরি খোলো।'

ভাবের নদীতে উজান এসেছে। নৌকো ছাড়ো। পাল তুলে দাও। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে এতদিন গাঁঠরি-বোঁচকা বেঁধেছ সেই বস্ত্রখণ্ড খুলে নিয়ে পাল টানাও। আর ভাবনা নেই, হাততালি দাও আর গান গাও।

'অবতার যখন আসে সাধারণ লোকে জানতে পারে না।' বললেন ঠাকুর, 'অবতারকে চিনতেও সাধন লাগে। সেই হীরের দর যাচাই করতে পাঠিয়েছিল বেগুনওয়ালার কাছে। বেগুনওয়ালা বললে, বড়জোর ন সের বেগুন দিতে পারি, তা এও বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। পরে গেল কাপড়ওয়ালার কাছে। কাপড়ওয়ালার পুঁজি বেশি, সে বললে, নশো টাকা। হাজার টাকা দাও তো ছেড়ে দিয়ে যাই। ওরে বাবা, বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি বলে ফেলেছি। এবার চলো খাঁটি জহুরির কাছে। জহুরি এক পলক দেখেই লাফিয়ে উঠল। বললে, এক লাখ টাকা দেব। যার যেমন পুঁজি তার তেমন দর।'

জহুরির চোখ চাই। চাই জ্ঞানপ্রেমের চক্ষু।

'অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা মেটে কই? অবতার ফাঁকা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, কোথাও বদ্ধ হয় না বন্দী হয় না।' বলছেন ঠাকুর, 'অবতারের আমি পাতলা আমি। বলতে পারো ফোকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের দুই দিকেই অনন্ত মাঠ। পাঁচিলের যে দিকে দাঁড়াও সেই দিকেই দেখা যায় অনন্ত মাঠ। ফোকর দিয়ে এদিক ওদিক আনাগোনা করা যায়। এদিকে দেহধারণেও যোগ ওদিকে আবার দেহাতীত সমাধি।'

যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণ অনেক সব দেখালেন। গোলোক দেখালেন, দেখালেন অখণ্ড জ্যোতি। যশোদা বললেন, 'কৃষ্ণ রে, ও-সব কিছু দেখতে চাই না। তোর মানুষরূপ দেখা। আমার কোলে ওঠ, আমার বুকে আয়। আমি তোকে কোলে করব নাওয়াব-খাওয়াব।'

'তাই অবতারের শরীর থাকতে-থাকতেই তাঁর সেবা-পূজা করতে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'আর অবতারের উপর একবার ভালোবাসা এসে গেলেই হয়ে গেল।'

ভালোবাসা এলে কি হলে? নিশ্চিন্ত হলে।

সুজির পায়েস খেতে দিয়েছে ঠাকুরকে। কিন্তু খেতে-খেতে কাশি উঠল বুঝি। পুঁজ-রক্তমেশানো গয়ার ফেললেন সেই পায়সের বাটিতে।

ভক্তদের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'অবতার তো বলো, খেতে পারো এই উচ্ছিষ্ট পায়েস?'
খুব পারি। পায়েসের বাটি মুখে তুলল নরেন। এক চুমুকে খেয়ে ফেলল যা-কিছু ছিল সেই বাটিতে।
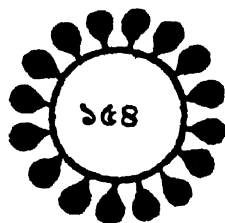
একমাত্র নরেনই পারে। নরেনই পারে সমস্ত হজম করতে।
সে একাধারে জাগ্রত বহ্নি আর তুহিন-তুষার। সেই পারে জ্বালিয়ে দিতে পুড়িয়ে দিতে, গলিয়ে দিতে তলিয়ে দিতে। সূর্যের দীপ্তি আর চন্দ্রের শৈত্য একসঙ্গে। একসঙ্গে অপ্রমেয় অপরাজিত জ্ঞান আর মাধুর্যধৈর্যসুভগা ভক্তি। এক দিকে মুরজ-ডিণ্ডিম-বাদ্য-বিলক্ষণ, অন্য দিকে মধুর-পঞ্চমনাদ-বিশারদ। নরেনই তো সেই ভস্ম-ভূষণ ভাস্বর কন্দর্প-দর্পনাশন শিব। ওই তো পারে সেই বিষ ধারণ করতে।
'যখন ও বুঝবে ও কে,' বললেন ঠাকুর, 'তখন দেহ ছেড়ে চলে যাবে।'
সেই আত্মনিরীক্ষণ করবার জন্যেই তো নরেন যেতে চায় সমাধিভূমিতে। ঠাকুর তাকে ঠেকিয়ে রাখেন। বলেন, চাবি রেখে দিলাম আমার হাতে, আমি না খুলে দিলে সেই বন্ধ ঘরে তুই ঢুকতে পাবিনে।
মনের সপ্তম ভূমিই সমাধি।
ঠাকুর সমাধির বিশ্লেষণ করছেন। প্রথম তিন ভূমি লিঙ্গ গুহ্য আর নাভি। যতক্ষণ মনের কামকাঞ্চনে আসক্তি ততক্ষণ এই তিন ভূমিতেই ঘোরাফেরা করে, কিছুতেই পারে না ঊর্ধ্বে উঠতে। কিন্তু যদি একবার ছাড়া পায় মন উঠে আসে চতুর্থভূমিতে, হৃদয়ে। তখন একটা আলো দেখে, নূতন দেশের আলো। অবাক হয়ে যায় এ আভা কোথায় ছিল, কোথায় ছিল এত অব্যক্ত ব্যঞ্জনা! তখন মন আর নিচে নামতে চায় না। বলে, দেখেছি ঢের দেখেছি তোমাদের জারিজুরি, তোমাদের চটুকে রঙ্গ। আর ও-সবে ভুলছিনে। আস্তে-আস্তে শেষে পঞ্চমভূমি, কণ্ঠে উঠে আসে। মন যার কণ্ঠে উঠেছে ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কথা বলতে বা শুনতে তার ভালো লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে সেখান থেকে উঠে যায়।
তার পর, ষষ্ঠভূমি?
ষষ্ঠভূমি কপাল। সেখানে গেলে মন নিরন্তর ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। কিন্তু

সর্বক্ষণ ধরি-ধরি করেও ধরতে পারে না সেই নিরুপমকে, নিরবদ্যকে। তখনও একটু থেকে যায় আমিত্বের পরদা। যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো বাইরে তার কাচের আবরণ। এই বুঝি ছুঁয়ে ফেললাম, আলিঙ্গন করলাম সেই দিব্যজ্যোতিকে, কিন্তু না, এখনো একটু বাধা আছে।

বাধা-ব্যবধান সব দূরে গিয়েছে, উড়ে গিয়েছে, সপ্তমভূমিতে। সেই ভূমিই সমাধি-ভূমি। তার স্থান শিরোদেশে। সেখানে উঠলেই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ। নিত্য আলিঙ্গন। সেই অবস্থায় একুশ দিনে মৃত্যু।

'কিন্তু এ সব জ্ঞানের পথ, কঠিন পথ।' বললেন ঠাকুর সংসারী ভক্তদের। 'তোমাদের ভক্তির পথ। ভালোবাসার পথ। ভালোবাসায় কি হয়? মন প্রাণ লীন হয়ে যায়। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা তেমনি নিষ্ঠা আনো ঈশ্বরে। সেই ভালোবাসার থেকেই ভাব হবে—ক্রমে মহাভাব।'

ভাব হলে কি হয়? মানুষ অবাক হয়ে যায়। বায়ু স্থির হয়, সেই বায়ু স্থির হওয়ার নামই কুম্ভক। বন্দুকের গুলি ছোঁড়বার সময় যে গুলি ছোঁড়ে সে বাক্‌শূন্য হয়, তার বায়ু স্থির হয়ে যায়। তেমনি প্রেমের জিনিসের প্রতি স্থিরলক্ষ্য হও, অমনিতেই যোগ হয়ে যাবে।

মা ঠাকরুণ বললেন, 'আমি একবার তারকেশ্বর যাব।'

'কেন?' ঠাকুর তাকালেন আকুল চোখে।

'সেখানে গিয়ে হত্যে দেব। বলো, যাব?'

'যেতে চাও তো যাও। কিন্তু কিছু কি হবে?'

কেন হবে না? একবার সিংহবাহিনীকে জাগিয়েছিলাম, এবার পারব না পশুপতির ঘুম ভাঙাতে? সেবার নিজের অসুখে এবার তোমার অসুখে। আর, তুমি তো জানো, তোমার অসুখেই আমার অসুখ।

হে তারকেশ্বর, জাগো, ত্রাণ করো।

তুমি কাশীতে বিশ্বনাথ, কৈলাসে কৈলাসেশ্বর। কামরূপে বৃষধ্বজ, মণিপুরে মহারুদ্র। হরিদ্বারে গঙ্গাধর, নেপালে পশুপতিনাথ। চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়, নর্মদায় বাণলিঙ্গ। উৎকলে জগন্নাথ, নীলাচলে ভুবনেশ্বর। সেতুবন্ধে রামেশ্বর, পুষ্করে পুরুষোত্তম। ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ আর রাঢ়ে তারকেশ্বর।

যাচ্ছ যে, পারবে জাগাতে?

কেন পারব না? সাবিত্রী পারেনি?

সত্যবান বললে, সাবিত্রি, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, ইচ্ছে করছে ঘুমুই।

সাবিত্রী মাটিতে বসে পড়ল। স্বামীর মাথা কোলে টেনে নিল। খানিক পরেই দেখতে পেল কে একজন রক্তবসন রক্তনয়ন পুরুষ তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্যামবর্ণ, বদ্ধমৌলি, সাক্ষাৎ সূর্যের মত তেজস্বী।

আস্তে-আস্তে স্বামীর মাথা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সাবিত্রী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। কম্প্রবক্ষে হাত জোড় করে বললে, 'আপনাকে দেবতা বলে মনে হচ্ছে। সত্যি, আপনি কে, কেন এসেছেন?'

'সাবিত্রি, তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠানসম্পন্না,' বললে সেই অভ্যাগত, 'তাই তোমাকে আত্মপরিচয় দিচ্ছি। শোনো, আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে। এই দেখ, আমার হাতে পাশ। আমি তাকে এই পাশে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আপনার অনুচরদের না পাঠিয়ে আপনি নিজে এসেছেন কেন?' সাবিত্রী এতটুকু ভয় পেল না।

'তোমার স্বামী পরমধার্মিক, রূপবান, গুণসাগর। তাই দূত না পাঠিয়ে আমি নিজে এসেছি।' এই বলে যম সত্যবানের দেহের মধ্য থেকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে পাশ-বন্ধ করে সবলে আকর্ষণ করে নিষ্কাশিত করল। মুহূর্তে সত্যবানের দেহ শ্বাসহীন, প্রভাহীন, চেষ্টাহীন হয়ে গেল।

যম চলল দক্ষিণ দিকে।

ব্রতসিদ্ধা সাবিত্রী দুঃখার্তচিত্তে চলল তার পিছু-পিছু।

কৃতান্ত বললে, 'এ কি, তুমি চলেছ কোথায়? তুমি ফিরে যাও, তোমার স্বামীর পারলৌকিক কাজ সমাধা কর। তুমি তোমার ভর্তার ঋণ শোধ করেছ, তোমার আর ভয় কি?'

'স্বামী যে স্থানে নীত হন বা স্বয়ং যেখানে যান সেখানে স্ত্রীরও গতি, এই নিত্যধর্ম। তপস্যা গুরুভক্তি, ভর্তৃস্নেহ ও ব্রতবলে ও সবার উপরে আপনার প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত। আপনার সঙ্গে সপ্তপদ ভ্রমণ করা হয়ে গিয়েছে, তাই আপনি আমার মিত্র। সেই মিত্রভাব থেকে আপনাকে যা বলছি শুনুন। গার্হস্থ্য ধর্মই সর্বধর্মের প্রধান। পতিহীনা হয়ে বনে বাস করে আমি কি করে সেই ধর্মাচরণ করব?'

'অনিন্দিতে, তোমার সুব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও।' যম ফিরে দাঁড়াল। 'সত্যবানের জীবন ছাড়া যা চাইবে তাই পাবে। বর নিয়ে ফিরে যাও।'

'আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হয়ে অরণ্যবাসী হয়েছেন। আপনি তাঁকে চোখ দিন। চোখ পেয়ে অগ্নি আর দিবাকরের মত তিনি বলবান হোন।'

'তথাস্তু। এবার তবে নিবৃত্ত হও।' যম বললে, 'তুমি পথশ্রান্ত হয়েছ। আরো যাবে তো আরো তোমার ক্লান্তি বাড়বে।'

'আমি যখন আমার স্বামীর কাছে-কাছে আছি তখন আর আমার ক্লান্তি কি? যেখানে তিনি যাবেন আমিও সেইখানে যাব! তিনিই আমার যাত্রা, তিনিই আমার গতি। সুতরাং আমার জন্যে চিন্তা করবেন না, দিগন্তরেখা উত্তীর্ণ হয়ে আমি হেঁটে যাব। তা ছাড়া আপনার মত সজ্জনসঙ্গ পাব কোথায়? সাধু ব্যক্তির সঙ্গে কিঞ্চিৎ সমাগমেই মিত্রতা, তাই সাধুসমাগমও কখনো নিষ্ফল হয় না। তারই জন্যে সাধুসংসর্গেই বাস করা বিধেয়।'

যম উৎসাহিত হল। বললে, 'ভামিনি, তোমার বাক্যবিন্যাস হৃদয়রঞ্জন, হিতকর ও বুধগণেরও বোধবর্ধন। তুমি আরেক বর, দ্বিতীয় বর চাও। সত্যবানের জীবন ছাড়া যে কোনো প্রার্থনা।'

'আমার শ্বশুর তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পান ও তাঁর ধর্মে অবিচ্যুত থাকুন।' সাবিত্রী দ্বিতীয় বর চাইল।

'তথাস্তু।' যম দ্রুতক্ষেপে পা চালাল। 'কিন্তু এ কি, এখনো আসছ কেন? আর যে পারবে না চলতে, তোমার পা টলে-টলে পড়ছে।'

'পড়ুক।' যমকে থামতে দেখে সাবিত্রীও থামল। বললে, 'আপনারই নিয়মে জীবজগৎ নিগৃহীত, কর্মের নিয়মে আবার যার যা যাতায়াত। সর্বত্রই এই নিয়মের বিধান-শাসন। তাই আপনার যম-নাম সুবিখ্যাত! কিন্তু আমার আরো কথা শুনুন। কায়-মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ আর দান এই সাধুদের সনাতনধর্ম। শত্রু হলেও সে যখন মর্তের লোক তখন নিশ্চয়ই সে দুর্বল ও অল্পজীবী, তাই সাধুরা শত্রুদেরও দয়া করেন।'

'কি সুন্দর তোমার কথা সাবিত্রী!' যম গদগদ ভাষে বললে, 'যেন পিপাসিতের কাছে শীতল জল। তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া তৃতীয় বর যাচ্ঞা কর।'

'আমার পিতার পুত্র নেই, তাঁর যেন বংশকর শত পুত্র জন্মে, এই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।'

'তথাস্তু।' যম আবার চলতে শুরু করল। 'এবার তো তুমি কৃতকামা হলে, এখন প্রতিনিবৃত্ত হও। দেখ কত দূর পথে চলে এসেছ।'

'আমি যখন স্বামীর সন্নিধানে আছি তখন কোনো পথই আমার দূর পথ নয়।' সাবিত্রী স্নিগ্ধমুখে বললে, 'আমার মন দূরতর পথে ধাবমান। বেশ তো, আপনি চলতে-চলতেই আমার কথা শুনুন। আপনি বিবস্বানের পুত্র, তাই আপনি বৈবস্বত। প্রজাদের পক্ষপাতরহিত ধর্মশাসন করেন বলে আপনি ধর্মরাজ। সুতরাং আপনি সজ্জন। সজ্জনের উপর যেমন বিশ্বাস হয় তেমন নিজের উপরেও হয় না।'

'ভদ্রে, এমন চারুবাণী আর কোথাও শুনিনি।' যম হাত তুলল। 'সত্যবানের জীবন ছাড়া চতুর্থ বর প্রার্থনা করো।'

'সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্যশালী কুলবর্ধন এক শত পুত্র হোক—এই আমার চতুর্থ প্রার্থনা।' সাবিত্রী দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল।

'তথাস্তু। তোমার বলবীর্যবান আনন্দবর্ধন শত নন্দন হোক। এবার তবে প্রত্যাবর্তন করো।'

সাবিত্রী আবার যমকে অনুগমন করতে লাগল। বলতে লাগল, 'সাধুদের ধর্মবৃত্তি চিরকালই সমান। সাধুরা কখনো অবসন্ন হন না, ব্যথিত হন না, সাধুর সঙ্গে সাধুর সমাগম চিরকাল ফলান্বিত। সাধুরাই সত্য দ্বারা সূর্যকে চালিত করছেন, তপস্যা দ্বারা ধারণ করছেন পৃথিবীকে। পরস্পর অপেক্ষা না করে আর্যগণের পূজনীয় জ্ঞানেই চিরকাল পরোপকার করে থাকেন। তাঁদের প্রসাদ কখনো ব্যর্থ হয় না, তাঁদের কাছে কারু প্রার্থনা বা সম্মানের হানি হয় না। তাই সাধুরাই সকলের রক্ষাকর্তা।'

যম বললে, 'তোমার সুবিন্যস্ত ধর্মসংহত বাক্য যত শুনছি ততই তোমার প্রতি আমার ভক্তি উচ্ছলিত হচ্ছে। অতএব আবার তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা করো।'

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৪র্থ খণ্ড শ্রীশ্রীসারদামণি

'হে মানদ! আপনি আমাকে শতপুত্রের বর দিলেন কিন্তু আমার স্বামী কোথায়? আমি স্বামিবিনাকৃত সুখ, স্বামিবিনাকৃত স্বর্গ, স্বামিবিনাকৃত শ্রীর অভিলাষিণী নই। স্বামী ছাড়া জীবন আমার মৃত্যুতুল্য। সুতরাং আমাকে শতপুত্রতা বর দিয়ে কি করে নিয়ে যাচ্ছেন আমার স্বামীকে? অতএব আমার স্বামী জীবিত হোন, এই আমার পঞ্চম, আমার পরম প্রার্থনা।'

সানন্দচিত্তে যম বললে, 'তথাস্তু। কুলনন্দিনি, এই তোমার স্বামীকে পাশমুক্ত করে দিচ্ছি। ইনি নীরোগ, কৃতার্থ ও তোমাতে বশীভূত হয়ে চারশো বছর জীবিত থাকবেন আর যজ্ঞ ও ধর্ম দ্বারা খ্যাতিলাভ করে তোমাকে শত পুত্রের জননী করবেন। এবার যাও, স্বামীর কাছে ফিরে যাও।'

দ্রুত পায়ে সাবিত্রী ফিরে গেল, যেখানে তার স্বামীর মৃত কলেবর পড়ে আছে। ভূমি-নিপতিত ভর্তাকে আলিঙ্গন করে তার মাথা নিজের কোলের উপর নিয়ে বসল। সত্যবান চোখ খুলে সপ্রেমে তাকাল সাবিত্রীর দিকে, প্রবাসাগত লোক যেমন তাকায় তার প্রণয়িনীর দিকে। বললে, 'কি কষ্ট। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, আমাকে জাগাওনি কেন এতক্ষণ? যিনি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ কোথায়?'

'জীবিতনাথ,' সাবিত্রী আনন্দরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'যাঁর কথা জিগগেস করছ তিনি লোকসংহর্তা যম। তিনি এখন ফিরে গিয়েছেন স্বস্থানে। যদি শরীরে শক্তি ফিরে পেয়ে থাকো তো ওঠবার চেষ্টা করো। রাত ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে।'

সত্যবান উঠে বসল। সমুদায় দিক আর অরণ্যানী নিরীক্ষণ করতে লাগল। বললে, 'সুমধ্যমে, এখন বেশ মনে করতে পারছি। কাষ্ঠপাটন করতে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে। শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম, তোমার বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তারপর। তারপর স্বপ্ন কি সত্য কিছুই জানি না, ঘোরতিমিরবর্ণ মহাতেজা পুরুষকে দেখলাম। সে কে? যদি তুমি কিছু জানো তো বলো।'

'কাল বলব। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চল। তোমার মা বাবা উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন।'

'কিন্তু ভয়ঙ্কর বন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন। কি করে পথ দেখবে?'

'তবে থাক, আজকের রাত এখানে বসেই কাটিয়ে দিই। তুমি পীড়িত, দুর্বল, পথ চলতে অসমর্থ। ঐ দেখ, এখানে-ওখানে শুষ্ক তরু জ্বলছে, ওখান থেকে আগুন এনে কাঠ জ্বালাই, সে আগুনে তুমি তোমার শরীরগ্লানি অপনোদন করো।' সাবিত্রী উঠে পড়ল।

'না, না, এখানে রাত কাটাব না। মা-বাবার কাছে ফিরে যাব।' সত্যবান অস্থির হয়ে উঠল, 'এখনো বাড়ি ফিরিনি, না জানি কতই ব্যাকুল হয়েছেন আমার জন্যে। দুজনেই বৃদ্ধ হয়েছেন, তা ছাড়া আমার বাবা নয়নহীন। আমিই তাঁদের যষ্টিস্বরূপ। তাঁদের জীবনেই আমার জীবন। তাঁদের ভরণপোষণ ও প্রিয়ানুষ্ঠানই আমার একমাত্র ধর্ম।'

গুরুপ্রিয় ধর্মাত্মা সত্যবান পিতামাতার উদ্দেশে কাঁদতে লাগল। সাবিত্রী তার অশ্রু-

মার্জনা করে রাত্রির উদ্দেশে বললে, 'যদি আমি কোনো তপশ্চর্যা করে থাকি তা হলে হে শর্বরি, আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও স্বামীর পক্ষে কল্যাণকারিণী হও। আমি যে স্বৈর ব্যবহারেও কখনো মিথ্যা বলিনি, আজ সেই সত্য তাঁদের অবলম্বন হোক।'

'আমাকে শিগগির তাঁদের কাছে নিয়ে চল। যদি দেখি তাঁদের কিছু অমঙ্গল হয়েছে তা হলে এ জীবন আর রাখব না। আমি এখন সমর্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়েছি, বরারোহে, তুমি এখন ত্বরান্বিত হও।'

কেশপাশ দৃঢ়বন্ধ করে দু-বাহু দিয়ে সবলে স্বামীকে টেনে তুলল সাবিত্রী। ফলের থলে আর কাঠ কাটবার কুঠার তরুশাখায় ঝোলানো ছিল, তুলে নিল। নিজের কাঁধে সত্যবানের বাহু নিবেশিত করে দক্ষিণ হাতে তাকে আলিঙ্গন করে ধীরে-ধীরে এগুতে লাগল।

এগুতে লাগল মৃত্যুত্তীর্ণ হয়ে। নবাবির্ভাবের প্রাণলোকে।

ঠাকুর বললেন, 'এই তোর দুই দেবতা, মা আর বাবা। এদের ছেড়ে তুই কোথায় যাবি? কোন বনে, কিসের সন্ধানে?'

'বাবা-মা কত বড় গুরু।' আবার বললেন ঠাকুর। 'রাখাল আবার জিগগেস করে যে, বাবার পাতে কি খাব? আমি বলি সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে বাবার পাতে খাবি না? তবে কি জানো? যারা সৎ তারা উচ্ছিষ্ট কাউকে দেয় না। এমন কি কুকুরকেও না।'

রাম এসে নালিশ করল ঠাকুরের কাছে। 'বাবা গোল্লায় গেছেন।'

বাবার অপরাধ দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন।

'শুনলে?' ঠাকুর ভক্তদের দিকে তাকালেন। 'বাবা গোল্লায় গেছেন আর উনি ভালো আছেন।'

বিমাতার এখন বয়স হয়েছে তবু রামের রাগ পড়েনি। বলে, 'একটা না একটা অশান্তি লেগেই আছে। বলি, বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকুন, তা নয়!'

'তোমার স্ত্রীকেও অমনিধারা বাপের বাড়িতে থাকতে বলো না।' কে একজন টিটকিরি দিয়ে উঠল।

'এ কি হাঁড়ি-কলসী গা?' ঠাকুর সহাস্য প্রতিবাদ করলেন : 'হাঁড়ি এক জায়গায় সরা আরেক জায়গায়? এ যে শিবশক্তি। এদের তো একত্র স্থিতি। বেশ তো, বাপের বাড়ি কেন, আলাদা বাড়ি করে দাও না। মাস-মাস খরচ দেবে।'

'কিন্তু বাপ-মা যদি কোনো গুরুতর অপরাধ করেন, তাহলেও কি তাঁদের ত্যাগ করা যাবে না?' কে আরেকজন জিগগেস করল।

'কখনো না। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না মাকে।' ঠাকুর বললেন, 'গুরু-পত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে শিষ্যরা বললে, ওঁর ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বললুম, সে কি গো? ওলকে ছেড়ে ওলের মুখী নেবে! নষ্ট হল তো কি হল! তুমি তাঁকেই ইষ্ট বলে জেনো।'

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

'মা-বাপ কি কম জিনিস গা?' বললেন আবার ঠাকুর। 'তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম-টর্ম

কিছুই হয় না। যেই বাবা-মা মানুষ করল, তাদের ফাঁকি দিয়ে ছেলে-মাগ নিয়ে যে বেরিয়ে আসে, হলই বা না বাউল-বৈষ্ণবী, আমি বলি ধিক।'

প্রাণ ফিরে পেয়েই সত্যবান চলল তাই তার গৃহে, তার বাপ-মা'র কাছে। তার যুগ্ম-দেবতা দর্শনে। কিন্তু প্রাণ ফিরে পেল কার তপস্যায়? কে সে মহীয়সী, কৃতান্ত-নিবৃত্তিনী?

দুদিন নিরম্বু উপবাসে কাটালেন শ্রীমা। তারকেশ্বর মুখ তুলে চাইল না। তবু ছাড়ব না তোমার চৌকাঠ। ঠায় পড়ে রইলেন। তাঁর ব্যাধি সারিয়ে দাও। তাঁকে অক্লেশ-অব্রণ করো।

তৃতীয় দিনের মধ্যরাত্রে, হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন শ্রীমা, হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলেন। যেন পর-পর বসানো আছে মাটির হাঁড়ি, তা যেন একটার পর একটা কে লাঠির বাড়ি মেরে ভেঙে দিচ্ছে। ঐ শব্দে জেগে উঠলেন শ্রীমা। কই, কিছু নেই তো! এর তবে মানে কি?

হৃদয়ের গভীরে উত্তর পেলেন শ্রীমা। এ জগতে কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? যিনি গড়বার গড়েছেন, যিনি ভাঙবার ভাঙবেন। সব সেই কামারের দোকানের হাঁড়িকুঁড়ি! মায়ার মেঘ সরে গেল এক মুহূর্তে। যা হবার হবে যা করবার করবেন, আমি কেন আত্মহত্যা করি! আমার আত্মনিধন নয়, আত্মনিবেদন।

অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে মন্দিরের পিছনে এসে পেঁছিুলেন। হাতড়ে-হাতড়ে পেলেন স্নানকুণ্ড। অঞ্জলি করে জল তুললেন। পিপাসায় কণ্ঠ কাঠ হয়ে আছে। তাই দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করলেন। দেহে যেন একটু বল এল। হ্যাঁ, এবার ফিরতে পারবেন কাশীপুর।

'দু-ভাই রামলক্ষ্মণ সশরীরে লঙ্কায় যাবে ঠিক করেছে।' ঠাকুর গল্প বলছেন। 'কিন্তু সামনে সমুদ্র, দুষ্পার বাধা। লক্ষ্মণের ভীষণ রাগ হয়ে গেল। কি, এত বড় কথা? সমুদ্র আমাদের বাধা দেবে? ধনুর্বাণ উত্তোলন করল। বললে, বরুণকে এক্ষুনি বধ করব। রাম তাকে বুঝিয়ে বললে, ভাই লক্ষ্মণ, চোখের সামনে যা দেখছ সব মায়া, স্বপ্নবৎ। সমুদ্রও মায়া, তোমার রাগও মায়া। একটা মায়া দিয়ে আরেকটা মায়ার বিনাশ করবে, সেটাও মায়া।'

সেই নহবৎখানার সাধুর কথা মনে নেই? কারু সঙ্গে কথা কইত না, শুধু এক মনে ঈশ্বরের ধ্যান করত। একদিন হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ এল আর দেখতে-দেখতে সর্বনাশা ঝড় এল হুড়মুড় করে। ঝড়ে উড়িয়ে নিল মেঘ। দেখা গেল আবার সেই আকাশ-ভরা রোদের ঝিকিমিকি। সাধু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় নাচতে শুরু করল। হাততালি দিতে লাগল আনন্দে।

ঠাকুর বললেন, 'আমি তাকে জিগগেস করলুম, তুমি ঘরের মধ্যে চুপচাপ থাক, হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এসে আনন্দে নৃত্য করছ কেন? তোমার হল কি?'

হল কি! সাধু বললে, মায়ার খেলা হল। চোখের সামনে মায়ার খেলা দেখলুম। এই দিব্যি পরিষ্কার আকাশ ছিল, হঠাৎ কালো মেঘে ছেয়ে গেল দিকদিগন্ত। কোত্থেকে ঝড় এসে উড়িয়ে নিল মেঘ। আবার সেই পরিষ্কার আকাশ।

মায়া শব্দের আসল অর্থ কি? আসল অর্থ হচ্ছে ভগবদিচ্ছা।

শ্রীমা ম্লান মুখে ঠাকুরের পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুর উৎসুক হয়ে জিগগেস করলেন, 'কি গো, কিছু হল?' পরে বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন, 'কিছুই হবার নয়।'

জানো? আমিও সেদিন স্বপ্ন দেখলাম ওষুধ আনতে হাতি গেল। মাটির নিচে ওষুধ পোঁতা, মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে হাতি। দিব্যি খুঁড়ছে, ওষুধ এই বেরুলো বলে, এমনি সময় গোপাল এসে ঘুম ভেঙে দিল।

'আচ্ছা, তুমি স্বপ্নটপ্ন দেখ?' ঠাকুর জিগগেস করলেন শ্রীমাকে।

'সেদিন দেখেছিলাম।'

'কি দেখলে?'

'দেখলাম কালী-মা দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর ঘাড় কাত।'

'মাকে কিছু জিগগেস করলে?'

'বললাম, মা তোমার ঘাড় কাত কেন?'

'মা কি বললেন?'

'বললেন, আমার গলায় ঘা।'

'কিছু বুঝলে?'

স্থির নয়নে প্রশান্ত আস্যে তাকিয়ে রইলেন শ্রীমা।

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করে ফিরেছে বিবেকানন্দ। বাগবাজারের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সমস্ত দেহ চাদরে ঢেকে মা এককোণে দাঁড়িয়ে-ছেন। বিবেকানন্দ প্রণাম করল সাষ্টাঙ্গ। বলল, 'মা, তোমার ঠাকুর কিছু নয়।'

'কেন বাবা, কি হল?'

'একেবারে কিছু নয়! কোনো কিছু শক্তি ধরে না। নিজের অসুখ তো সারাতে পারলই না; আমাদেরও না। একেবারে বাজে ঠাকুর।'

মা ক্ষীণ একটু হাসলেন। কি হয়েছে তাই বল না?

'কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আনাগোনা করত।' বললে স্বামীজী। 'তাতে সেই ফকিরের খুব আক্রোশ হল আমার উপর। নিজের চেলাকে ঠেকাতে পারে না, যত রাগ আমার উপর। শেষে ফকির আমাকে শাপ দিল। বললে তিন দিনের মধ্যে তোমার পেটের অসুখ হয়ে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। আমি ঠাকুর ভরসা করে নিশ্চিন্ত মনে আছি, ঠাকুরের কাছে কিসের ঐ পাহাড়ী ফকির! কিন্তু কি আশ্চর্য, ঠিক তিন দিনের মধ্যে আমার ঘোরতর পেটের অসুখ শুরু হল আর আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এলুম। তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না। সামান্য একটা ফকিরের কাছে হেরে গেলেন।'

'বিদ্যা! বিদ্যা মানতে হয় বই কি বাবা!' মা বললেন স্নিগ্ধ স্বরে। 'আমাদের ঠাকুর তো কিছুই ভাঙতে আসেননি, সব মেনে গিয়েছেন। শঙ্করাচার্যও শুনেছি নিজের দেহে ব্যাধি আসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জানো সেই ঠাকুরের খুড়তুতো দাদাকে—'

'কে, হলধারীকে?'
'তিনি একবার ঠাকুরকে শাপ দিয়েছিলেন তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। তা উঠেছিল সেই রক্ত। তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে অসুখ আসা একই কথা।'
'ও সব কিছুই মানি না। তুমি তোমার ঠাকুরের দিকে টেনে কথা কইছ। আসলে তোমার ঠাকুর কিছুই নয়। যাই কেন না বলো আমি আর মানতে রাজী নই।'
মা বললেন, 'না মেনে থাকবার জো আছে কি বাবা! তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা।'
নরেন হাসতে লাগল।
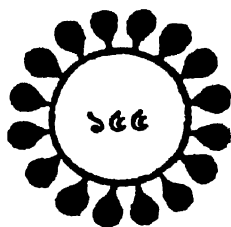
সিদ্ধাই দেখিয়ে কি হবে? হরিপদ তাপহরণের ধাম, সেই দিকে এগুতে পারবে এক পা? জাগাতে পারবে কুলকুণ্ডলিনী? মূলাধারে সেই সর্পতুল্য শক্তি? পদ্ম-মৃণালের মধ্যবর্তী তন্তুর মত অতি সূক্ষ্মা, শঙ্খবর্তসমা নবীনচপলার মত দেদীপ্যমানা। ভ্রমরমালার গুঞ্জনের মত আবার অস্ফুট মধুর শব্দ করছে। সেই কূজনকারিণী জীবনদায়িনী শক্তিকে জাগাতে পারবে?
ঠাকুর বললেন, সেই সমুদ্রপারের সাধু ঝড় থামাতে গিয়ে জাহাজডুবি করেছিল। জানো না সেই কাহিনী?
সাধু সিদ্ধ হয়েছে! একদিন বসে আছে সমুদ্রের ধারে, ঝড় উঠল। ঝড়ে তার খুব অসুবিধে হচ্ছে দেখে সে বলে উঠল, ঝড়, থেমে যা। তার কথা মিথ্যে হবার নয়। বলা মাত্রই ঝড় থেমে গেল। তাতে ফল হল এই, পাল তুলে একটা জাহাজ যাচ্ছিল, হাওয়া বন্ধ হওয়ামাত্রই জাহাজ টুক করে ডুবে গেল। অনেক লোক ছিল জাহাজে, মারা পড়ল। তার জন্যে যে পাপ হল তা বর্তাল এসে সেই সিদ্ধপুরুষে। সিদ্ধাই তো গেলই, নরকবাসের থেকেও রেহাই পেল না।
চিনু শাঁখারির কথা মনে আছে? কামারপুকুরের সেই বুড়ো সাধক, পরম বৈষ্ণব। ছেলেবেলায় যার পায়ে পড়ে বলেছিল রামকৃষ্ণ, ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার তোরা হরিবোল বল। দেখা হলেই রামকৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করত আর বলত, ওরে গদাই, তোকে দেখে আমার গৌরকে মনে হয়।

একবার হল কি শোনো। কতকগুলি সাধু ঘুরতে-ঘুরতে কামারপুকুরে একদিন চিনুর বাড়িতে গিয়ে অতিথি হল। তখন আমের সময় নয়, তবু সাধুদের কি বেয়াড়া সাধ, তারা মৌরলা মাছ দিয়ে আমের টক খাবে। চিনু তো মাছ যোগাড় করল কিন্তু আম কোথায়? অতিথি নারায়ণ, তাদের ইচ্ছা তো আর অপূর্ণ রাখা যায় না! চিনু বিমূঢ়-বিহ্বল হয়ে পড়ল। কেমন করে মুখ রাখি, কেমন করে ধর্ম-হানি থেকে রক্ষা পাই?

কাতর হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে চিনু শেষকালে একটা আমগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। গলায় কাপড় দিয়ে মাথা কুটতে-কুটতে বললে, আমার ভিটেয় আজ ছলনা করতে অতিথিরূপে নারায়ণ এসেছেন। এসে বলছেন আম দিয়ে মাছের টক খাবেন। আমি দীনহীন পথের কাঙাল, অসময়ে আম কোথা পাব? কেমন করে তুষ্ট করব তাঁদের? দেবতার যদি দয়া না হয় আমি কি করতে পারি?

আশ্চর্য, সত্যি-সত্যি গুটিকতক কাঁচা আম ঝরে পড়ল গাছ থেকে।

ঠাকুর শুনতে পেলেন সেই কাহিনী। চিনুকে বললেন, 'ছি দাদা, বিভূতি, সিদ্ধাই, হ্যাক থুঃ। অমন আর করোনি। তা হলে বেটা-বেটিরা তোমার মাথা খাবে। খবরদার ও-সব আর করতে যেওনি, ও সবে মন দিলে মন নেমে যাবে।'

হীনবুদ্ধি লোকেই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভালো করা, মোকদ্দমা জেতানো, নদীর উপর দিয়ে চলে যাওয়া, আগুনের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা, আরেক দেশে কে কি বলল তাই ঠিক বলতে পারা—এই সব ইন্দ্রজাল। এই সবে আছে কি! প্রতিষ্ঠা আর লোকমান্য হতে পারে, কিন্তু সে বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে সরে পড়ে। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছু চায় না।

সত্যিকারের সাধুর লক্ষণ কি?

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু। সত্যই যার বল, যার ভিত্তি, সর্বজীবে অসূয়াহীন। সর্বোপকারক। বিষয়ে অক্ষুব্ধ, সংযত, মৃদু, শুচি আর অকিঞ্চন। অনিচ্ছুক, বিত্ত-ত্যাগী, শান্ত, স্থির আর শরণাগত। অপ্রমত্ত, গভীরাত্মা আর যে ষড়গুণ জয় করেছে। নিজে মানাকাঙ্ক্ষী নয়, বরং অমানীমানদ, দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক আর কবি অর্থাৎ সম্যকবোদ্ধা।

আর ভক্তের লক্ষণ কি?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমার বিগ্রহ ও আমার ভক্তকে দর্শন স্পর্শন অর্চন আর পরিচর্যা। স্তুতি আর গুণকর্মের অনুকীর্তন। আমার কথা শুনতে শ্রদ্ধা, আমাকে অনুধ্যান। আমাতে লব্ধ বস্তুর সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্মনিবেদন। আমার জন্মকর্মকথন, আমার পর্বানুমোদন। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব আর নিজে সে কি করেছে তার পরিকীর্তনে অস্পৃহা।

এই ভক্তি লাভ হবে কি করে?

একমাত্র সাধুসঙ্গে।

সর্বমঙ্গলনাশক সাধুসঙ্গ।

যোগ, সাংখ্যধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্ত্যাগ, পূর্ত, দান, ব্রত, যজ্ঞ, ছন্দ, মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম

কিছুই আমাকে বশীভূত করতে পারে না, যেমন পারে সাধুসঙ্গ। তুমি শুধু সাধু হও, আমি তোমার সঙ্গী হব। তুমি শুধু মধুর হও, আমার সঙ্গে তোমার অপরিচ্ছিন্ন মৈত্রী।

বৃত্র, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, জটায়ু, আর কুব্জা—এদের কি ছিল? এরা বেদ পাঠ করেনি, উপাসনা করেনি, এদের ব্রত ছিল না। তপস্যা ছিল না, শুধু নিজ সঙ্গ দ্বারা, শুধু সাধুসঙ্গহেতু পেয়েছিল আমাকে।

আর ব্রজাঙ্গনারা?

তাদের কিছু নেই, আছে একমাত্র ভগবদ্‌বিরহ। একমাত্র ভগবদ্‌বিরহ থেকেই একান্ত ভক্তিলাভ হয়। মহাভাগ্যবতী বলে ব্রজাঙ্গনাদের তাই সম্বোধন করল উদ্ধব। বলল, বিরহে তোমরা শ্রীকৃষ্ণে সর্বাত্মভাবে অধিকৃত হয়েছ। অস্পর্শসমুদ্রে মগ্ন আছ সর্বক্ষণ। তোমরা ছাড়া আর কার এমন মহাভাগ্য! মুনিদুর্লভা ভক্তির তোমরাই জনয়িত্রী।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উদ্ধবকে, আমার সঙ্গকালে গোপবালারা এক রাত্রিকে ক্ষণার্ধ বলে মনে করেছে। আর অক্রূর এসে যখন আমাকে মথুরায় নিয়ে গেল, তখন আমার বিরহে তাদের এক রাত্রিকে মনে হয়েছিল এক কল্প। নদী যেমন সমুদ্রে মিশে পৃথক অস্তিত্ব হারায় তেমনি তারাও আমাতে মিশে নিজেদের হারিয়েছিল। পুত্র পতি দেহ স্বজন ভবন—কোনো দিকে তাকায়নি। কিন্তু কী তাদের সম্বল? তারা না বুঝেছে আমার তত্ত্ব, না বা আমার স্বরূপ। তাদের একমাত্র ধন ভক্তি। উদ্ধব, তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সব ছেড়ে একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়ে আমার শরণ নাও, তাহলে আর তোমার ভয় নেই।

'মহাত্মা শ্রীপতি আপ্তকাম পুরুষ,' বলছে গোপীরা : 'বনবাসিনী আমাদের দিয়ে তাঁর কী প্রয়োজন? স্বৈরিণী পিঙ্গলার মত যদিও আমরা জানি, নৈরাশ্যই পরম সুখ, তবু শ্রীকৃষ্ণেই আমাদের দুরত্যয়া আশা। তাঁর বার্তার জন্যে কে নিরুৎসুক থাকতে পারে? তাঁর সেবাধন্য সেই সরিৎ, শৈল, বনোদ্দেশ-গাভী, বেণুরব, তাঁর শ্রীনিকেতনস্বরূপ পদাঙ্ক বারে-বারে তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাঁর সেই ললিত গতি, উদার হাস্য, লীলাবলোকন আর মধুর বচনে আমরা হৃতধী। তাঁকে ভুলি কি করে? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজগত, হে আর্তিনাশন, দুঃখনিমগ্ন গোকুলকে উদ্ধার করো।'

কোথায় বনচরী গোপী, কোথায় বা শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চল স্নেহ! কিন্তু বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। ওষধিশ্রেষ্ঠ অমৃতকে যে জানে না সেও যদি তা আস্বাদ করে, পায় তার শ্রেয়োফল। তেমনি গোপীরা জানে না কার সঙ্গ করেছে, কিন্তু ফল পেয়েছে হাতে-হাতে।

আমাদের কিছু জেনে দরকার নেই। বলছে ব্রজবালারা, আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণ-পাদাম্বুজাশ্রয় হোক। আমাদের কথা তাঁরই নামাভিধায়িনী হোক। আমাদের কায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করুক। মঙ্গলাচরিতে হোক, কর্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ হতে-

হতেই হোক, যেখানেই থাকি তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রতি আমাদের অনুরাগ যেন অচঞ্চল থাকে।
গোপীদের প্রণাম করল উদ্ধব। প্রার্থনা করল, গোপীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা ওষধির মধ্যে আমি যেন একটা কিছু হই। যাদের হরিকথাচরিত ত্রিলোক পবিত্র করেছে সেই নন্দব্রজস্ত্রীদের পদরেণু আমি বারে-বারে বন্দনা করি।
ভক্তিই মুখ্য।
কর্মমীমাংসক বলে, ধর্মই মানুষজীবনের উদ্দেশ্য। কাব্যালঙ্কারিক বলে, যশই উদ্দেশ্য। বাৎসায়ন বলে, কামই উদ্দেশ্য। যোগশাস্ত্রকার বলে, সত্য আর শম-দমই উদ্দেশ্য। দণ্ডনীতিকৃৎ বলে, ঐশ্বর্যই উদ্দেশ্য। চার্বাক বলে, আহার ও মৈথুনই উদ্দেশ্য। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তি, যাকে আশ্রয় করলেই ঈশ্বরদর্শন।
'ভক্ত পারমেষ্ঠ্য চায় না, মহেন্দ্রলোক চায় না, কিছু চায় না, শুধু আমাকে চায়।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ, কিছুতেই আমাকে তত বশীভূত করতে পারে না, যেমন পারে ভক্তি, উর্জিতা ভক্তি।'
ভক্তের জাত নেই। তাদের শ্রেষ্ঠ বর্ণ।
'প্যারে আ যাও, প্যারে আ যাও!' গেঁড়াতলার মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে এক মুসলমান ফকির আর্তনাদ করছে।
এই আর্তনাদের সুরটি ভালোবাসার। মনস্তনুময় ব্যাকুলতার।
কাকে ডাকছে অমন গলা বাড়িয়ে? কাকে বুকে ধরবার জন্যে মেলে ধরেছে দুই বাহু?
একটা ছ্যাকড়া গাড়ি এসে দাঁড়াল না? কে একজন যেন নামল গাড়ি থেকে! এ কি, শ্রীরামকৃষ্ণ না?
'প্যারে আ যাও, প্যারে আ যাও।' মুসলমান ফকির প্রেমগদগদস্বরে অথচ তীক্ষ্ণ আর্তি নিয়ে ডাকতে লাগল।
ঠাকুর কালীঘাট থেকে ফিরছেন দক্ষিণেশ্বর। পথে এসেছেন মৌলালি। ফকিরকে দেখে যেতে। বুক ভরে নিতে তার ভক্তগাত্রস্পর্শ।
'প্যারে আ যাও, প্যারে আ যাও।'
মুসলমান ফকির আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে বাঁধা পড়লেন।
তপস্যার কি দরকার? হরি যদি অন্তরে বাহিরে থাকেন তাহলে তপস্যা নিরর্থক, যদি না থাকেন তাহলে আরো নিরর্থক। তাই তপস্যা থেকে বিরত হও। শুধু ভক্তি লাভ করো, সুপক্ক ভক্তি। এই ভক্তি-কাটারি দিয়েই ভবনিগড় ছেদন হবে।
জীবকোটি আর ঈশ্বরকোটি।
জীবকোটি ভক্তি ধরে সমাধিতে আসে। আর ঈশ্বরকোটি নিত্যসিদ্ধ, নির্বিকল্প, সুসমাহিত। যেমন শুকদেব।
'বিষ্ণু পাঠালেন নারদকে, শুকদেবকে নিয়ে এস, পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনাতে হবে।' বলছেন ঠাকুর। 'নারদ এসে দেখে শুকদেব সমাধিস্থ, জড়ের মত বসে আছে বাহ্যশূন্য হয়ে। তখন বীণা বাজাতে শুরু করল নারদ। চারশ্লোকে বর্ণনা করতে

লাগল হরির রূপ। প্রথম শ্লোকে শুকদেবের রোমাঞ্চ, দ্বিতীয় শ্লোকে অশ্রু, তৃতীয় আর চতুর্থ শ্লোকে একেবারে চিন্ময় রূপদর্শন।'

জন্মগ্রহণমাত্র ব্রহ্মচারী ও সমাহিতচিত্ত এই শুকদেব। সরহস্য বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় তার হৃদয়ে দেদীপ্যমান, তবু সুরগুরু বৃহস্পতির কাছে গেল ইতিহাস ও রাজশাস্ত্র পড়তে। সর্বলোকের মাননীয় হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুতে শান্তি নেই। নিখিল যোগশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়েও নয়। মোক্ষ ছাড়া শান্তি নেই কিছুতেই।

ব্যাসকে গিয়ে বললে, 'বাবা, আপনি মোক্ষধর্মকুশল, কিসে আমার চিত্ত প্রশান্ত হবে তার উপদেশ করুন।'

ব্যাস বললে, 'তুমি মিথিলাধিপতি জনকের কাছে যাও, তিনিই উপদেশ করবেন।' শুকদেব তক্ষুনি বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ব্যাস তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষ পথ দিয়ে যেও না, সাধারণ মানুষের মত পায়ে হেঁটে উপনীত হবে। পথে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের খোঁজ করবে না, করলেই বন্ধ হবে সঙ্গপাশে। জনক আমাদের যজমান জেনে কিছুমাত্র অহঙ্কার দেখাবে না, সব সময়ে তাঁর বশবর্তী হয়ে থাকবে। দেখবে তিনিই তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন।'

পায়ে হেঁটে যাত্রা করল শুকদেব। পাহাড় নদী তীর্থ সরোবর শ্বাপদাকীর্ণ অটবী পার হল একে-একে। সুমেরুশৃঙ্গ থেকে শুরু করে চীন-হূন দেশ দেখে ইলাবৃত-বর্ষ, হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ পেরিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করল। কত রমণীয় পত্তন, কত সমৃদ্ধিশালী নগরী, কত মনোহর উদ্যান-উপবন চোখে পড়ল, কিন্তু চিত্ত কিছুতেই সমাকৃষ্ট হল না। কত অন্ন পানীয় আর ভোজন, ধান্য ও গোধূম, কত সুশোভিত ঘোষপল্লী, কত খেচর-জলচর পাখি, কত রূপবতী পদ্মিনী কামিনী, কিন্তু কিছুতেই চিত্তবিকার ঘটল না। মনে শুধু এক চিন্তা, মোক্ষচিন্তা। মিথিলার রাজভবনের প্রথম কক্ষায় প্রবেশ করা মাত্র দ্বারপালেরা কঠোর বাক্যে নিবারণ করল শুকদেবকে। অপমানেও কিছুমাত্র ব্যথা পেল না শুকদেব, মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের মত দাঁড়িয়ে রইল একাকী। দারোয়ানদের মধ্যে একজন তাকে বন্দনা করে ঢুকিয়ে দিল দ্বিতীয় কক্ষায়। আগের মহলে ছিল রোদ এ মহলে ছায়া। কি রোদ কি ছায়া, শুকদেবের কাছে সমতুল।

মন্ত্রী এসে শুকদেবকে নিয়ে গেল তৃতীয় কক্ষায়। এখানে পুষ্পিত পাদপ আর কেলিসরোবর শোভা পাচ্ছে। এর নাম প্রমদাবন, মিথিলার অমরাবতী। মুহূর্তমধ্যে মন্ত্রী অদৃশ্য হয়ে গেল আর উপস্থিত হল পঞ্চাশজন বারাঙ্গনা। সকলেই তরুণ-বয়স্কা ও প্রিয়দর্শনা, আলাপকুশলা ও নৃত্যগীতনিপুণা। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে সুস্বাদু অন্ন নিবেদন করল শুকদেবকে। মনে মোক্ষচিন্তা নিয়ে আহার করল শুকদেব। হৃদয়জ্ঞা কামদক্ষা বারবিলাসিনীরা শুকদেবকে নিয়ে প্রমদাবন দেখিয়ে বেড়াতে লাগল আর সর্বক্ষণ মেতে রইল হাস্যগীতে নৃত্যক্রীড়ায়, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধাত্মা শুকদেব কিছুতেই হৃষ্ট বা বিরক্ত হল না।

সন্ধ্যা হলে বারবনিতারা শুকদেবকে আসন ও শয়ন দিলে। মহামূল্য আস্তরণ-

সমাস্তীর্ণ রত্নজালভূষিত আসনশয়ন। আসনে বসে ধ্যাননিরত হয়ে পূর্বরাত্র কাটিয়ে দিল শুকদেব। মধ্যরাত্রি সুশান্ত নিদ্রায় যাপন করলে। শেষ রাত্রে উঠে শৌচ-ক্রিয়া সেরে আবার ধ্যাননিমগ্ন হল।

ধ্যানে ও সুষুপ্তিতে সর্বসময়েই তাকে ঘিরে বসেছিল বারবনিতারা, কিন্তু শুক-দেবের মন বিচলিত হল না।

পরদিন জনক নিজে এসে গুরুপুত্রের সৎকার করলে। মাটিতে বসে করজোড়ে জিগগেস করলে, 'কি হেতু আগমন?'

'আমি পিতার আদেশে সংশয়নাশের জন্যে আপনার কাছে এসেছি। মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ আমাকে তা বলুন।'

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভ অসম্ভব। আবার গুরু ছাড়া জ্ঞান লাভের আশা নেই।' বললে জনক। 'আচার্যই সংসার-সাগরের কর্ণধার আর জ্ঞান প্লবস্বরূপ। সুতরাং গুরুর থেকে জ্ঞান লাভ করে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞান আর গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করবে। কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদ যাতে না হয় তারই জন্যে ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একে-একে চার আশ্রমের ধর্ম পালন করে কর্মের শুভাশুভ ফল ত্যাগ করতে পারলেই মোক্ষপ্রাপ্তি।'

'কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই কি মোক্ষলাভ হতে পারে না?' অস্থির হয়ে জিগগেস করল শুকদেব।

'কেন পারবে না?' জনক তাকে আশ্বস্ত করল : 'বহু জন্মের সাধনায় ইন্দ্রিয় যার বশীভূত হয়েছে, যার চিত্ত-বিশুদ্ধি হয়েছে, তার ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হয়ে থাকে। আর একবার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মোক্ষলাভ হলে আর গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণের প্রয়োজন থাকে না।'

নির্ভয় হল শুকদেব।

জনক তারপর বলতে লাগল : 'জলচর যেমন জলে থেকেও জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি সকল প্রাণীতে নিজেকে ও নিজের মধ্যে সকল প্রাণীকে অবস্থিত দেখেও নির্লিপ্ত ভাবে কালযাপন করবে। সর্বত্র একমাত্র পরমাত্মাকে দর্শন করবে। যে অন্যকে ভয় দেখায় না, নিজেও ভীত হয় না, যে এককালে কাম ও ক্রোধ ত্যাগ করেছে, যে করেছে সম্পূর্ণ বৈরভাব বর্জন, যার মনে নেই আর মোহকারিণী ঈর্ষা, প্রিয়-অপ্রিয় কথা শুনে বা প্রিয়-অপ্রিয় বস্তু দেখেও যার আহ্লাদ বা শোক নেই, স্তুতি-নিন্দা, লোহ-কাঞ্চন, সুখ-দুঃখ শীত-গ্রীষ্ম অর্থ-অনর্থ জীবন-মরণ যার কাছে সমান, সেই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভ করে। যেমন দীপ দ্বারা অন্ধকার ঘর প্রকাশিত হয় তেমনি জ্ঞান দ্বারা লক্ষিত হয় পরমাত্মা। তোমার ভয় কি? তুমি ছিন্ন সংশয়, দেহাভিমানশূন্য। বিজ্ঞানসম্পন্ন স্থিরবুদ্ধি ও নির্মলনির্লোভ। সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি নৃত্যগীতে-অনুরাগ বন্ধুস্নেহ শত্রুভয় ও ভেদবুদ্ধি তোমার অন্তর থেকে তিরোহিত হয়েছে। তুমি যে অনাময় পরম পথ আশ্রয় করেছ সে পথই একমাত্র পথ।'

আত্মসাক্ষাৎকার হল শুকদেবের। হিমালয়ের পূব দিকে পিতার কাছে সে ফিরে গেল। সেখানে নারদের সঙ্গে দেখা। শুকদেব জিগগেস করল, 'দেবর্ষি', ইহলোকে কি হিতকর, আপনি আমাকে উপদেশ করুন।'

নারদ বললে, 'বৎস, বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসক্তির তুল্য দুঃখ নেই, ত্যাগের তুল্য সুখ নেই। ক্রোধ থেকে তপস্যাকে, মাৎসর্য থেকে শ্রীকে মানাপমান থেকে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ থেকে আত্মাকে সতত রক্ষা করবে। আনৃশংস্যই পরম ধর্ম। ক্ষমাই পরম বল। আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান। আর সত্যের সমান পরম আর কিছু নেই। কিন্তু সত্যের চেয়েও হিতবাক্যই বেশি বলবে। আমার মতে, যে বাক্য দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল হয়, তাই সত্যবাক্য। কোনো প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রতুল্য ব্যবহার করবে, এই দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েছ, তবে আবার কার সঙ্গে শত্রুতা? অনৈশ্বর্য, নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহত্ব ও অচাপল্যই পরম শ্রেয়। যে মরেছে বা যা নষ্ট হয়েছে তার জন্যে শোক করা মানে দুঃখ থেকেই দ্বিগুণতর দুঃখ টেনে নেওয়া। সুতরাং চিন্তা না করাই দুঃখ নিবারণের মহৌষধ।

'জ্ঞানতৃপ্ত হও। চারদিকে সুখাসক্ত জনতার মধ্যে একাকী অবস্থান করো। সংসার নদী অতি ভীষণ। রূপ এই নদীর কূল, মন এর স্রোত, স্পর্শ এর দ্বীপ, রস এর প্রবাহ, গন্ধ এর পঙ্ক আর শব্দ এর জলস্বরূপ। আর নৌকো তোমার এই শরীর, ক্ষমা তার ক্ষেপণী, দয়া তার বায়ু, ধর্ম স্থৈর্য, আকর্ষণ রজ্জু। এই শরীর-নৌকায় নদী পার হয়ে যাও। তপোবলে সংসারবন্ধ থেকে বিমুক্ত হয়ে অনন্তসুখসংবর্ধনী সিদ্ধি লাভ করো।

'আর দেখ, যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ আসে তখন কি পৌরুষ কি প্রজ্ঞা কি নীতিবল কিছুতেই তার নিবারণ করা যায় না। তবু স্বভাবত সর্বদা সাবধান থাকবে। জীবিততৃষ্ণাপরায়ণ দেহ, সর্বদাই তার ক্ষয় হচ্ছে। সূর্য নিজে অজর কিন্তু পর্যায়ক্রমে সমুদিত ও অস্তমিত হয়ে জীবের সুখদুঃখ জীর্ণ করছে, ইষ্টানিষ্টকে সহচর করে রাত্রিও পালিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। চেয়ে দেখ ক্রিয়াফল কিছুই তোমার হাতে নেই। তা যদি হত তোমার সব বাসনাই সব উদ্যোগই তুমি সিদ্ধ করতে পারতে। কত নিয়মধারী কার্যদক্ষ মতিমান লোক সৎকর্ম থেকে পরিভ্রষ্ট হয়ে ফল লাভে বঞ্চিত হয়, আবার কত নির্গুণ নরাধম মূর্খও উৎকৃষ্ট ফল পায়। কত লোক সর্বদা হিংসা ও বঞ্চনা করেও পরম সুখে কালাতিপাত করে আর কত সাধু বিবিধ বিচিত্র সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেও অসমর্থ ও অকৃতকাম।

'লোকে রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, আবার সে চিকিৎসকও কাল-ক্রমে ব্যাঘ্রপীড়িত মৃগের মত রোগের কবলে গিয়ে পড়ে। ধন, রাজ্য বা তপস্যা দিয়েও কেউই স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। শুধু কামনানিবন্ধনই যত ক্লেশ ভোগ। তুমি মোহবিহীন হয়ে প্রথমত জ্ঞানবলে ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করে পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করো।'

তথাস্তু।

শুকদেব স্থির করলেন যোগবলে কলেবর ত্যাগ করে বায়ুভূত হয়ে তেজো-

রাশিপরিপূর্ণ অর্কমণ্ডলে প্রবেশ করব। তার আগে একবার পিতার সঙ্গে দেখা করে যাই।
ব্যাসকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে দাঁড়াল শুকদেব।
নিত্য-স্নানের উদ্দেশে যোগানুষ্ঠান করতে যাবে শুনে ব্যাস চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, 'তুমি কিছুক্ষণ আমার কাছে থাকো, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু চরিতার্থ হোক।'
স্নেহশূন্য সংশয়মুক্ত শুকদেব পিতার বচনমাধুর্যে বিচলিত বা বিগলিত হল না। পিতাকে ত্যাগ করে সিদ্ধনিষেবিত কৈলাস পর্বতে চলে গেল।
ব্যাকুল হয়ে পুত্রকে অনুসরণ করতে লাগল ব্যাস আর সরোদনে 'শুক' বলে আহ্বান করতে লাগল। সর্বগামী সর্বতোমুখ শুকদেব স্থাবরজঙ্গম অনুনাদিত করে প্রত্যুত্তর করল, 'ভোঃ'। সেই অবধি সমুদয় বিশ্বমধ্যে এই একাক্ষর 'ভোঃ' প্রচলিত হল। আজও গিরিগহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ করলে ঐ একাক্ষর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।
শব্দাদিগুণকেও অতিক্রম করল শুকদেব। বৃক্ষপদে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হয়ে গেল। হিমালয়প্রস্থ দেশে ব্যাস পুত্রের অনুধ্যান করত বসল। কাছেই মন্দাকিনী-তীরে স্নানরতা বিবস্ত্রা অপ্সরারা বিরাজ করছিল, ব্যাসকে দেখে ত্রস্ত ও লজ্জিত হয়ে কেউ জলে ডুবল, কেউ লতাগুল্মের অন্তরালে পালাল, কেউ-কেউ বা ত্বরান্বিত হয়ে টেনে নিল ত্যক্ত বাস। ব্যাস বুঝল, তার পুত্রই মুক্ত আর তার নিজেরই বিষয়-কলুষ। যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জায় অভিভূত হল ব্যাস।
পুত্রশোকার্ত পিতার কাছে পিনাকপাণি শঙ্কর আবির্ভূত হল। বললে, মহর্ষি, তুমি আমার কাছে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের মত বীর্যসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করেছিলে, আমি তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলাম। তোমার সেই পুত্র দেব-দুর্লভ পরমগতি লাভ করেছে, তবে তোমার কিসের দুঃখ? তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয়কীর্তি চিরকাল ঘোষিত হবে। আর মহামুনি, তোমাকে এই বর দিচ্ছি, এই ভূমণ্ডল মধ্যে সর্বদা সর্বস্থানে তুমি তোমার পুত্রের ছায়া দেখতে পাবে। এই দেখ।
শুকদেবের ছায়া এসে দাঁড়াল।
'একমতে আছে, শুকদেব সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র আস্বাদ করেছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'সমুদ্রের হিল্লোল-কল্লোল দর্শনশ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু ডুব দেন নাই সমুদ্রে।'
হিমালয়ের ঘরে পার্বতীর জন্ম। পিতাকে তার নানা রূপ দেখাতে লাগল পার্বতী। হিমালয় বললে, 'মা, এসব রূপ তো দেখলাম, কিন্তু তোমার যে একটি ব্রহ্মস্বরূপ আছে, সেইটি একবার দেখাও।'
পার্বতী পাশ কাটাতে চাইল। বললে, 'বাবা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও তাহলে সংসার ত্যাগ করে সাধুসঙ্গ করতে হবে।'
ঠাকুর বললেন, 'হিমালয় জানে না সে দর্শনের মানে কি।'
কিছুতেই ছাড়বে না হিমালয়। তখন পার্বতী একবার দেখাল।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'দেখামাত্রই গিরিরাজ মূর্চ্ছিত।'
ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও শরীর রাখতে পারে কে? একমাত্র অবতার। তাও শুধু লোক-শিক্ষার জন্যে।
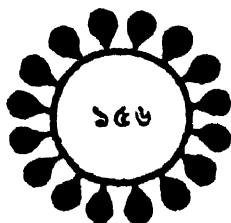
অত-শতয় দরকার কি? শুধু সরল হয়ে যাও।
'সরলের কাছে তিনি খুব সহজ।' বলছেন ঠাকুর।
কিন্তু সরল হওয়া কি সহজ কথা?
বঙ্কিম চাটুজ্জেকে বলছেন, 'কপট হয়েছ কি, তিনি দূরে সরে গিয়েছেন। সেয়ানা-বুদ্ধি পাটোয়ারিবুদ্ধি বিচারবুদ্ধি করতে গিয়েছ—অমনি তিনি বেপাত্তা।'
সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেন। একবার দেখ না ডেকে। ছেলে যেমন মাকে না দেখে দিশেহারা হয়, মেঠাই-সন্দেশে ভোলে না, কেবল মা-মা করে, তেমনি করে একটু ডাকো না। একবার আন্তরিক কাতর হও না মায়ের জন্যে। দেখ না মা আসে কিনা ছুটে। একটি নির্ভুল সরলরেখার মত।
'তাই তো ছোকরাদের এত ভালোবাসি।' ডাক্তারকে বলেছেন ঠাকুর। 'যেন নতুন হাঁড়ি, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। আর বিষয়ী লোকেরা হচ্ছে দই-পাতা হাড়ি, দুধ রাখলেই নষ্ট। তা, তোমার ছেলেটি বেশ। এখনো বিষয়বুদ্ধি কামিনীকাঞ্চন ঢোকেনি।'
'বাপের খাচ্ছেন কিনা তাই।' ডাক্তার পরিহাস করল। 'নিজের করতে হলে দেখতুম বিষয়বুদ্ধি ঢোকে কিনা।'
'তা বটে।' বললেন ঠাকুর, 'তবে কি জানো, ঈশ্বর বিষয়বুদ্ধির থেকে দূর, নইলে একেবারে হাতের মধ্যে।'
সরলভাবে ডাকলে তিনি দেখা দেবেনই দেবেন।
এক যাত্রাওয়ালা দেখা করতে এসেছে, তাকে বলছেন। 'শোনো, আরেকটি কথা। যাত্রাশেষে কিছু হরিনাম করে উঠো। তাহলে যারা গায় আর যারা শোনে সকলেই একটু ঈশ্বর ভাবনা করতে-করতে যে যার বাড়ির দিকে রওনা হবে।'
যাত্রারম্ভে তো করোনি যাত্রাশেষে করো হরিনাম। পরিণামে হরিনাম। কিন্তু সমস্ত পথ ধরে করে না এলে কি শেষ কালে মনে পড়বে?

তাই সরল হয় শেষ জন্মে। 'শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব।' বললেন ঠাকুর, 'বহু জন্মের তপস্যার পরেই সরল-উদার হওয়া চলে।'
তবে এ জন্মের উপায় কি?
খুব করে বালকদের সঙ্গে মেশ। বালক ভাব আরোপ করো নিজের মধ্যে। যতক্ষণ বালকদের সঙ্গে মিশবে ততক্ষণ তুমি নিজেও বালক, নিজেও আত্মভোলা। বালকের মতই তুমি সরল, বালকের মতই তুমি বিশ্বাসী। শিখবে কি করে আখখুটে হতে হয়, কান্না জুড়ে ছুঁড়তে হয় হাত-পা, মায়ের কোল পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হয়।
দুটি সন্তানবতী গৃহস্থবধু দর্শন করতে এসেছে ঠাকুরকে। দুটি জা, একই পরিবারের। এসেছে মাথায় ঘোমটা দিয়ে। নম্রশ্রীতে বসেছে ঠাকুরের কাছে।
'শোনো, শিবপুজো করবে।' বললেন ঠাকুর।
সর্বভূতাত্মা সর্বলোককৃৎ সর্ববিগ্রহ শিব। সর্ববাসী সর্বচারী সর্বকালপ্রসাদ। দেখবে স্ফটিকশুভ্র শিব বসে আছেন পদ্মাসনে। কাঁধে-গলায় সাপ গর্জন করছে, মাথার জটায় কুল-কুল করছে গঙ্গা। চূড়ায় শশধরের মুকুট।
'ঠাকুর পুজোর কাজ অনেকক্ষণ ধরে করবে। অনেকক্ষণ ধরে।' তাদের বলতে লাগলেন ঠাকুর। 'এই প্রথম ফুল তুললে, পাতা বাছলে, মালা গাঁথলে, অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে ঠাকুরের বাসন মাজলে, চন্দন ঘষলে, ঠাকুরের জলখাবার সাজালে। এ সব যে কাজ করছ এও ঠাকুর পুজো। দু জায়ে যে কথা কইবে তাও ঠাকুরের কথা। তখন কোথায় সংসারের হীনবুদ্ধি, রাগদ্বেষ, ক্ষুদ্রতা-দীনতা! তখন শুধু তেলের ধারার মত আনন্দের ধারা।'
যখন বাসন মাজবে, মনে করবে চিত্তমার্জনা করছ। যখন চন্দন ঘষবে, মনে করবে নিজেকে নির্মল করে কোমল করে নিঃশেষ করে মিলিয়ে দিচ্ছ ঈশ্বরে।
✓ পুজোর আয়োজনও পুজো। প্রেমের আয়োজনই প্রেম।
'আমাদের কি একটু কিছু বলে দেবেন?' বড় বউটি জিগগেস করল।
'কি, মন্ত্র?'
দু-চোখে সস্মিত সম্মতি ভরে তাকাল বউটি।
'কিন্তু আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র নিলে শিষ্যের সব পাপ-তাপ নিতে হয়। মা আমাকে বালকের অবস্থায় রেখেছেন।'
বউদুটি কি একটু বিমর্ষ হল?
ঠাকুর আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোমাদের যে ভাবে পুজো করতে বলে দিলাম তাই কোরো, ভাবনা কি। তা ছাড়া হরিনাম যে করতে বলেছিলাম তা হচ্ছে?'
ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল বউদুটি।
'তবে আর কথা নেই।'
সর্বদা নাম করবে। নামে ভাসবে নামে ডুবে থাকবে। দেখবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে নাম হবে। দেখবে ঘুমেও নাম ছাড়া নও। নামে যদি একবার আনন্দ হয় তাহলে আর কিছু করতে হয় না! করবার দরকারও হয় না। শুধু নাম নিয়ে পড়ে থাকলেই যথেষ্ট। শুধু যথেষ্ট নয়, যথাতিরিক্ত।

'তোমরা উপোস করে এসেছ বুঝি?' ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন।
বউ দুটি চুপ করে রইল।
'উপোস করে এসেছ কেন? মেয়েরা আমার মা'র এক-একটি রূপ। তাই তাদের একটু কষ্টও আমি দেখতে পারি না। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে। ওরে রামলাল!'
রামলাল এসে হাজির।
'ওরে বউদুটিকে বসা। একটু জল খাওয়া।'
ফলহারিণী পূজোর প্রসাদ, লুচি আর নানারকম ফল মিষ্টি এনে দিল রামলাল। গ্লাশ ভরে এনে দিল চিনির পানা।
'আহা-হা, তোমরা কিছু খেলে, আমার প্রাণটা শীতল হল।' ঠাকুর বললেন সুতৃপ্ত-নেত্রে। 'ওগো, মেয়েদের উপবাসী আমি দেখতে পারি না।'
আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী—আমি তো কিছুই নই। শুনেছি ঐ চাররকমই নাকি বৈধী ভক্তির চার উপায়। তা হলে আমার কী উপায় হবে? কিন্তু কী তুমি জিগগেস করি। আমি কাঙাল, দীনহীন। বটে? তাহলে তো আর ভাবনা নেই, তাহলেই তো তুমি প্রভূতবিত্ত। নিজেকে দীনহীন কাঙাল মনে করে ঈশ্বরের পা ধরে পড়ে থাকো, দেখবে কখন ভক্তি এসে গিয়েছে। শুধু ধরে থাকো, শুধু পড়ে থাকো। শুধু ভরে থাকো। শুকনো লাগছে কাঠ-কাঠ লাগছে, বিরস-বিস্বাদ লাগছে, তবু নাম করে যাও। যত বিরক্তির সঙ্গেই খাও না ওষুধ তার কাজ করবেই। তেমনি নামের বস্তুগুণে সর্বাবস্থায় কার্যকর। বস্তুগুণ কি অবস্থার অপেক্ষা করে? সংসারে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। সবাই মনমরা, হৃতসর্বস্বের মত চেহারা। মুখে হাসি নেই, প্রাণে স্ফূর্তি নেই। কেন, কিসের দুঃখ? নামের নেশা ধরো। দেখ আনন্দ আসে কিনা উজান ঠেলে। ধুয়ে-পাখলে যায় কিনা তোমার ঐ রোদজ্বলা মুখের চেহারা।
গনুর মা'র বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। রাস্তার উপরে একতলা বাড়ি। বৈঠকখানায় ছোকরাদের কনসার্ট পার্টির আখড়া, সেখানেই বসেছেন। ঠাকুরকে পেয়ে ছোকরারা বাজনা শুরু করে দিয়েছে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই ভেঙে পড়েছে দলে-দলে। জানলার উপর দাঁড়িয়েছে কেউ-কেউ। কতগুলি অপোগণ্ড শিশু।
'তোরা এখানে কেন? যা-যা বাড়ি যা।' কেউ বুঝি ওদের তেড়ে গেল।
'না, থাক না। থাক না।' ঠাকুর বাধা দিলেন।
যা শুনছেন সব চমৎকার। আশে পাশে যত লোক সব বেশ লোক। আনন্দে যখন আছে তখন নিশ্চয়ই আছে ঈশ্বরসংস্রবে।
তিন রকম আনন্দ। বিষয়ানন্দ, বিদ্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ। এক সিঁড়ির পরেই আরেক সিঁড়ি। উঠে যাও, শক্তির প্রমাণ দাও। যে শক্তিমান সেই ভক্তিমান।
'আপনি ভেতরে আসুন।'
'কেন গো?'
'ভেতরে জলখাবার দেওয়া হয়েছে।'
'এখানেই এনে দাও না।'

'ঘরটায় পায়ের ধুলো দিন, তাহলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে।' বললে গনুর মা। 'কখন ঘরে মরে পড়ে থাকব, আর তাহলে কোনো গোল থাকবে না।'
যেখানে তোমার পা দুখানি রেখেছ, ঘরেই হোক আর অন্তরেই হোক, সেখানেই কাশী।
গনুর মা'র কি আছে? শুধু সরলতা। যারা ফ্লুট হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে তাদের বা কি আছে? ঐ সরলতা। জানলার উপরে ঐ শিশুর দল ঠাঁই পেয়েছে কেন? শুধু ঐ সরল বলে।
আর দেখ এই সরলের প্রতিমূর্তি, বিজয়কৃষ্ণকে।
ঠাকুর বললেন, 'আহা বিজয়কে দেখ। কেমন উদার-সরল। অধর সেনের বাড়ি গিয়েছিল, তা যেন আপনার বাড়ি, সব্বাই যেন আপনার লোক।'
ব্রাহ্ম সমাজে একদিন উপাসনা করছে বিজয়, বড় শুকনো-শুকনো লাগছে। মনে ভাবভক্তি কিছু আসছে না। কি করে যাবে এ প্রাণের শুষ্কতা? কি করবে কিছু ঠিক করতে পারছে না। তবে এই কাষ্ঠ উপাসনা যে ছাড়তে হবে, এ ঠিক। কিছু ঠিক করতে না পেরে রাস্তায় বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসেই দেখতে পেল একটা কুলি। অমনি তার পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল বিজয়। সঙ্গে-সঙ্গেই তার প্রাণ সরস হয়ে উঠল। চলে এল ভক্তির প্রবাহিনী। আবার উপাসনায় গিয়ে বসল। ভীষণ জমল উপাসনা।
'আরেকদিন,' বলছে বিজয়, 'আরেকদিন শুষ্কতায় কিছুই ভালো লাগছে না, মন বসছে না উপাসনায়, উঠে গিয়ে দারোয়ানকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে এলাম। তখন মনটি সরস হল। উপাসনাও খুব ভালো হল।'
'তোমরা অত পাপ-পাপ বলো কেন? একশোবার আমি পাপী আমি পাপী বললে তাই হয়ে যায়।' বিজয়কে বলছেন ঠাকুর : 'এমন বিশ্বাস করা চাই যে তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি। তিনি আমাদের বাবা-মা, তাঁকে বলো যে পাপ করেছি আর কখনো করব না। আর তাঁর নাম করো, জিহ্বা পবিত্র হয়ে যাবে, দেহ-মন পবিত্র হয়ে যাবে, পাপ-পাখি উড়ে পালাবে দেহবৃক্ষ থেকে।'
মায়ের কাছে সন্তান কি পাপী? সন্তান পীড়িত। সন্তান দুঃখী। সন্তানের দুঃখ হরণ করতে রোগহরণ করতে মা কী না করবে? ব্যথার স্থানে হাত বুলিয়ে দেবে। সমস্ত উপশমের উৎসই তো হচ্ছে মা'র করকমল। আর, পাপ রোগ ছাড়া কি, ব্যাধি ছাড়া কি। মা-ই তো সমস্ত ব্যথার সমস্ত ব্যাধির বিশল্যকরণী।
ঈশ্বরই তো বন্ধু। তাঁকে বন্ধু করো। বন্ধু কি আসবে না বন্ধুর সাহায্যে? আর এ তো তোমার প্রবল বন্ধু, পরাক্রান্ত বন্ধু। ক্ষমায় সুন্দর ঔদার্যে বিশাল স্নেহে বিপুলদক্ষিণ। সর্বসময় অব্যবহিত। তোমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত। তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে সর্বদা হাত বাড়িয়ে আছে। তোমাকে পাহারা দেবার জন্যে রয়েছে চোখ মেলে। এমন বন্ধুকে যদি না চেনো তবে এ সংসারে তুমিই একমাত্র নির্বান্ধব।
মনের কথা বলে প্রাণ খোলসা করতে পারো এমন বন্ধু কে আছে ঈশ্বর ছাড়া?

আর যাকেই বিশ্বাস করে বলো তোমার গোপন কথা, কদিন পরে দেখবে সে কথা বাজারে বিকোচ্ছে। তখন তুমি দেখবে মতে-মতে মিলনই বন্ধুতা নয়, এক উদ্দেশ্য এক দল এক বাণিজ্য এ-ও বন্ধুতা নয়। আজকের বন্ধু কালকের কালসাপ। তাই কাকে তুমি বলবে তোমার প্রাণের কথা, তোমার সুখ-দুঃখের কাহিনী? যদি কথা কয়ে প্রাণ উজাড় করে দিতে না পারো তা হলে হালকা হবে কি করে? তাই একমাত্র যিনি বিশ্বাস্য, একমাত্র যিনি ক্ষুদ্র-অন্তঃকরণ নন তার সঙ্গে কথা কও। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা মানেই সরল হয়ে যাওয়া। আর যে সরল সেই সত্যবাদী।

আগড়পাড়া থেকে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা আসে ঠাকুরের কাছে। এসে, কি সাহস, দূরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে ইশারা করে ডাকে। ঠাকুরও তেমনি। উঠে যান সেই অচেনা ছোকরার ইশারায়। ছেলেটি ঠাকুরকে নিয়ে যায় নির্জনে।

'এখানে কেন?'

'তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কইব। ওখানে বড্ড ভিড়। চুপি-চুপি না হলে কি মনের কথা কওয়া যায়?'

'বেশ তো, কও না মনের কথা। চুপি-চুপিই কও।'

ছেলেটি নির্ভয় হয়ে গেল, নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গেল। বললে, 'বলতে পারো আমার কাম-ভাব কি করে যাবে?'

ঠাকুর বললেন, 'নিজেকে মেয়ে বলে ভাবো। এ-ও একটা উপায় কামজয়ের। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে কামভাব নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে, তাদের নাইবার সময় দেখেছি, মেয়েদের মতই কথা কয়, দাঁত মাজে।'

নির্জন না হলে নিরঙ্কুশ হবে কি করে? নির্মুক্ত না হলে কইবে কি করে মনের কথা?

তাই তাঁর সঙ্গে খেল, যে এই সৃষ্টির আসল খেলুড়ে। মাটিতে বীজ পুঁতলে অঙ্কুর হয়, এ কৃষকের গুণ নয়, সৃষ্টিকর্তার নিয়মের গুণ। অঙ্কুরের মধ্যে তাঁকে দেখ। তাঁর নিয়ম দেখাই তাঁকে দেখা।

সাধুরা ধুনি জ্বালায় কেন? শীতের থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে, না, গাঁজা খাবার জন্যে?

মোটেই না। কাম-ক্রোধকে ইন্ধন করে আহুতি দেবার জন্যে। কাঠের একটা করে কুঁদো নেয়, কোনোটাকে কাম ভাবে কোনোটাকে বা ক্রোধ। আর আগুনকে মনে ভাবে ইষ্ট, মনোবাঞ্ছার পরিপূর্তি! আগুনের কাছে বসে খুব তেজের সঙ্গে নাম করলে আগুনেরও দাহ-দীপ্তি বাড়তে থাকে। কাঠের কুঁদো ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত কেউ আসন ছাড়ে না, অবিশ্রান্ত নাম করে। নিরিন্ধন হয়ে যায়।

চিমটে কেন? ধুনি খোঁচাবার জন্যে?

মোটেই না। চিমটে হচ্ছে বাকসংযমের প্রতীক। যার জিহ্বা সংযত হয়নি, সে ধরতে পারবে না চিমটে।

আর কমণ্ডলু? জল খাবার জন্যে নিশ্চয়ই?

মোটেই না। টইটম্বুর করে জল রাখো কমণ্ডলুতে। নির্মল ঠাণ্ডা জল। জলের ঐ সাম্য শৈত্য ও স্থৈর্য তাদের সঙ্গে মনের যোগ রেখে সাধু ভগবানের নাম করে। সব সময়েই দেহ-মন ঠাণ্ডা থাকে, তপ্ত হয় না। চিত্ত অবিকৃত অচঞ্চল থাকে। মনে বিরাজ করে পক্ষপাত নিরপেক্ষ সমতা।

আর ত্রিশূলে? হিংস্র জন্তুর আক্রমণের থেকে বাঁচবার জন্যে?

মোটেই না। সত্ত্ব রজ আর তম এই তিন গুণ যার করায়ত্ত, সেই-ই ত্রিশূল ধারণের অধিকারী।

'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো, তাই তোমার নাকি খুব নিন্দে হয়েছে?' ঠাকুর জিগগেস করলেন বিজয়কে।

বিজয় চুপ করে রইল।

'যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি। জাগ্রতে স্বপ্নে সে চিরস্থির, একাবস্থ। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। তোমাকে কত কি বলবে, কত নিন্দে কত কটূক্তি। যেহেতু তুমি আন্তরিক ভগবানকে চাও তুমি সব সহ্য করবে। টলবে না গলবে না।'

বিজয় হাসল।

'দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকেও কি ঈশ্বরচিন্তা হয় না?' সরল শিশুর মত ঠাকুর বললেন, 'দেখ না বনের মধ্যে ঈশ্বরকে ডাকত কেমন ঋষিরা। চারদিকে বাঘ ভালুক, তবু সাধনার থেকে নিবৃত্তি নেই। যেমন নিন্দুক আছে তমনি আবার সৎসঙ্গও আছে। মাঝে-মাঝে সৎসঙ্গ করা বড় দরকার।'

বিজয় বললে, 'সময় কই? কাজে আবদ্ধ হয়ে আছি।'

'তোমার আচার্যের কাজ। অন্যের ছুটি হয় কিন্তু আচার্যের ছুটি নেই।'

'ছুটি নেই?'

'আচার্যের নেই। দেখনি নায়েব যদি এক ধার শাসিত করতে পারে, জমিদার তাকে আরেক ধার শাসন করতে পাঠায়।'

বিজয় বললে, 'আপনি একটু আশীর্বাদ করুন।'

'ও সব অজ্ঞানের কথা। আমি কে! আশীর্বাদ ঈশ্বর করবেন।'

লোকলজ্জা ত্যাগ করে সেই অনন্তের নাম কীর্তন করো। তুমিই তো চলমান তীর্থ।

রাতের অন্ধকারে গোদোহন করছে, কালপ্রেরিত সাপ এসে নারদজননীকে দংশন করল। মায়ের মৃত্যুকে নারদ ভগবানের অযাচিত কৃপা বলে মনে করল। চলে গেল গৃহ ছেড়ে। গভীর অরণ্যে গিয়ে বসল এক অশ্বত্থ গাছের নিচে। বুদ্ধিকে সংযত করে অন্তরাত্মায় স্থাপন করল। কি হল তারপর? প্রেমভরে দেহ পুলকিত হতে লাগল, দু-চোখ ভরে উঠল প্রেমাশ্রুতে। দ্বিতীয় কোনো সত্তার আর জ্ঞান থাকল না। তখন হৃদয় মধ্যে ভগবানের সর্বশোকাপহ দিব্যভাস্বরকলেবর অপরূপ রূপ আবির্ভূত হল। কিন্তু আবির্ভূত হয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। এ কি, কোথায় পালালে? বিহ্বল ব্যাকুল হয়ে উঠে পড়ল নারদ। খোঁজাখুঁজি করতে লাগল এখানে-ওখানে।

কোথায় সেই ভুবনমনোমোহন মূর্তি! তাকে বাইরে খুঁজছি কোথায়? তাকে তো দেখেছিলাম অন্তরের অন্তঃপুরে। সুতরাং আবার মন স্থির করে বসি। নারদ শান্তসংকল্প হয়ে বসল সেই বৃক্ষতলে। বসল প্রেমধ্যানে। কিন্তু কোথায়, কোথায় সেই মণ্ডল-মণ্ডন সুমোহন! আর্ত, আতুর ও অস্থির হয়ে উঠল নারদ। তখন আকাশপথে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হল—হায়, তুমি আর আমার দেখা পাবে না এ জন্মে। তোমাকে যে একটিবার মাত্র দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছি তা শুধু তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যে। যারা কুযোগী, যাদের আন্তর মালিন্য বিদূরিত হয়নি, তারা তো আমার একবারমাত্রও দর্শন পায় না। তুমি যে পেয়েছ তা শুধু তুমি নিষ্পাপ বলে। কিন্তু সর্বক্ষণই যদি দেখ কোথায় পাব তোমার এই আর্তি, এই অনুরাগ, এই খরতরা ব্যাকুলতা!

সেই থেকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ধারণ করে দেবদত্ত বীণার ঝঙ্কারে হরিগুণ গান করতে-করতে পৃথিবী পর্যটন করছে নারদ।

'আমিও চোখ বুজে ধ্যান করতুম।' বিজয়কে বললেন ঠাকুর। 'শেষে ভাবলুম, চোখ বুজলেই ঈশ্বর আছেন আর চোখ খুললে তিনি নেই, এ কথনো হতে পারে? চোখ খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ জীবজন্তু গাছপালা চন্দ্র-সূর্য তারা-তৃণ সব তিনি।'

কিন্তু আমরা তোমাকে দেখি কোথায়? অন্তর অস্বচ্ছ, চর্মচক্ষুও অপরিচ্ছন্ন, আমাদের কি করে দর্শন হবে?

আমাদের শ্রবণই দর্শন। আমরা যে তোমার কথা শুনেছি সেই আমাদের তোমাকে দেখা। আমাদের না দেখেই ভালোবাসা। আমাদের শুধু বাঁশি শুনেই অভিসার। আমাদের অনুপলব্ধিই প্রমাণ।

তোমাকে দেখে তুমি সুন্দর এ বলা কত সহজ। কিন্তু আমরা না দেখেও বলতে পারি তুমি সুন্দরতম, তুমি মধুরতম, তুমি মঙ্গলতম।

কাটোয়ার বৈষ্ণব ঠাকুরকে জিগগেস করলে, 'মশায়, পরজন্মের কথা কিছু বলতে পারেন?'

'এ জন্মের কথা বলতে পারি।'

বৈষ্ণব বাবাজী তাকিয়ে রইল ফ্যাল-ফ্যাল করে।

'এ জন্মের সার কথা ঈশ্বরে ভক্তিলাভ। ঈশ্বরে ভক্তিলাভের জন্যেই মানুষ হয়ে জন্মেছ। সেই জন্মস্বত্ব অর্জন করো।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু মরবার পর আবার কি জন্ম হবে?'

'গীতায় বলেছে, যে যা ভেবে দেহত্যাগ করবে তার সেই ভাব নিয়ে জন্ম হবে। হরিণকে চিন্তা করে ভরতরাজার হরিণজন্ম হয়েছিল।'

'এটা যে হয় তা কেউ চোখে দেখে বলে, তবে তো বিশ্বাস করতে পারি।'

'তা জানি না বাপু। নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না—আবার মলে কি হয়!'
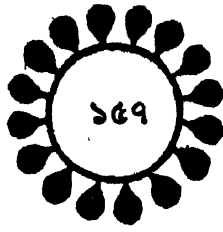
ঈশ্বর নাবালকের অছি।
ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চায় সে তাই পায়।
জগৎ দেখলেই বোঝা যায় ঈশ্বর আছেন।
ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক। যদি কারু উপর জোর চলে সে একমাত্র ঈশ্বরের উপর।
ঈশ্বরকে মা বলে ডাকতেই শান্তি। ঈশ্বরকে মা বলে ডাকলেই শীঘ্র ভক্তি হয়, ভালোবাসা হয়।
সব ঠাকুরের কথা।
তাই মা-মা করো। নাম করো। নামে যদি অরুচি হয় তার ওষুধও ঐ নামই। যখন পিত্তরোগে মুখ তেতো হয় তখন মিছরিও তেতো লাগে। সেই তিক্ততার ওষুধও ঐ মিছরিই। খেতে-খেতে দেখবে ঐ তেতো মুখেই আবার মিষ্টি লাগতে সুরু করেছে। আনন্দ না পেলে নাম করব না যখন ভালো লাগবে তখন নাম করব, এ ভাব পাটোয়ারি। ভালো লাগুক আর না লাগুক নাম করতেই হবে। তৃণের মত নত হয়ে বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে অমানীকেও মান দিয়ে নিরভিমান হয়ে নাম করো। তা হলেই নামের ফল পাবে। নামের ফল আর কি? নামের ফল মহানন্দ।
মা বলে ডাকো। শুষ্কতা লাগবে না, অরুচি ধরবে না। আরো সব চেয়ে সুবিধে, কিছু প্রার্থনাও করতে হয় না মা'র কাছে। মা বলে ডাকলেই মানুষ পবিত্র হয় নিমেষে। মা বলে ডাকলেই মনে হয় পাশের ঘরে আছেন, এখুনি আসবেন ব্যাকুল হয়ে।
যদু মল্লিকের মাকে বললেন, 'যখন মৃত্যু আসবে সেই সংসারচিন্তাই আসবে। ছেলেমেয়ের চিন্তা, উইল করবার চিন্তা, বাড়িঘরের চিন্তা। ঈশ্বরচিন্তা আসবে না।'
'উপায়?'
'উপায় তাঁর নামজপ নামকীর্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে তবেই মৃত্যু-কালে তাঁর নাম মুখে আসবার আশা।'
কিন্তু যতক্ষণ ভোগ আছে ততক্ষণ যোগ হবে কি করে? ভোগাসক্তি ত্যাগ হলেই শরীর যাবার সময় মনে পড়বে ঈশ্বরকে।
তাই তাড়াতাড়ি ভোগের পালা শেষ করে নাও। নটবর পাঁজা যখন ছেলেমানুষ

তখন রাসমণির বাগানে গরু চরাত। তার অনেক ভোগ ছিল। তাই রেড়ির তেলের কল করে অনেক টাকা করেছে। দেখনি আলমবাজারে তার রেড়ির কলের ব্যবসা? বিধিপূর্বক যে ভোগ তাতে শাম্য হয়। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে যে ভোগ তার নাম উপভোগ। উপভোগে শাম্য নেই। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। এর অর্থ এ নয়, কামীদের কাম ভোগের দ্বারা উপশম হয় না। এর অর্থ হচ্ছে কামীদের কাম উপভোগের দ্বারা উপশম হয় না। ভোগ হচ্ছে শাস্ত্রসম্মত ভোগ আর উপভোগ হচ্ছে স্বেচ্ছাচারপ্রসূত ভোগ।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিয়ে করল যযাতি। দৈত্যরাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা যযাতির রাজপুরীতে বন্দিনী, দেবযানীর দাসীত্ব তার আমরণ অভিশাপ। সেই শর্মিষ্ঠারই ছেলে পুরু। দাসীগর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্যে যযাতিকে শাপ দিল শুক্রাচার্য। এই শাপ যে, যৌবনেই যযাতি জরাপ্রাপ্ত হবে। একটু দয়াও করল দৈত্যগুরু। সঙ্গে এই বর দিল, যদি কেউ রাজী থাকে তা হলে এই জরা তাকে দান করে তার যৌবন সে চেয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কে রাজী হবে এই দুর্ব্যাপারে? ক্রমান্বয়ে জ্যেষ্ঠ চার-চার ছেলের কাছে গিয়ে যযাতি মিনতি করল, প্রত্যেকের কাছেই মিলল প্রত্যাখ্যান। তখন কনিষ্ঠ ছেলে পুরুর কাছে গিয়ে যযাতি দাঁড়াল কাতরচক্ষে। পুরু রাজী হয়ে গেল। পিতার জরা চেয়ে নিয়ে নিজের নব-যৌবন বাপকে দান করল। দেবযানীকে নিয়ে পুনরায় বিষয়ভোগে মত্ত হল যযাতি। দু-চার বছর নয়, পূর্ণ সহস্র বৎসর।

তখন যযাতি দেবযানীকে বললে, 'পৃথিবীতে যত শস্য, যত স্বর্ণ, যত স্ত্রী যত পশু আছে সমস্ত পেলেও কামপূত পুরুষের মন তৃপ্ত হয় না। উপভোগে কামনার নিবৃত্তি নেই, বরং ঘৃতাহুত বহ্নির মত কেবলই বাড়তে থাকে। পুরুষ যখন সর্বভূতে মঙ্গলভাব পোষণ করে, সমদৃষ্টি হয় তখনই তার কাছে দিঙ্মণ্ডল সুখময় হয়ে ওঠে। যে তৃষ্ণা দুস্ত্যজা, শরীর জীর্ণ হলেও যা জীর্ণ হয় না, সতত দুঃখপ্রদ, এই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করতে পারলেই কল্যাণ। এক হাজার বছর অবিরাম বিষয়সেবা করলাম, তবুও তৃষ্ণার পার পেলাম না। তাই ঠিক করেছি এবার সকল বিষয় ত্যাগ করে পরব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করব, নির্দ্বন্দ্ব ও নিরহঙ্কার হয়ে অরণ্যের হরিণের সঙ্গে যথেচ্ছ বিচরণ করব।'

পুরুকে ডেকে পাঠালেন যযাতি। তার যৌবন তাকে ফিরিয়ে দিলেন, তুলে নিলেন নিজের জরাভার। তাকে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন গহনারণ্যে। অক্লেশে, নিস্পৃহ নির্বিঘ্ন চিত্তে। নীড়ত্যাগী জাতপক্ষ পাখির মত।

দিব্যানুভবে দেবযানীও উদ্দীপ্ত হল। বুঝল সমস্তই ভগবন্মায়া, বিষয়সঙ্গ স্বপ্ন-তুল্য, কারু কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, সকলেই ঈশ্বরপরতন্ত্র, আর এই যে সুহৃৎ-সন্নিবাস এ হচ্ছে পানশালায় আসা কতকগুলো তৃষ্ণার্ত লোকের সঙ্গে ক্ষণমিলন। হে বাসুদেব, তুমিই সর্বভূতাধিবাস, তুমিই বৃহৎশান্তি, তোমাকে প্রণাম। এই বলে দেবযানী দেহ রাখল।

খুব সংগ্রাম করো, লোভের সঙ্গে পাপের সঙ্গে প্রবৃত্তির সঙ্গে। সংগ্রাম আরম্ভ

হলেই বুঝবে ধর্মজীবন আরম্ভ হল। অগণন তোমার শত্রু কিন্তু তোমার একমাত্র অস্ত্র নামমন্ত্র। জানি তুমি বারে-বারে পড়বে, আবার বারে-বারে ওঠো গা-ঝাড়া দিয়ে। প্রতিপদে পরাস্ত হতে-হতে যখন একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়বে, চারদিক অন্ধকার দেখবে, তখনই বুঝবে তোমার একলার ক্ষমতায় কিছু হবার নয়। তখনই তুমি উপলব্ধি করবে, তুমি অধম-অক্ষম অকর্মণ্য-অসমর্থ, তখনই তুমি প্রবল কোনো বন্ধুর সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াবে, বুঝবে সে ছাড়া তোমার গতি নেই। সে শুধু প্রবল নয়, সে অপরাভূয়। তীব্র তপস্যায় হবে না, না কঠিন বৈরাগ্যে, না বা নিদারুণ সাধন ভজনে। যখন বুঝবে তুমি দীনহীন পতিত-কাঙাল, তখনই তুমি প্রাণের থেকে ডাকবে ঈশ্বরকে, সে ডাক আর তোমার শেখানো বুলি হবে না। সে ডাকই ডেকে নিয়ে আসবে তাঁর কৃপা। শরণাগতিই নিয়ে আসবে শতশৃঙ্গ পর্বতের আশ্রয়। তখনই বুঝবে তাঁর কৃপাই সার। সাধন-ভজন কেন? সংগ্রাম কেন? তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়, এটুকু পরিষ্কার বোঝবার জন্যেই সাধন-ভজন। যত যুদ্ধ-বিগ্রহ।

কর্ণেল অলকট কলকাতায় এসেছে।

'কে অলকট?'

'প্রকাণ্ড একজন থিয়োসফিস্ট। মানে ঈশ্বরজ্ঞানী।'

'সে কি করেছে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে।'

'সে কি, তার নিজের ধর্ম কি দোষ করল?' ঠাকুর যেন আহত হলেন। 'তার নিজের ধর্ম সে ছাড়ল কেন? তার ধর্মে কি ঈশ্বরজ্ঞানের ঘাটতি পড়েছে?'

সুরেন মিত্তির আফিস-ফেরতা ঠাকুরকে দেখতে এসেছে। হাতে চারটি কমলা লেবু আর দুই গাছা ফুলের মালা।

রাত প্রায় আটটা। ঠাকুর বসে আছেন বিছানার উপর। দু-একজন ভক্ত এদিকে-ওদিকে।

'আফিসের কাজ সেরে এই সবে এলাম। আরো আগে কি আসতে পারতাম না? আগে আসতে হলে আফিসের কাজ শেষ না করে আসতে হয়। সেটা কি ভালো?'

ঠাকুর ইঙ্গিত করলেন, ভালো নয়।

'দুই নৌকোয় পা দিয়ে লাভ কি? তাই কাজ সেরেই চলে এলাম।'

হ্যাঁ, কাজ সেরেই চলে এস। কিন্তু যতক্ষণ কাজ না সারা হয় ততক্ষণ উন্মনা হয়ে থাকো, কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছুবে। এই উন্মনা হয়ে থাকাটিও ঈশ্বরকৃপা।

'তাছাড়া আজ নববর্ষ। তার উপর আবার মঙ্গলবার। কালীঘাটে যাওয়া হল না।' সুরেনের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ভাবলাম যিনি কালী, যিনি কালী ঠিক চিনেছেন, তাঁকে দর্শন করলেই হবে।'

ঠাকুর মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

'গুরুদর্শনে সাধুদর্শনে কিছু ফুল-ফল আনতে হয় শুনেছি। তাই এগুলি আনলাম।'

ঠাকুর নিলেন তা হাত বাড়িয়ে।
মনে পড়ল একদিন তার দেওয়া মালা ঠাকুর নেননি, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সে মালায় অহঙ্কারের স্পর্শ ছিল, অনেক টাকা খরচ করে এই মালা এনেছি, ছিল সেই আভিজাত্যের ঝাঁজ। মালা ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর প্রথমটা সুরেনের রাগ হয়েছিল, ভেবেছিল রাঢ় দেশের বামুন এ সব জিনিসের মর্যাদা কি বুঝবে! পরে খানিক পরে তার চেতনা হল। বুঝল ভগবান পয়সার কেউ নন, অহঙ্কারের কেউ নন, লোকমান্যের কেউ নন, তিনি শুধু দীনহীন অকিঞ্চনের। আমি অহঙ্কারী, আমি কামকামী, আমি হঠবাদী, আমার পূজা কেন তিনি নেবেন! কেন তিনি বরদাস্ত করবেন এই ঔদ্ধত্য এই ক্ষুদ্রতা? আমার ইচ্ছে নেই বাঁচতে।
দু-চোখ বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল সুরেনের। তখন সেই বিক্ষিপ্ত মালা কুড়িয়ে নিয়ে গলায় পরলেন ঠাকুর। নৃত্য করতে লাগলেন।
সেদিনের কথা।
'আজ যে এ দু-গাছা মালা এনেছি তার মোটে চার আনা দাম।'
ঠাকুর আবার নীরবে হাসলেন।
সুরেন বললে, 'ভগবান তো পয়সা দেখেন না, মন দেখেন। কারু হয়তো একটি পয়সা দিতে কষ্ট আর কেউ হয়তো একমুঠো ধুলোর মত এক হাজার টাকা ফেলে দিতে পারে অক্লেশে। ভগবান জিনিসে নয় হৃদয়ে। উপকরণে নয় ভক্তিতে।'
ঠাকুর কথা বলতে পারছেন না, স্নিগ্ধ হেসে সায় দিলেন।
'কাল সংক্রান্তি, তাই আসতে পারিনি। কাল শুধু আপনার ছবিটিকে ফুল দিয়ে সাজালুম।'
এই সেই সুরেন, ঠাকুর যাকে সুরেশ বলে ডাকতেন, এক নম্বরের মাতাল, গিরিশেরই যমজ ভাই। কিন্তু সেই মদ কোথায়? একটুখানি বেঁকিয়ে দিলেন ঠাকুর। মদ-মাতালকে মন-মাতাল করে দিলেন।
'তুমি আফিসে মিথ্যা কথা কও, তবু তোমারটা খাই কেন!' ঠাকুর তাকে বলেছিলেন একদিন। 'খাই তোমার যে দানধ্যান আছে। তোমার যা আয় তার চেয়েও তোমার বেশি দান। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি। কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, যেহেতু তা সৎকাজে যায়। যার দানধ্যান তারই ফললাভ।'
'কিন্তু আমার ধ্যান জমে না কেন?' দুঃখ করেছিল সুরেন।
'না জমুক। স্মরণ-মনন আছে তো!'
'আজ্ঞে, মা-মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি।'
'আহা হা, তাহলেই হল। মা-মা বলে ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই ভালো।'
আর কিছু নয়। শুধু মাকে ডাকো। মাকে প্রণাম করো!
রৌদ্রাকে প্রণাম, গৌরীকে প্রণাম। নিত্যা যে ধাত্রী, তাকে প্রণাম। চিরজ্যোৎস্নাকে প্রণাম। প্রণাম সুখস্বরূপাকে। বৃদ্ধিসিদ্ধিরূপিণীকে প্রণাম, সর্বাণী ভূভৃৎলক্ষ্মীকে প্রণাম, প্রণাম আবার মা'র রাক্ষসীমূর্তিকে। তুমি দুর্গা দুর্জ্ঞেয়া আবার দুর্গপরা। তুমিই সর্বকারিণী স্থিরাংশরূপিণী। তুমিই অতিসৌম্যা অতিরৌদ্রা করুণাময়ী ব্যথা-

হ্যারিণী আবার অপগতবাসনা প্রকটিতবদনা ভয়ঙ্করী। দৃষ্টিসম্পাতমাত্র যদি তোমাকে না চিনি সহস্র চক্ষু পেলেও তোমাকে চিনব না। তুমি এত সরল এত সহজ এত সন্নিহিত। তোমার হাতের মার খেয়ে যখন কাঁদি তখনও তা আনন্দেরই উচ্চারণ। দুঃখ-দারিদ্র্য যে ভোগ করি সেই ভোগের মধ্যেও আনন্দ। যোগ-দৃষ্টি কোথায় পাব? তোমার কৃপাই আমার যোগ-চক্ষু।

ছোট চৌকিতে শুয়ে আছেন ঠাকুর, পায়ের কাছে বসে ঠাকুরের পা টিপে দিচ্ছে গঙ্গাধর। হঠাৎ ঠাকুরের দু-পায়ের দুটো বুড়ো আঙুল নিয়ে নিজের কপালে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক আঁকতে লাগল।

'ও কি, কি হচ্ছে!'

'আপনি যে বলেন যারা সাত্ত্বিক তারা গঙ্গাস্নান করতে-করতে গঙ্গাজলে তিলক দেয়। আমি আজ তেমনি সাত্ত্বিক তিলক দিচ্ছি।'

হরিপ্রসন্ন চাটুজ্জে মানে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বেলায় কি করলেন! জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁরে তুই কুস্তি লড়তে পারিস?'

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, সুগঠিত সুন্দর। ঠিক পালোয়ানের মত দেখতে। দেখতে কি, সত্যি-সত্যি কুস্তিগির পালোয়ান। দুশো-আড়াইশো করে ডন-বৈঠক দেয় রোজ। প্রায় লোহা চিবিয়ে খায়।

'দেখি না, আমার সঙ্গে লড় না এক হাত!' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর।

এ কেমনতরো সাধু! হরিপ্রসন্ন তো অবাক। সাধু কিনা কুস্তি লড়তে চায়। এমনতরো তো কোথাও শুনিনি!

'আয় না, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' তাল ঠুকতে-ঠুকতে হরিপ্রসন্নর দিকে এগুতে লাগলেন ঠাকুর। তার দু-হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে তাকে ঠেলতে লাগলেন পিছনের দিকে।

আর পেছপা হয়ে থাকা যায় না। হরিপ্রসন্নও ঠেলতে লাগল। হারিয়ে দিল ঠাকুরকে। তাঁকে ঠেলতে-ঠেলতে একেবারে ও-দিকের দেয়ালে তাঁকে চেপে ধরল।

ঠাকুর তবু হাসছেন। 'কি রে, হারিয়েছিস তো?'

হারিয়েছি! হরিপ্রসন্নর সমস্ত শরীর শির-শির করে উঠল। বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত কি একটা আশ্চর্য শক্তি যেন তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে। মুহূর্তে অবসাদে শিথিল হয়ে এল হরিপ্রসন্ন। ঠাকুর তাকে ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'কি রে, হারিয়েছিস তো?'

ভক্ত ও ভগবানের লড়াইয়ে কে হারে কে জেতে কে বলবে! যতক্ষণ লড়াই করেছিলে তন্ময় হয়ে ছিলে। প্রীতিতে বরং বিচ্যুতি ঘটে শত্রুতায় বিচ্যুতি নেই। সুতরাং ঈশ্বরের বন্ধু হতে না পারো শত্রু হও। বৈরানুবন্ধে যেমন তন্ময়তা তেমন তন্ময়তা ভক্তিযোগেও হয় না। অখিলাত্মা ঈশ্বরের তো কোনো ভেদজ্ঞান নেই। তিনি যদি কাউকে দণ্ড দেন নিজের সুখের জন্যে নয়, জীবের হিতের জন্যে। তাই বৈরিতা ভয় স্নেহ কাম যে উপায়ে হোক তাঁর সঙ্গে যুক্ত হও। এক উপায় আরেক উপায়ের বিরোধী, তা মনে কোরো না।

তাই ঈশ্বরের সঙ্গে করমর্দন করতে না পারো কুস্তি করো। প্রেমে আলিঙ্গন না হয় মল্লযুদ্ধে আলিঙ্গন।

প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা না এলে ঈশ্বরতাৎপর্য বুঝবে না। কান দিয়ে আলোকের জ্ঞান হয় না, চোখ দিয়ে হয় না শব্দের। তেমনি মেধার দ্বারা নয়, বহু শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা নয়, একমাত্র প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা দিয়েই প্রেমের অনুভব। প্রসন্নোজ্জ্বল হবে কিসে? একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাস্পর্শে। *

কর্মও চাই, কৃপাও চাই। পুরুষকারও চাই, দৈবও চাই। উভয়ের সমাবেশেই সিদ্ধি। পর্জন্য সলিল বর্ষণ করলে কি হবে, ক্ষেত্রে যদি না কর্ষণ থাকে। পুরুষকার যোগে কর্ম, দৈবযোগে সিদ্ধি। দৈবশূন্য পুরুষকার নিষ্ফল আর পৌরুষশূন্য দৈবও অসম্ভব। তাই কর্ম দিয়ে কৃপা আকর্ষণ করো। ক্লান্ত হলেই পাবে কৃপার সমীর স্পর্শ।

কুরুক্ষেত্র জয়ের পর রাজশ্রী ত্যাগ করবার সংকল্প করলেন যুধিষ্ঠির। ভায়েদের বললেন, আমি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ করে বনে প্রবেশ করব। মিতাহারী ও চর্মচীর জটাধারী হয়ে দুই-সন্ধ্যা স্নান করে হুতাশনে আহুতি দেব। ফলমূল খেয়ে মৃগ-যূথের সঙ্গে সঞ্চরণ করব। ক্ষুৎ-পিপাসা শ্রান্তি শীত আতপ ও বায়ু সব ক্লেশ সহ্য করে শরীর শুষ্ক করব। একাকী প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক-একদিন অতিবাহিত করতে-করতে প্রাণান্তকাল প্রতীক্ষা করব। গ্রামবাসী কি বনবাসী কারুর অপকার করব না, কারুর প্রতি কখনো ভ্রূভঙ্গী বা উপহাস করব না। কাউকে পথ জিজ্ঞাসা করব না, শূন্য চিত্তে যে কোনো একটি পথ ধরে চলে যাব। স্বভাব সকলের আগে-আগে যায়, সেই কারণে আমাকে হয়তো বা গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হবে, কিন্তু আমি তখনই তার দ্বারস্থ হব যখন তার গৃহ ধূমহীন, অগ্নিহীন, অতিথিসঞ্চারবিরহিত। তাকে ব্যস্ত করব না, যদি না জোটে থাকব নিরাহারে। আশাপাশে বাঁধা পড়ব না, বাতাসের মত সর্বলোকের অনায়ত্ত থাকব। লাভ-ক্ষতি নিন্দা-স্তুতি শোক-হর্ষ শুভ-অশুভ সব আমার পক্ষে সমান হবে। দেহমাত্র ধারণ করব কিন্তু কোনো কাজে লিপ্ত হব না। বিষয়াবাসনাপরতন্ত্র হয়ে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করেছি। এখন বৈরাগ্যেই আমার শাশ্বত সন্তোষ। এই নির্ভয় পথে চলতে-চলতে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বেদনায় অভিভূত এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আমি ত্যাগ করব।

অর্থবিষয়িণী বুদ্ধি তিরোহিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরকে ভীম আর অর্জুন, নকুল আর সহদেব, এমন কি দ্রৌপদী কঠোর ভাষে তিরস্কার করতে লাগল। অর্জুন বললে, উদ্যমহীন ভিক্ষুক, ভীম বললে, ক্লীব অকৃতী। দ্রৌপদীও বিদ্যুল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ধিক! পূর্বে দ্বৈতবনে তোমার ভায়েরা শীতে আতপে পরিক্লিষ্ট হলে তুমি বলেছিলে দুর্যোধনকে বিনাশ করে সসাগরা বসুন্ধরাকে উপভোগ করাবে। কিন্তু এখন কেন এই গিরিকাননসমন্বিতা সদ্বীপা পৃথিবীকে পরিত্যাগ করতে চাইছ? তুমি বিদ্যা দান সন্ধি যজ্ঞ বা যাচ্ঞা দ্বারা এ পৃথিবী লাভ করোনি। গজাশ্বরথ-সম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় বীরদের সংহার করে অধিকার করেছ। পুরুষশার্দুলের মত

ব্যবহার, এখন কেন এই হীনতা? তোমার প্রমত্ত গজেন্দ্র সদৃশ ভায়েদের দিকে দেখ, অরাতিতাপন অমরসদৃশ তোমার ভায়েরা চিরদুঃখভোগী, এদের আহ্লাদবর্ধন করা কি তোমার কর্তব্য নয়? শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিরাই বৈরাগ্য ও বানপ্রস্থের কথা চিন্তা করে।'

দ্রৌপদীর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ভীমার্জুন আবার কটূক্তি করতে লাগল।

যুধিষ্ঠির বললেন, তোমরা কেবল অসন্তোষ প্রমাদ মদ মোহ রাগ দ্বেষ বল অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হয়ে রাজ্যভোগে বাসনা করছ। ওসব ত্যাগ করে প্রশান্ত হও। যে রাজা এই অখিল ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁরও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নেই। একদিন বা এক বছর ছেড়ে দি, যাবজ্জীবন চেষ্টা করলেও কেউ আশা পূর্ণ করতে পারে না। অগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হলেই জ্বলে আর কাষ্ঠশূন্য হলেই শান্ত হয়, অতএব তুমি অল্পাহার দ্বারা সমুদ্দীপ্ত জঠরানলের সান্ত্বনা কর। মূঢ় ব্যক্তিই কেবল নিজের উদরপূরণের জন্যে অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে। সুতরাং আগে উদরকে পরাজয় কর, তাহলেই সমস্ত পৃথিবী পরাজিত হবে। রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা উভয়েই ধর্ম ও অধর্ম আছে, তোমরা তা পরিত্যাগ করে মহৎভাব থেকে বিমুক্ত হও। যে নরপতির ভূমণ্ডলে অখণ্ড প্রভুত্ব তাকে কৃতকার্য বলা যায় না, যার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান তিনিই কৃতকার্য। অতএব সংকল্পিত বিষয়ে নিরাশ, নিশ্চেষ্ট ও মমতাশূন্য হয়ে অক্ষয় পদলাভের চেষ্টা করো। ভোগাভিলাষপরিশূন্য ব্যক্তিই নির্ভয়নির্মুক্ত। ভোগ্যবস্তুই বন্ধন, ভোগ্যবস্তুই কর্মবলে কীর্তিত। এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিই পরম পদে আরোহণ।

জনকরাজা কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, কিন্তু আমার কিছুই নেই। এই মিথিলা নগরীমধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।

প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে এসে অশোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিস্পৃহ হও। বুদ্ধিপূর্বক চতুর্দিক অবলোকন কর। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হও। যে যথার্থ বুদ্ধিমান ঈশ্বর তারই আয়ত্ত।

'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।'

ঠাকুর বললেন, 'ব্রহ্ম অচল অটল নিষ্ক্রিয় বোধস্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধস্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়। ন্যাংটা বলত, মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধস্বরূপে।'
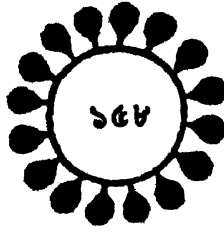
অল্পবয়সী ছাত্র, কিন্তু ঈশ্বরে দুরন্ত ব্যাকুলতা। ব্রাহ্ম, তবু এসেছে কালীমন্দিরে। কালীঘরের দরজার সামনে বসে প্রাণ ঢেলে গান গাইছে।

কে গায় রে?

ভূপতি। ভাই ভূপতি।

ঠাকুর কান পেতে শুনলেন গান। কি সুন্দর গাইছে! অপূর্বের দ্বার যেন খুলে গেছে নিমেষে :

'হরি কাণ্ডারী যেমন
এমন কি আর আছে নেয়ে!
পার করে দীনজনে
অভয় চরণ-তরী দিয়ে।'

ভাবাবেশে কাছে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুর। 'এই নে'। বলে ভূপতির বুকের উপর পা তুলে দিলেন।

ভূপতি চোখ চাইল।

এ কে! এ যে তার সেই ইষ্টদেবতা, সচ্চিৎসুখ, পূর্ণসনাতন।

আর যায় কোথা! লেখাপড়ার মন উবে গেল আস্তে-আস্তে! সর্বক্ষণই সে পদচ্ছায়ার আশ্রয়ের কাছে ঘোরাফেরা করে। যদি সংসারের টানটুকু কাটিয়ে দেন! যদি টেনে রাখেন তাঁর কোলের কাছটিতে।

সেদিন বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের মত বসে আছেন ঠাকুর। সর্ব অঙ্গে ঈশ্বর-আবেশ। 'দেখ, দেখ, কি নির্মলশনিরাময় প্রেমমূর্তি!' গদ্‌গদ ভাষে বলে উঠল মহিমাচরণ। ভূপতি স্তব শুরু করল। 'তুমিই স্বরাট বিরাট। নরোত্তম নারায়ণ। শাস্ত্রে-বাদে বনে-দুর্গে জ্বরে-ঘোরে সংগ্রামে-সংকটে বিজনে-শ্মশানে তুমিই একমাত্র রক্ষাকর্তা। পদ্মদলায়তলোচন, দয়াঘন, আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো। সংসার-দাবদহনাতুর আমি, সর্বত্রই আমার ভয়, তুমি আমাকে নিঃসংশয় করো। শরণাগতির শরদম্বরকান্তি আনো আমার মধ্যে।' পরে গান ধরল :

'চিদানন্দসিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।'

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর একটি সলজ্জ শিশুর মত হয়ে গেলেন। বললেন, 'কি যেন একটা হয় এই আবেশে। যেন ভূতে পায়, আমি আর আমি থাকি না। এখন ভারি লজ্জা হচ্ছে। এখন গুনতে বলো, গুনতে পর্যন্ত পারি না। এক, সাত, আট এই রকম হয়ে যায়।'
'সবই তো সেই এক।' বললে নরেন, 'একের সঙ্গে এক যোগ করেই সমস্ত।'
'না। এক আর এক, দুই। সমাধি হচ্ছে সেই এক-দুয়ের পার।'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত।' বললে মহিমাচরণ।
'যাই বলো, হিসেব থাকে না, হিসেব পচে যায়।' বললেন ঠাকুর, 'হিসেব করে সে হিসেবের নিকেশ করে কার সাধ্য? হাতে একখানা বই দেখি, বড়জোর রাজর্ষি বলতে পারি। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বলি কাকে? ব্রহ্মর্ষির কোনো চিহ্ন নেই। চিহ্ন থাকবে কি করে? ব্রহ্ম বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র সমস্ত কিছুর পার।'
আরেকদিন ঠাকুরের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে করজোড়ে বসে আছে ভূপতি। চোখের পলক ফেলতে দিচ্ছে না। যতই কেন না চক্ষুকে নিষ্পলক করি তুমি যদি না দেখাও, তুমি যদি না চক্ষুকে দ্যুতিমান করো, সাধ্য কি আমার দর্শন হয়! আর যতক্ষণ না দর্শন হয় ততক্ষণ আর কিছুই দেখব না চারদিকে। হে দীপপ্রদ, এই অন্ধতার অন্ধকার দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দাও।
'এতই যখন সাধ দেখবার দ্যাখ চোখ মেলে।' ভাববিহ্বল মূর্তিতে ঠাকুর দাঁড়ালেন প্রকটিত হয়ে।
এ কাকে দেখছে ভূপতি? তার হৃদয়সংকল্পিত প্রাণবল্লভকে? এ কি, এ তো একজন নয়, এ যে তিনজন একাধারে। চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ আর পঞ্চবক্ত্র। হংস, গরুড় আর বৃষ।
তন্ময়ের মত প্রণাম করল ভূপতি। যা বলে-বুদ্ধিতে হবার নয়, না বা শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যে, সাধন-ভজনে, কর্ম-কাণ্ডে, যোগ-জপ-তপস্যায় তা সাধ্য হবে শুধু একটি-মাত্র নমস্কারে।
নিজের দেহ-মন-প্রাণ একটি নমস্কারের পদ্মকোরকে সুসম্বদ্ধ করে তাঁর পায়ে নিবেদন করে দাও।
বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড়ই বেদ। বেদই বহন করে যজ্ঞ-পুরুষ বিষ্ণুকে। বিষ্ণুই জগদ্ব্যাপক চৈতন্য। পাখি যেমন দুই পাখা মেলে উন্মুক্ত আকাশের সন্ধান করে তেমনি গরুড়ের দুই পাখার এক হচ্ছে কর্ম, অন্য হচ্ছে জ্ঞান। আর উন্মুক্ত আকাশের নামই মোক্ষ।
গণেশের বাহন কি? গণেশের বাহন মূষিক। মূষিক কি করে? কেটে ছারখার করে। তেমনি তোমার কর্মফলগুলি কর্তন করো, ছেদন করো। কর্মফলমোচনের উপরেই সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। আর গণেশই সিদ্ধির দেবতা, সিদ্ধিদাতা। কর্মফলগুলি না কাটা পর্যন্ত পৌঁছুবে না সিদ্ধিদ্বারে।
শিবের বাহন কি? শিবের বাহন বৃষ। বৃষ মানে ধর্ম। আর শিব মানে? শিব মানে মঙ্গল। ধর্মই কল্যাণকে বহন করে নিয়ে আসে। বৃষটি শুভ্র কেন? সত্ত্ব

গুণের রঙটি শুভ্র। আর সত্ত্ব গুণের উদয়েই ধর্মের আবির্ভাব। বৃষের তো চার পা। ধর্মও চতুষ্পাদ। শৌচ দান দয়া ও তপস্যা এই তার চার ভিত্তি। যখন এই চতুষ্পাদ ধর্মের আচরণ করবে তখনই তোমার শিবদর্শন।
দুর্গার বাহন সিংহ। সিংহের ধর্ম কি? সিংহের ধর্ম হিংসা। অর্থাৎ তোমার জীবভাবকে হিংসা করো, হনন করো, জীবভাববিলয়ের মধ্যেই ব্রহ্মত্বের অভ্যুদয়।
এদিকে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেচক দিবান্ধ। আর মানুষ দিব্যান্ধ। অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষ আত্মজ্ঞানে অন্ধ ততক্ষণ লক্ষ্মী ধনেশ্বরী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পার্থিব সুখের অধিষ্ঠাত্রী হলেও আসলে লক্ষ্মী ব্রহ্মশক্তি। কিন্তু যতক্ষণ আত্মজ্ঞানে দৃষ্টিহীন ততক্ষণ এই ব্রহ্মশক্তির উপলব্ধি কোথায়?
কিন্তু সরস্বতী? সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা। তাঁর বাহন হংস। হংস মানে প্রাণ-বায়ু।
হং মানে নিশ্বাস, স মানে প্রশ্বাস। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যে মন্ত্রোচ্চারণ তাকেই বলে অজপা। আর যে অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তাকেই বলে হংসধর্মী। প্রতি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ হচ্ছে এই উপলব্ধি হলেই ব্রহ্মবিদ্যা। আর হাঁসের গুণ কি? দুধে জলে মিশেল হয়ে থাকলে জল ত্যাগ করে দুধটুকু গ্রহণ করে। তুমিও তেমনি নশ্বর থেকে ঈশ্বরকে সংগ্রহ করে নাও। তারি জন্যে হংসপৃষ্ঠে সরস্বতী।
আরো কটি ছোকরা এসেছে। একটির নাম মণীন্দ্র গুপ্ত। বয়েস পনেরো-ষোলো। কবি ঈশ্বর গুপ্তের দৌহিত্র। একদিন কি মনে করে এক বন্ধুর সঙ্গে শ্যামপুকুরে এসে হাজির। আর এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মারতে-মারতে একেবারে ঠাকুরের ঘরে।
বিছানায় শুয়ে ছিলেন ঠাকুর, হঠাৎ উঠে বসলেন। কে যেন এক আপনজন চলে এসেছে বিনা নিমন্ত্রণে। ইঙ্গিত করলেন কাছে আসতে। কাছে আসতেই গা-হাত-পা টিপে দেখতে লাগলেন লক্ষণগুলো। কানে-কানে বললেন, 'কাল আবার এসো। কেমন? কিন্তু কাউকে সঙ্গে এনো না। একা-একা এসো।'
রাত কি আর কাটে! দিন এলেও কাজ কি সহজে ফুরোয়?
সন্ধ্যের আগেই এসে হাজির হল মণীন্দ্র। ঠাকুর একেবারে তাকে কোলের মধ্যে তুলে নিলেন। বললেন, 'এত দিন ছিলি কোথায়?' বলেই সমাধিতে লীন হয়ে গেলেন।
সমাধিভঙ্গের পর কোল থেকে নামিয়ে দিলেন মণীন্দ্রকে। জিগগেস করলেন, 'কিছু একটা চাইবি?'
'চাইব।'
'চা।' সরল শিশুর মত বললেন ঠাকুর।
কি যেন খানিকক্ষণ চিন্তা করল মণীন্দ্র। তার কিশোর কল্পনা কতদূর তাকে সাহায্য করল কে জানে, সে বলে বসল, 'আমাকে প্রকাশক্ষমতা দিন।'
'সে আবার কী জিনিস?'
মণীন্দ্র বললে, 'চারদিকে কত লোক দেখি, জগতের কত সৌন্দর্য, কত বিচিত্র

ব্যাপার, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করে বলতে পারি না, লিখতে পারি না। আমার সেই দৈন্য মোচন করুন।'

ঠাকুর স্নিগ্ধমুখে হাসলেন। বললেন, 'তুই তাঁকেই নে না, যিনি সমস্ত কিছুর প্রকাশক। তাঁকে ধরলেই তো তিনি সব কিছু ধরিয়ে দেবেন।'

মণীন্দ্রর মনে হল কি একটা শক্তি তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে ফেলছে। যেন মহা-শূন্যে সে একাকী, কাকে যেন খুঁজে-খুঁজে ফিরছে, যেন একা থাকবার উপায় নেই, অথচ খুঁজে পাচ্ছে না সেই মহা একাকীকে। তাই আকুল হয়ে কাঁদছে মণীন্দ্র। সে কান্না আর থামে না।

ঠাকুর বললেন, 'একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।'

অন্য ঘরে নিয়ে গেল। সেখানেও কান্না।

ঠাকুরের সেবা করছে মণীন্দ্র। মণীন্দ্রর ডাক-নাম খোকা। সেবা করছে খোকা ও আরেকটি ছেলে। তার নাম পতু। দুজনে মিলে হাওয়া করছে ঠাকুরকে। একজনের হাত ব্যথা হলে আরেকজন।

দোল-পূর্ণিমার দিন। সবাই রঙের খেলায় মেতেছে, উড়ছে লাল আবিরের ধুলো। মণীন্দ্র আর হরিপদ, ডাক-নাম পতু—ঠাকুরের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছে।

'কি রে, রঙ খেলতে যাবিনে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'না।' চোখ নামিয়ে নিল মণীন্দ্র।

'সে কি রে, সবাই খেলছে, হুল্লোড় করছে। তোদের বয়সী ছেলেরা কেউ আজ চুপ করে বসে নেই! যা না, খেল না গিয়ে।' ঠাকুর আবার তাদের তাড়া দিলেন।

'না, আমাদের রঙ খেলে দরকার নেই।' মণীন্দ্র জোরে পাখা করতে লাগল।

ঠাকুরের সেবা ফেলে কিছুতেই গেল না। তোমাকে সেবা করাই আমাদের রঙ-খেলা। তুমি যদি আমাদের চোখের দিকে তাকাও সানন্দ চোখে, তাতেই আমাদের রঙিন হয়ে ওঠা।

ঠাকুর বলেন, মণীন্দ্রর প্রকৃতি-ভাব। ভগবানের নামগুণগান শুনেছে, কি, অমনি ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে থাকে।

'কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি'—মহিমা চক্রবর্তী বললে এসে ঠাকুরকে।

'কি স্বপ্ন?'

'যেন আপনি আমাকে আদেশ করছেন মণীন্দ্র গুপ্তকে মন্ত্র দিতে।'

'কি মন্ত্র বলো তো?'

মহিমা সেই স্বপ্নে-পাওয়া মন্ত্রটি উচ্চারণ করল। উচ্চারণ করা মাত্রই ঠাকুর সমাধিতে ডুবে গেলেন। সমাধিভঙ্গের পর বললেন, 'হ্যাঁ, এই মন্ত্র, এই মন্ত্রই তুমি দিও মণীন্দ্রকে।'

আমার কাজ আমি কাকে দিয়ে কার জন্যে কখন করিয়ে নেব, তা আমিই জানি।

আরো একটি ছোট ছেলে এসেছে, বারো বছর বয়স, নাম ক্ষীরোদ।

মাস্টার বললে, 'দেখুন, দেখুন, এই ছেলেটি বেশ। ঈশ্বরের কথায় খুব আনন্দ।'

'আহা, চোখ দুটি যেন হরিণের মত।' ঠাকুর তার দিকে নেত্রপাত করলেন। পা এগিয়ে দিলেন তার দিকে। ক্ষীরোদ পা-খানি তুলে নিল কোলের মধ্যে।
সেই ক্ষীরোদ গঙ্গাসাগর যাবে।
ঠাকুর বলছেন মাস্টারকে, 'আহা ক্ষীরোদ যদি গঙ্গাসাগরে যায়, তাকে তুমি একখানা কম্বল কিনে দিও।'
'দেব।'
একটু সুজির পায়েস খেতে বসেছেন ঠাকুর। আহা, যেন খেতে পারেন! খেতে যেন না কষ্ট হয়!
সত্যি খেতে পারলেন ঠাকুর। শিশুর মতন আনন্দ করে বললেন, 'খেতে পারলাম। মনটায় তাই বেশ আনন্দ হচ্ছে। তুমি ক্ষীরোদকে একটু দেখো। আমার অসুখ, আমি বলেছি তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। বেশ ভালো ছেলে। তুমি তার একটু যত্ন কোরো।'
'করব। আমার পাড়াতেই তো ওর বাড়ি।'
আর পূর্ণ? পূর্ণরও মোটে তেরো বছর বয়স কিন্তু বহ্নিময় অনুরাগ। ছাদ থেকে দেখেছে মাস্টারমশাই যাচ্ছে ট্রামে করে, দেখেই পাগলের মত ছুটে এসেছে রাস্তার উপরে। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েই প্রণাম করছে মাস্টারমশায়ের উদ্দেশে।
ঠাকুর শুনে বলছেন, 'আহা, কি অনুরাগ! কেন এই অনুরাগ? না, ইনি পরমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্যে যে ব্যাকুল সেই পারে এমনি করে ছুটে আসতে।'
যদি একবার অন্তরে আসে সেই ব্যাকুলতা আর ফিরে যাওয়া নেই। যদি পাহাড় পড়ে, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। যদি মরুভূমি পড়ে শ্যামছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। যদি সমুদ্র পড়ে, বুকে করে তুলে নিয়ে যাবে তরঙ্গের উপর দিয়ে।
রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষের ছেলে, বাড়ি থেকে আসতে দিতে চায় না। বড়লোকের ছেলে কিন্তু বাবা না দিলে পয়সা কই?
ঠাকুর পূর্ণর চিবুক ধরে আদর করে বললেন, 'যখনই সুবিধে হবে চলে আসবি এখানে। আমি তোর গাড়িভাড়া দেব।'
শুধু আমিই কি ওর জন্যে ব্যাকুল? ও ভীষণ চতুর। বলে, আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্যে।
তা হলেই আর কথা নেই। তা হলেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
নহবতখানায় নিয়ে এলেন একদিন। বললেন, 'এই পূর্ণ, একে পেট ভরে খাওয়াও।'
চোখ মেলে তাকাল পূর্ণ। ইনি কে? আনন্দময়ী ভুবনেশ্বরী! নম্রনেত্রা সমুৎ-ফুল্লা।
'আগে মালা-চন্দনে সাজাও ছেলেটাকে, তার পরে ভোজনের আহুতি দাও।' ঠাকুর আবার বললেন সেই গৃহলক্ষ্মীকে। সর্বসম্পৎস্বরূপা মাতৃলক্ষ্মীকে।
মায়ের মত স্নেহভরে পূর্ণকে কাছে টেনে নিলেন সেই মহিলা। মালাচন্দনে সাজিয়ে

খাওয়াতে লাগলেন কাছে বসে। ঠাকুর বারে-বারে এসে উঁকি মারছেন, বলছেন, 'ওগো এই তরকারিটা একটু বেশি করে দাও।' আবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার ঘুরে আসছেন। 'ওরে, কেমন খেলি? পেট ভরল?' খাওয়া হয়ে গেলে বললেন, 'ওগো, একে হাত-মুখ ধোয়ার জল ঢেলে দাও।' আঁচানো হয়ে গেলে পর ফের বললেন, 'ওগো, একে ষোলো আনা দিও।'
গৃহলক্ষ্মী একটি টাকা এনে পূর্ণর হাতে দিলেন। স্নেহার্দ্র স্বরে জিগগেস করলেন, 'বলো তো আমি কে?'
চিনত না, তবু চিনতে কি আর বাকি আছে? প্রাণ ঢেলে পূর্ণ বললে, 'তুমি আমার মা, সকলকার মা।'
ঘরে বসে পড়ছে পূর্ণ, দেখল জানলায় কার ছায়া। এ কি, মাস্টারমশাই। পড়া ফেলে ঘরের বাইরে ছুটে এল পূর্ণ। চোখে-মুখে জ্বলন্ত ঔৎসুক্য।
'ঠাকুরকে দেখবে?'
'কোথায়?'
'তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার মোড়ে।'
'কোথায়? কোন মোড়ে?'
'শ্যামপুকুরের মোড়ে।'
ছুট দিল পূর্ণ। ঠাকুর ঠোঙায় করে সন্দেশ নিয়ে এসেছেন। দুই চোখে উজ্জ্বল সুখ নিয়ে বলছেন, 'ওরে তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে এসেছি। নে, খা।' বলে রাস্তার মাঝেই তার মুখে সন্দেশ তুলে দিলেন ঠাকুর।
ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, পূর্ণরও যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে যখন পূর্ণ চোখ বোজে, রোগশয্যা ছেড়ে একা-একা বাইরে গেছে, পা টলে পড়ে গেছে মূর্ছিত হয়ে। কেউ বুঝি নেই ধারে-পারে। না, একজন আছেন। সবল বাহুতে শিশুর মত পূর্ণকে কোলে তুলে নিলেন। তুলে নিয়ে ধীরে-ধীরে শুইয়ে দিলেন শয্যায়। চোখ মেলে তাকাল পূর্ণ। এ যে সেই ঠাকুর, সেই শ্যামপুকুরের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সন্দেশ খাইয়েছিলেন যিনি, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু।
আরেকটি ছোট ছেলে আসে, সারদাপ্রসন্ন।
ঠাকুর বলেন, 'সারদার বেশ অবস্থা। আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল, যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন মুখে আনন্দ এসেছে।'
আর কি চাই। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি! যে আনন্দ আকাশে-আলোকে উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই আনন্দেরই প্রকাশ। তাকিয়ে দেখ আমার মুখের দিকে। আমার মুখে সেই অমৃতনেত্রস্পর্শ পড়েছে কিনা। পড়েছে বলেই তো আমি অকুণ্ঠিত, আমি উচ্চারিত, আমি উচ্ছ্বসিত।
প্রসন্ন বলছে দুঃখ করে, 'না হল জ্ঞান, না হল প্রেম। কি নিয়ে থাকি?'
'জ্ঞান হল না বুঝি, কিন্তু প্রেম হল না কেমন করে?' তারক জিগগেস করল।
'কই কাঁদতে পারলাম কই। কাঁদতেই যদি না পারলাম তাহলে আর প্রেম হল কি করে?'

আহা, দেখ না একবার ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে। জ্ঞান আর প্রেমের সমাহার। এক-দিকে শঙ্কর আরেকদিকে গৌরাঙ্গ।

ঠাকুর বললেন, 'জ্ঞানীর ভিতর টানা গঙ্গা। আর ভক্তের ভিতর জোয়ার-ভাঁটা।'

জ্ঞানপথ বড় কঠিন পথ। এ পথ কলিকালের পক্ষে নয়। কলিকালের পক্ষে ভক্তি। জ্ঞান যায় সদরমহল পর্যন্ত, ভক্তি একেবারে অন্তঃপুরে। জ্ঞানী আইন মানে, ভক্তি অকুতোভয়। জ্ঞানীর কাম্য ভক্তি, ভক্তের কাম্য ভালোবাসা। জ্ঞান সূর্য, ভক্তি সুধাংশু।

আরেকটি ছেলে আসে, পলটু। কিন্তু তার বাবার সায় নেই।

'তুই তোর বাবাকে কি বললি?'

'বললাম, ওঁর ওখানে যাওয়া কি অন্যায়?'

'না, না, ওরকম করে জবাব করিসনি। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পলটু চলে যাচ্ছে, ঠাকুর সস্নেহকণ্ঠে বলছেন, 'ওরে এখানে আসিস এক-আধ-বার।'

'সময় পেলে আসব।'

'ওরে কলকাতায় যেখানে যাব, যাস একটু।'

'দেখব, চেষ্টা করব।'

'ওরে, কি রকম কথা তোর!'

'তাছাড়া আবার কি। চেষ্টা করব না বললে যে মিছে কথা বলা হবে।'

'তোদের মিছে কথা আমি ধরি না।'

সে এক জ্ঞানী ছিল অথচ অজস্র মিথ্যে কথা বলে। লোকে প্রতিবাদ করে, তিরস্কার করে। বলে, এদিকে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে বলছ অথচ মিথ্যে কথা তো ঝুড়ি-ঝুড়ি। জ্ঞানী বললে, কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ। সবই মিথ্যে এ জ্ঞানই তো ব্রহ্মজ্ঞান! সবই যখন মিথ্যে তখন যাকে সত্য কথা বলছ সেটাও মিথ্যা। বুঝলে না, সত্যটাও মিথ্যা মিথ্যাটাও মিথ্যা।

হরীশ মুস্তফি এসেছে ঠাকুরের কাছে। যদি কটা আসন শিখিয়ে দেন।

ঘোরতর অসুস্থ রোগীকে কেউ এমন অনুরোধ করতে পারে? যখন করে ফেলেছে, প্রার্থনা পূরণ করতে হয়। বিছানার উপর উঠে বসলেন ঠাকুর। সাকার উপাসনার আসন শিখিয়ে দিলেন। নিরাকার উপাসনার আসন শেখাচ্ছেন, নিজেই সমাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। ডাক্তার এত করে বলে গেছে, আর সমাধি ভূমিতে যাওয়া চলবে না যদি বাঁচতে চাই। তুমি চাও কিনা জানি না আমি তো চাই বাঁচাতে। সুতরাং ডাক্তারের অনুরোধই বা তুমি রাখবে না কেন? শুধু তো আরোগ্যের বাধা নয়, দুর্বিষহ ব্যাধিযন্ত্রণা।

ঠাকুর তাড়াতাড়ি নেমে এলেন সমাধি থেকে, প্রায় জোর করে। নেমে এসেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন।

লজ্জায় বিবর্ণ মুখে হরীশ বললে, 'আপনার এত কষ্ট হবে অথচ আপনি ও সব করতে গেলেন কেন?'

'করতে গেলুম কেন? না করলে শিখবে কি করে? কষ্ট?' ঠাকুর হাসলেন। 'সবই তো তোমাদের জন্যে।'

আমার কষ্ট তোমাদের জন্যে। আমার ধৈর্য তোমাদের জন্যে। আমার ত্যাগ তোমাদের জন্যে।

রন্তিদেবের কথা মনে করো। সর্বপ্রকার দানে বিশেষত অন্নদানে যে সদাব্রত। বহুদিন উপবাসে কেটেছে রন্তিদেবের, সেদিন কিছু যোগাড় হয়েছে ভোজ্য দ্রব্য। সেই মুহূর্তে এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ এসে দ্বারস্থ হল। সেই অন্নের পর্যাপ্ত পরিমাণ দিয়ে তার পরিতুষ্টি করল রন্তিদেব। বাকি অন্ন পরিজনদের বিভাগ করে দিয়ে নিজাংশ নিয়ে বসল।

ভোজনে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় শূদ্র জাতীয় আরেক অতিথি এসে উপস্থিত। নিজাংশ থেকে রন্তিদেব তাকেও দিয়ে দিল যথেষ্ট অন্ন।

সামান্য পরিমিত অবশিষ্টাংশ নিয়ে বসেছে, চেয়ে দেখল চোখের সামনে আরেকজন দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে আবার কতকগুলি কুকুর। সে বললে, শুধু আমি নই, আমার কুকুরগুলিও বুভুক্ষু। আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। হৃষ্টচিত্তে নত মস্তকে বাকি অন্ন তাদের দিয়ে দিল রন্তিদেব। তখন আর কিছুই খাদ্য নেই, শুধু খানিকটা জল রয়েছে পাত্রে। সেই জল খেয়েই ভোজন সমাধা করবে আজ। জলপাত্র মুখে তুলেছে, এক চণ্ডাল এসে সেই জলটুকু চাইলে। বললে ধারে কাছে কোথাও নদী বা সরোবর নেই, পথশ্রমে দারুণ পিপাসার্ত হয়েছি, ঐ জলটুকু আমাকে দান করুন।

তথাস্তু। নিজে ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ, তবু রন্তিদেব সেই জলটুকু দিয়ে দিল চণ্ডালকে।

বললে, 'আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে অষ্টৈশ্বর্যান্বিতা পরাগতি চাই না, চাই না মোক্ষ বা অপুনর্ভব। আমি যেন অখিল জীবের অন্তরে বাস করে তাদের সমস্ত দুঃখ নিজের মধ্যে টেনে নিই, যাতে তারা দুঃখ-মুক্ত হয়। জীবিতকামী জীবের জীবন-রক্ষার জন্যে আমার জীবন বলি প্রদান করলেই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা শ্রান্তি-ক্লান্তি আর্তি-কাতরতা খেদ-বিষাদ শোক-মোহ সব অপগত হবে।'

তখন দেবতারা নিজ-নিজ মূর্তি ধরে দেখা দিল রন্তিদেবকে। বললে, তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করতে আমরাই এসেছিলাম ছদ্মবেশে।

আমার প্রণাম নিন। আমাকে নিঃসঙ্গ ও বিগতস্পৃহ করুন। শুধু ভগবান বাসু-দেবেই যেন আমার চিত্ত সমর্পিত থাকে। ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা নেই। যদি একমাত্র তাঁকেই আশ্রয় করতে পারি তাঁর গুণময়ী মায়া স্বপ্নের মতই বিলীন হয়ে যাবে।

'মায়াতে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ বলে বোধ হয়।' বললেন ঠাকুর। 'এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। কামারপুকুরের একটা পুকুর দেখেছিলাম পানায় বোঝাই। একটা লোক তৃষ্ণার্ত হয়ে সে পুকুরের কাছে এসে দাঁড়াল। পানা সরিয়ে জল খেল, সেই জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। লোকটা কি

বোঝাল? বোঝাল, সচ্চিদানন্দ জল মায়ারূপ পানাতে ঢাকা। বোঝাল, যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।'

আমাকে সরিয়ে দেখব তোমাকে। অহংএর বৃন্তে ফোটাব আত্মার শতদল।
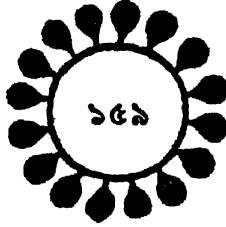
'তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি।' ঠাকুর বলছেন ভক্তদের দিকে চেয়ে। 'নইলে সব্বাই যদি বলো, এত কষ্ট, তবে দেহ যাক, তাহলে দেহ যায়।'

পাষাণেরও বুক ফেটে যায় কথা শুনে। ঠাকুরের কষ্ট চোখে দেখা যায় না অথচ এ কষ্টের অবসানের জন্যে দেহেরও অবসান হোক, এ ভাবলেও তো প্রাণ শতধা হাহাকার করে ওঠে।

প্রকাশ মজুমদার এক ডোজ নাক্সভমিকা দিয়েছে ঠাকুরকে। শুনে ডাক্তার সরকার খুব চটেছে। বললে, 'সে কি কথা! আমাকে না বলে নাক্সভমিকা দেওয়া! আমি তো মরিনি।'

'তোমার অবিদ্যা মরুক।' ঠাকুর বললেন পরিহাস করে।

পরিহাস ঠিক বুঝতে পারল না ডাক্তার। সে ভাবল অবিদ্যা মানে বোধ হয় গণিকা। গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমার কোনো কালে অবিদ্যা নেই।'

ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন ডাক্তার কি বুঝেছে। বললেন, 'না গো, তা বলিনি। সন্ন্যাসীর জানো তো, অবিদ্যা মা মারা যায় আর বিবেক সন্তান হয়। মা মারা গেলে অশৌচ হয়, তেমনি অবিদ্যার মৃত্যুতে সন্ন্যাসীর অশৌচ! তারই জন্যে সন্ন্যাসীকে ছুঁতে নেই।' *

'আচ্ছা মশাই, পাপের শাস্তি আছে শুনছি, অথচ ঈশ্বরই সব করেছেন, এ কেমনতরো কথা?' বলেছিল শ্যাম বসু। 'বুঝিয়ে দিন!'

'কি তোমার সোনারবেনে বুদ্ধি!' ঠাকুর রঙ্গ করে উঠলেন।

'সোনারবেনে বুদ্ধি মানে ক্যালকুলেটিং বুদ্ধি।' বুঝিয়ে দিল নরেন।

'তোমার অত মাথাব্যথায় কাজ কি! ফিলজফি লয়ে বিচার করে তোমার কি হবে? আধপো মদেই তুমি মাতাল,' বলছেন ঠাকুর, 'শুঁড়ির দোকানের মদের হিসেবে তোমার কি দরকার?'

ডাক্তার সরকার বললে, 'আর ঈশ্বরের মদ অনন্ত। সে-মদের শেষ নেই।'

'তুমি তাঁকে সব ভার দিয়ে চুপ করে বসে থাকো না।' বললেন ঠাকুর, 'সৎলোককে যদি কেউ ভার দেয়, সে কি অন্যায় করে? পাপের শাস্তি তিনি দেন কি না দেন তিনি বুঝবেন। তোমার কিসে ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তাই দেখ।'
'মানুষ হিসেব করে কি বলবে?' ডাক্তারও চলে এসেছে ভক্তি-বিশ্বাসের পথে। বললে, 'তিনি সমস্ত হিসেবের পার।'
'মানুষের নিজের মধ্যে যেমন, ঈশ্বরের মধ্যেও তেমনি দেখে।' বললেন ঠাকুর। 'বলে কিনা ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ। একজনকে সুখে রেখে আরেকজনকে দুঃখে রেখেছেন। নিজের গজ-ফিতে দিয়ে ঈশ্বরকে মাপতে যায়।'
ঠাকুরের বাহ্যিক দেহে দুর্দান্ত যন্ত্রণা, তবু তিনিই নিজে আবার ভক্তদের ভুলিয়ে রাখছেন। আমার কষ্ট দেখে ওদের মুখে ক্লেশচ্ছায়া দেখা দেবে, সে যে আমার ততোধিক কষ্ট।
সেই বড়বাজারে মাড়োয়ারী-ভক্তের বাড়ি গিয়েছিলেন, তার গল্প করছেন। হিন্দুস্থানী এক পণ্ডিতের সংগে সেখানে আলাপ। তাকে ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা জী, কারু ভক্তি হয় কারু হয় না, এর মানে কি?'
পণ্ডিতজী কি সুন্দর করে বললে। বললে, ঠিক ঠাকুরের প্রতিধ্বনি : 'ঈশ্বরে বৈষম্য নেই। তিনি কল্পতরু, যে যা চায় সে তা পায়। তবে কল্পতরুর কাছে চাইতে হয়।'
আঠারো শো ছিয়াশী সালের পয়লা জানুয়ারি ঠাকুর কল্পতরু হলেন।
বেলা প্রায় তিনটে, ছুটির দিন। গৃহস্থ ভক্তরা সমবেত হয়েছে কাশীপুরের বাগানে। ছুটির দিন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে। যদি এক ফাঁকে দেখা যায় একটু ঠাকুরকে।
অপেক্ষা করেই তো আছি। যেদিন সংসারে এসেছি তাঁর পদাশ্রয়-বিচ্যুত হয়ে সেই দিন থেকেই তো অনিকেত আমরা। এই সব মাটির ঘর কি আমাদের আশ্রয় হতে পারে? যে মুহূর্তে ডাক পড়বে সে মুহূর্তেই তো বিদায় হতে হবে। বাড়ি-ঘরের মেরামত বাকি, দরজায় তালা লাগিয়ে আসি, কোনো ওজুহাতই শুনবে না। যে বাড়িতে শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্ব নেই সে কি আমার বাড়ি? এই একটু বৃষ্টিটা ধরবার জন্যে ছাতার তলায় দাঁড়ানো। ডাকটি শোনবার আশায় একটু বসে যাওয়া। পথ চেয়ে অপেক্ষা করা। কখন আসবে সেই ডাকহরকরা কেউ জানে না। স্টেশনের মুসাফিরখানায় বসে আছি ট্রেন ধরবার জন্যে।
মুসাফিরখানা কি ঘর-বাড়ি?
'ওরে ওরা আমার জন্যে সব বসে আছে।' ঠাকুর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : 'আমাকে কাপড়-জামা দাও, আমি পরব, সাজব, যাব আমি বাগানে বেড়াতে।'
এ কি অসম্ভব কথা! শয্যালীন কঠিন রুগী, এ যাবে কি করে নিচে নেমে?
যাব, সহজেই চলে যাব, ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এখানে ওদের আসতে বারণ, অনেক বিধি-নিষেধের কণ্টক। আমিই যাব আগ বাড়িয়ে। রোদে ওদের ছায়া দেব।

মনোহর বেশ পরব। তেলধ্বতি নয়, ধোয়া ধ্বতি। নিয়ে এস আমার বনাতের জামা। আমার কানঢাকা ট্বপি। আমার ফ্বলকাটা মোজা।
একবার দ্বখানা তেলধ্বতি কিনতে বলেছিলেন মাস্টারকে। মাস্টার তেলধ্বতি তো কিনলই, দ্বখানা ধোয়াও কিনল।
ঠাকুর বললেন, 'তেলধ্বতি দ্বখানি সঙ্গে দাও, আর ধোয়া দ্বখানা তুমি নিয়ে যাও।'
'যে আজ্ঞে।'
'আবার যখন দরকার হবে তখন এনে দেবে। আমার সঞ্চয় করবার জো নেই। সেবার সিঁথির ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে বেণী পালের বাগানে গিয়েছিলাম। রাত দশটার পর কালীঘরে ফেরবার জন্যে গাড়িতে উঠছি, দেখি বেণী পালের হাতে ল্বচি-মিষ্টির চ্যাঙারি। কি ব্যাপার? রামলাল আসতে পারেনি তার জন্যে কিছ্ব খাবার দিতে চাচ্ছে। ও বাপ্ব বেণী পাল, আমি বলল্বম তাকে মিনতি করে, আমার সঙ্গে ও সব দিও না। আমার সঙ্গে কোনো জিনিস সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে নেই।'
সিন্ধ্ববাসী হীরানন্দ ঠাকুরকে পাজামা উপহার দিতে চায়। বলে, আমার দেশের পাজামায় বেশি আরাম পাবেন। তার আগ্রহ দেখে ঠাকুর বলছেন, দিও পাঠিয়ে। আমার আবার আরাম-বিরাম! আমার আবার বসনভূষণ!
কোমরে কাপড় রাখতে পারছেন না ঠাকুর। প্রায় বালকের মত দিগম্বর। দ্বটি ব্রাহ্ম-ভক্ত এসেছে হীরানন্দের সঙ্গে। তাই এক-আধবার কাপড়খানি টানছেন কোমরের কাছে। হীরানন্দকে বলছেন, 'কাপড় খ্বলে গেলে তোমরা কি অসভ্য বল?'
'আপনার তাতে কি।' বললে হীরানন্দ, 'আপনি তো বালক।'
প্রিয়নাথ ব্রাহ্ম। তাকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর বললেন, 'উনি বলেন।'
'মাইরি কোন শালা ভাঁড়ায়।' মাঝে-মাঝে এই বলে বালকের মত শপথ করেন ঠাকুর। 'মাইরি আমি সভ্য হয়েছি।' বলতে-বলতে কখন আবার বলে ওঠেন, 'কত মনে করি সভ্য হব কিন্তু মহামায়া যে বসন রাখতে দেন না শরীরে। আমাকে বালকের মত করে রাখেন। সেবার একটা ছোট ছেলে ফ্বল নেব বলে বায়না ধরলে। বাপ বোঝালে, নিতে নেই, ও ফ্বলে ঠাকুরপ্বজো হবে। কে শোনে কার কথা। ছেলে কান্না জ্বড়ে দিল। আমি তখন তাকে দিলাম সেই ফ্বল। ফ্বল পেয়ে কি আনন্দ সেই শিশ্বর। তারপর? তার পর দ্বর যাঃ, বলে সে ফ্বল সে ফেলে দিল ছ্বঁড়ে।'
প্রিয়নাথ বললে, 'আজ্ঞে পায়ে বন্ধন, এগ্বতে দেয় না।'
'থাক না পায়ে বন্ধন, মন নিয়ে কথা। মনে কেন বাঁধন পরাও?'
'হায়, মন যে আমার বশ নয়।'
'মন অভ্যাসের বশ। অভ্যাস কর, মনকে যে দিকে খ্বশি নিয়ে যেতে পারবে।'
ঠাকুর লালপেড়ে ধ্বতি পরলেন, গায়ে দিলেন সব্বজ বনাতের জামা। মোজা পায়ে চটিজ্বতো পরলেন। মাথায় আঁটলেন কানঢাকা কাপড়ের ট্বপি।
যার নাকি শয্যাশয়ন অস্বখ, সে উঠে বসে সাজগোজ সমাধা করল। হেঁটে চলল। নেমে চলল সিঁড়ি দিয়ে। একেবারে এসে উপস্থিত হল সামনের মাঠে। যেখানে গৃহীভক্তরা জমায়েত হয়েছে। জমায়েত হয়ে তাকিয়ে আছে উর্ধ্বম্বখে। চলে এলেন

সেই গৃহীদের আহ্বানে যিনি স্বয়ং সন্ন্যাসী হয়েও গৃহস্থের শিরোমণি। পর্বতচূড়ায় তুষার হয়ে বসে রইলেন না, নেমে এলেন সাধারণের সমতলে। পাপী তাপী দুঃখী দুর্গতদের মাঝখানে। যারা নানা বাধা বেদনায় জর্জর, সংশয়ে অবিশ্বাসে পীড়িত, আকাঙ্ক্ষায় অহঙ্কারে অভিভূত তাদের এলেকায়। প্রবৃত্তিতে শত তাড়িত হয়েও যারা অম্লান ভক্তিমান। যারা সংসার-কারাগারে বন্দী থেকেও সর্বদা সেই নীল আকাশের ভিখারী।

এসেছে গিরিশ ঘোষ, অতুল ঘোষ, রাম দত্ত, অক্ষয় সেন, হারান দাস, কিশোরী রায়, বৈকুণ্ঠ সান্যাল। নবগোপাল ঘোষ, হরমোহন মজুমদার আর মাস্টারমশাই মহেন্দ্র গুপ্ত। আরো অনেক, হরীশ মুস্তফী, চুনীলাল বসু, উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ওরে চেয়ে দ্যাখ কে এসেছে!

শরীরে বেঁচে থেকে যে বিশ্বাস করা যায় না। এ কি সত্যি, না, দিবাস্বপ্ন? একসঙ্গে এতগুলি লোকের দৃষ্টিভ্রম হয় কি করে? ওরে এ যে তিনিই। মর্তের ঘরে আকাশের দিনমণি!

কই তাঁর রোগ কই? কষ্ট কই? এ যে সর্বদীপ্ত প্রসন্নতা। সর্বশুভা পরিতৃপ্তি। দু-চোখে এত রূপ ধরে না। হৃদয়মৃৎপাত্রে ধরে না যে করুণার শ্রাবণ-উৎসার।

হে ঈশ্বর, বলতে পারো তুমি আমার কে? সকলের চেয়ে ভালো, সকলের চেয়ে মহৎ, সকলের চেয়ে মধুর, বলতে পারো তুমি আমার কে? সকলের চেয়ে কঠিন আবার সকলের চেয়ে করুণাময়। সকলের চেয়ে ন্যায়ী, সমস্ত বিচারের শেষ বিচার। সমস্ত অর্থের শেষ অর্থ। নতনম্র হয়েও প্রচণ্ড। এত কাছে অথচ কোন দুষ্প্রবেশ্য প্রচ্ছন্নে যেন গা ঢেকে আছ। অচঞ্চল, অথচ তোমাকে ধরতে পারছি না। নিজে বদলাচ্ছ না অথচ বাকি সমস্ত জিনিস বদলে-বদলে দিচ্ছ। এত পুরোনো হয়েও নিত্য-নতুন। এত ব্যস্ত অথচ কি সুন্দর বিশ্রাম করছ! এত কষ্ট করছ অথচ মুখে কি অম্লান হাসি! এত সঞ্চয় করছ অথচ কিছু তোমার প্রয়োজন নেই! বলো তোমাকে ছাড়া কী আর আমার চাইবার আছে! আর সমস্ত পেলেও আমার তৃপ্তি নেই। তোমাকে চাইতে পারলেই আমার তৃপ্তি।

কিন্তু কি করে তোমাকে চাই, তুমি যদি না চাওয়াও। কি করে তোমাকে দেখি যদি তুমি না দেখা দাও দয়া করে?

তাই তুমি নিজের থেকেই চলে এলে নেমে এলে আমাদের মধ্যে। তোমার দুয়ারে কত রক্ষী, কত পাহারাওয়ালা, কত নিয়মকানুনের অস্ত্রশস্ত্র। সমস্ত বিধিনিষেধ তুমি নস্যাৎ করে চলে এলে। তুমি বুঝলে আমাদের দুঃখ, আমাদের অসামর্থ্যের অসাফল্যের বেদনা, তাই তুমি নিজের থেকে এসে ধরা দিলে। সৈন্য-সান্ত্রীরা লজ্জায় মুখ লুকোলো!

তুমি যে আমাদেরই একজন। তুমি যে আমাদের কাছে সংসারীর চেনা পোশাকে দেখা দিলে, গেরুয়া পরে এলে না। তোমার সন্ন্যাস তো সংসারের সঙ্কোচন নয় সংসারের সম্প্রসার! আমার ঘরের আঙিনাকে বিশ্বের প্রাঙ্গণে বড় করে দেওয়া। পরিবারকে পল্লীতে, পল্লীকে নগরে, নগরকে দেশে, দেশকে পৃথিবীতে, পৃথিবীকে

তিন ভুবনে নিয়ে আসা। স্বদেশং ভুবনত্রয়ং। একটি-একটি করে পাপড়ি উন্মোচিত করা। অহং-এর বৃন্তে বিশ্বাত্মার শতদল ফোটানো।

আর সকলে আমাদের পরিত্যাগ করেছে। কেউ গিয়েছে অরণ্যে, কেউ সমুদ্রে, কেউ শৈলশৃঙ্গে, কেউ বা কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনে। সাধ্যি নেই তাদের আমরা অনুসরণ করি। কি করে ছাড়ব রাজ্য, ছাড়ব স্ত্রী-পুত্র, কি করে বা সংসারনিবাস? তুমিই একমাত্র বললে, তোকে কিছু ছাড়তে হবে না, তুই বসে থাক তোর নিজের জায়গায়, নিজের কোটে, নিজের আয়ত্তি-অধিকারের মধ্যে। আমিই সমস্ত তীর্থ ঘুরে তীর্থোদকে কুম্ভ পূর্ণ করে তোর ঘরে এসে উঠছি। তোর ঘরেই তাঁর কোল পাতা। তোর সংসারই তাঁর পীঠস্থান। তুই ঠিক থাক, তুই ঠাঁই-নাড়া হসনি, যা আছে ভুবনে তাই তোর ভবনে, যা ব্রহ্মাণ্ডে তাই তোর ভাণ্ডে, যা হোথায় তাই হেথায়!

যত মত তত পথ। এ কথা কে বলতে পারে? যে সমস্ত মত আচরণ করেছে সমস্ত পথ বিচরণ করেছে। আর, সমস্ত মত সাধন করে সমস্ত পথ ভ্রমণ করে তুমি কোথায় এসে উঠলে? কোনো মঠে নয়, আখড়ায় নয়, গুহায় নয়, তরুতলে নয়, উঠলে এসে সংসারে, মা-মন্ত্রের প্রতিচ্ছবি নিয়ে। তুমি মাতৃভক্ত, তুমি বিবাহিত—এ তো সংসারীর লক্ষণ। আর সকলে হয় স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে নয় পরিহার করেছে। তুমি তাকে অচলপ্রতিষ্ঠ মহিমা দিয়েছ। বিবাহের কি মহত্তম আদর্শ তাই দেখালে জগৎকে। বললে, আমি ষোলো আনা করে যাচ্ছি যাতে তোরা অন্তত এক পয়সা করিস। সাড়ে-পনেরো আনা চাওনি—মোটে এক পয়সা। বললে, একটি-দুটি সন্তান হবার পর স্বামি-স্ত্রী ভাই-বোন হয়ে যাস। স্ত্রী কত বড় শক্তি কত বড় শ্রী তাই বোঝালে তাকে পূজা করে। এত প্রকাণ্ড মহাভারত, কোথাও এর দৃষ্টান্ত নেই। তুমি মহাভারতকে অতিক্রম করলে। নারীকে কত বড় সম্মান, কত বড় স্বীকৃতি দিলে। এ সবই তো সংসারকে স্বর্গ করার জন্যে। যে ঘরে নারীর মান নেই সে ঘর তো শ্মশান।

যে জায়া সেই জননী। তোমার মা-মন্ত্র তো সংসারীর কান্না দিয়ে লেখা। যে মাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে সংসার ছেড়ে, তার মুখে মা-ডাক আর ফুটবে কি করে? তাতে থাকবে কি করে সত্যের সুর, সারল্যের সুর? এ মা ডাক তো তোমার-আমার। যেহেতু তুমি-আমি দুজনেই সংসারী।

এক হিসেবে সংসারীই তো মুক্ত। ঈশ্বরের জন্যে সে সবখানে যাবে, যেমন তুমি গিয়েছিলে। তোমার কাছ থেকেই তার সব শেখা। তার মধ্যে কোনো গণ্ডি নেই, গোষ্ঠী নেই, সম্প্রদায় নেই। সব কিছু সে মানে, যেমন তুমি মানতে, হাঁচি টিক-টিকিও মানতে। সে পাদরির কাছেও যাবে, পীরের দরগায়ও যাবে। ফোঁটা-তিলকের কাছে যাবে, যাবে ত্রিপুণ্ড্রকের কাছে। বেলতলায়, ষষ্ঠীতলায়। অশ্বত্থ-পাকুড়ের নিচে, হয়তো বা কোনো জলাশয়ে। যে যা বলবে তাই শুনবে। একগুঁয়ে হবে না, একঘেয়ে হবে না। সর্বত্র তার রিক্ত পাত্রটি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যেখানে যেটুকু মধু পায়, যেটুকু রস পায়, তাই নিচ্ছে সংগ্রহ করে। সর্বত্র মধু। সর্বভূতে মধু। তুমিই বলেছ, সব যে বিশ্বাস করবে তার শিগগির হবে।

ঠাকুর গিরিশের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি আমার সম্বন্ধে কী বলছ এখানে-সেখানে? আমার মধ্যে তুমি কি দেখলে?'
গিরিশ নতজানু হল। ঊর্ধ্বমুখে তাকাল ঠাকুরের দিকে। করজোড়ে বলল, 'ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেনি, আমি তাঁর বিষয়ে আর কি বলব?'
চারদিকে জয়-জয় পড়ে গেল।
ঠাকুর হাত তুললেন। বললেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।'
চারদিকে চৈতন্যের ঢেউ পড়ে গেল। দেশকাল দিকবিদিক মুছে গেল নিমেষে। প্রণামের প্রেমপুজাঞ্জলি পড়তে লাগল পায়ের উপর। কত সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিল ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কেউ তাঁকে ছোঁবে না, তাদের কলুষস্পর্শে ক্লিষ্ট করবে না সে দিব্য দেহ, সব ভুলে গেল। মনে হল এ নিত্যদীপপ্রদ চৈতন্য, কিছুতেই এতে মালিন্যস্পর্শ নেই, সর্বাবস্থায়ই এ জ্যোতি বিশুদ্ধতম, এ জ্যোতি নির্মলতম। স্পর্শ করে অস্তিত্বের মধ্যে নিয়ে নাও সেই চৈতন্য-প্রবাহ, বিদ্যুৎ-প্রবাহ। রুদ্ধদ্বার বিদীর্ণ করে দাও। নিঃশস্যা বন্ধ্যাভূমিতে নিয়ে এস প্রবল জল-স্রোত। জাগিয়ে দাও কুলকুণ্ডলিনী।
এ কাকে দেখছি! শিউরে উঠল রামলাল। ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে বসে কখনো তাকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করে দেখতে পায়নি। যখন পা দেখছি মুখ দেখতে পাইনি। যখন মুখ দেখছি তখন কোথায় পা দুখানি! এখন মনে হল সে মূর্তি যেন আশির-পদনখ স্পষ্ট ও স্থির হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে সর্বগঠনসুন্দর। হৃদয়পদ্মে আবির্ভূত হয়ে গোটা মূর্তি আলোকে পুলকে ঝলমল করে উঠেছে।
রাম দত্ত অঞ্জলিভরে ফুল দিতে লাগল পায়ে। ঠাকুর তাকে স্পর্শ করলেন।
দুটি জহুরি চাঁপা নিয়ে এল অক্ষয় সেন। ফুল দুটি পায়ে দিতেই ঠাকুর তার বুক ছুঁয়ে দিলেন।
বেলেঘাটার হারান দাস পায়ের কাছে প্রণাম এনে রাখতেই ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর পাদপদ্ম রাখলেন তার মাথার উপর।
কৃপার কল্পতরু হয়েছেন ঠাকুর। আত্মপ্রকাশ করেছেন। করেছেন অভয়প্রকাশ।
এই সেই মহাভাগ ভাগবতবৃক্ষ। গোচারণ করতে-করতে শীতলছায়ান্বিত গাছ দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন বয়স্যদের, 'এই সব মহৎ বৃক্ষকে দেখ। পরার্থেই এরা একান্ত-জীবিত। পরের উপকার করবার জন্যেই এরা জীবনধারণ করে। বাত বর্ষা হিম তাপ কত সহ্য করেছে অক্লেশে। সহ্য করে রক্ষা করছে আমাদের। এরাই সর্বপ্রাণীর জীবনধারণের হেতু, এদেরই বরজন্ম, কোনো যাচকই এদের কাছে বিমুখ হয় না। পত্র-পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল কাঠ গন্ধ নির্যাস ভস্ম অস্থি পল্লব—সব দিয়ে সকলের কামনা পূরণ করে। তেমনি প্রাণ মন বুদ্ধি বাক্য দিয়ে সর্বদা জীবের কল্যাণসাধন করাই মানুষজন্মের সার্থকতা।'
'ওরে কে কোথা আছিস এই বেলা চলে আয়, মুঠো-মুঠো অভয় কুড়িয়ে নে, আশ্বাস কুড়িয়ে নে।' সানন্দে চীৎকার করে উঠল অক্ষয়। 'চৈতন্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কুড়িয়ে নে ভারে-ভারে। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য, যার যা খুশি, ঠাকুর কল্পতরু

হয়েছেন। এমন দিন আর পাবি না রে। কৃপার পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন প্রভু। আয়, নিয়ে যা দেখে যা।'

দেখে যা এই অমৃত ও অভয়ের অধিপতিকে। যাঁর চরণযুগলই সকল কর্মের ও সকল মঙ্গলের নিদান। স্পর্শ করে ধন্য হ সকলে।

ছুঁলেন নবগোপালকে, অতুলকে, হরমোহনকে। গিরিশকে, কিশোরীকে, রাম-লালকে।

বৈকুণ্ঠ বললে, 'আমাকে কৃপা করুন। আমাকে স্পর্শ করুন।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার তো সব হয়ে গিয়েছে।'

'আপনি যখন বলছেন হয়ে গিয়েছে, তখন আর তাতে ভুল কি।' তবু মুখের উপর যেন একটু কোথাও বিষাদছায়া লেগে আছে। 'কিন্তু অল্পবিস্তর একটু বুঝতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।'

'বেশ, কাছে এস।'

কাছে এসে দাঁড়াল বৈকুণ্ঠ। ঠাকুর তার বুকের উপর হাত রাখলেন।

একটা বিরাট ভাবান্তর হল বৈকুণ্ঠের। দেখতে পেল চতুর্দিকে যেন ঠাকুর হাসছেন। গাছপালা বাড়িঘর লোকজন—এরা যেন গাছপালা বাড়িঘর লোকজন নয়, সবই ঠাকুর, ঠাকুরের সুহাস মূর্তি।

বিশ্বরূপ দেখে ভয় পেয়েছিল অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণকে বললে, প্রতিসংহার করো এই মূর্তি, এ আমি সইতে পারছি না। আবার তুমি তোমার মানুষরূপটি ধরো। তোমার সেই সকলসুন্দরসন্নিবেশ সৌম্যমূর্তি।

বৈকুণ্ঠও তেমনি ভয় পেয়ে গিয়েছে। বললে, 'প্রভু, এ ভাব ধরতে পারছি না। দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছি, এ ভাবের উপশম ঘটিয়ে দাও।'

ঠাকুর হাসলেন। বৈকুণ্ঠ শান্ত হল।

সন্তোষ অভ্যাস করবে। সন্তুষ্ট নিরীহ ও আত্মারাম ব্যক্তির যে সুখ কামধাবমান লোকের সে সুখ কোথায়? কামক্রোধের বরং অন্ত হয়, লোভের অন্ত হয় না। সংকল্পত্যাগ দ্বারা কামকে, কামত্যাগ দ্বারা ক্রোধকে, অর্থে অনর্থ দর্শন দ্বারা লোভকে জয় করবে। আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা শোক ও মোহকে, মহৎ লোকের সেবা দ্বারা দম্ভকে, মৌন দ্বারা যোগপ্রতিবন্ধককে, কামনা বিষয়ে অচেষ্টা দ্বারা হিংসাকে জয় করবে। যার থেকে ভয় তার হিতাচরণ করে সেই ভয় নিবারণ করবে। মনঃপীড়া ও দুঃখকে সমাধি দ্বারা আত্মজনিত কণ্টকে যোগের দ্বারা চাঞ্চল্যকে নির্জনবাস দ্বারা জয় করবে। অভ্যাসেই চিত্ত কাষ্ঠশূন্যবহ্নির মত শান্ত হয়ে যাবে। সর্ববৃত্তি-তিরোহিত চিত্তই ব্রহ্মসুখ স্পর্শ করতে পারে। সেই পরাস্ত করতে পারে দুর্জয়া মায়াকে।

ওরে তোরা কে কোথা আছিস ছুটে আয়।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তরা ছিল ঘরের মধ্যে, তারা সে ডাকে সাড়া দিল না। ঠাকুর নিচে নেমে যেতেই তারা ঠাকুরের বিছানাপত্র রোদে দিতে লাগল, মেতে উঠল ঘর গুছোতে। কত দিন ঝাড়া-পোঁছা হয়নি, এবার এই সুযোগে সংস্কার করে নি।

মার্জনা করে নি। তাই উপরের বারান্দা থেকে ঘটনাটা দেখলেও তাদের মধ্যে কোনো আগ্রহ-আবেগের ঢেউ জাগল না।

ওরে আর লোক কই, বেলা যে বয়ে গেল। কোথায় কে আছিস আর্ত-বঞ্চিত অন্ধ-বিভ্রান্ত, ছুটে আয়, কল্পতরুকে দেখে যা, বোস এসে তাঁর ছায়ার আশ্রয়ে, তাঁর করুণার নিকেতনে। চতুর্বর্গ ফল নিয়ে যা। জীবনে যা তোর অভীষ্টতম সে পরম-ধন স্পর্শমণিকে একবার স্পর্শ কর। লোহার কালো তনু কাঞ্চন করিয়ে নিয়ে যা।

রান্নাঘর থেকে হিড়হিড় করে রাঁধুনি বামুনকে টেনে আনল গিরিশ।

'এ কি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'ওরে চেয়ে দ্যাখ, প্রভু আজ অকাতর হয়েছেন, নিয়ে যা কৃপার কণিকা।'

রাঁধুনি বামুনও এসে কুড়িয়ে নিল মহাস্পর্শ।

প্রাণ ঢেলে প্রাণ ভরে চা। আনন্দৈকমাত্র ভগবান সদাব্রত খুলেছেন, তুইও তোর প্রার্থনায় অবারিত হ। চা না কি তোর চাইবার!

আমি কিছু চাই না। তোমার ফুল চাই না, ফল চাই না, ছায়া চাই না, কাঠ চাই না। হে মহাভাগ বৃক্ষ, আমি শুধু তোমাকে চাই।
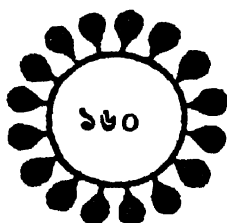
ঠাকুর আবার তাঁর বিছানায় এসে শুলেন।

কলিমলহন্তা অখিলপাপনাশন হরি সকলের পাপ টেনে নিলেন নিজের মধ্যে। আমরা, আমাদের কী হল? আমরা তো পাইনি সে পরমস্পর্শ। আমরা যে ঘোর কলিপীড়িত, কালপীড়িত। আমাদের উপায় কি?

কলিতে সর্বপ্রকার ধর্মাচারের নাশ, ধন আর বলেরই মাহাত্ম্যপ্রাবল্য। অভিরুচিমত স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ, প্রবঞ্চনা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়, সূত্রধারণ দ্বারা ব্রাহ্মণের পরিচয়, দণ্ড-অজিন দ্বারা আশ্রম, চটুলবাক্য প্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডিত্য আর দম্ভ দ্বারা সাধুতা প্রমাণিত হবে। উদরপূর্তিই একমাত্র প্রয়োজন, কুটুম্বভরণই দক্ষতা, যশো-লাভের জন্যেই ধর্ম। বলবত্তমই রাজা হবে আর করভারক্লিষ্ট অপহৃতধন প্রজারা পাহাড়ে-কাননে আশ্রয় নেবে। দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করবে। হিমে-রৌদ্রে বিবাদে-ব্যাধিতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় বেশি দিন বাঁচবে না। তমোগুণের প্রাধান্য হেতু মায়া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, শোক ও মোহ সকলকে আচ্ছন্ন করবে। তবে আমাদের উপায় কি?

কলিকৃত অশুভের খণ্ডন হবে কি করে?

একমাত্র হরিকীর্তনে। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণুসেবা, কলিতে হরিকীর্তন।

একমাত্র কেশবকে হৃদয়স্থ করো। তাতেই মিলবে তোমার পরমা গতি, পরমা প্রতিষ্ঠা।

চুণীলাল বসুর আসতে দেরি হয়েছে। এখন এসে শোনে, ঠাকুর শুয়ে পড়েছেন আর তাঁর কাছে বর চাওয়া চলবে না। পা স্পর্শ করা দূরস্থান। কিন্তু একবারটিও কি দেখতে পাব না চোখের দেখা!

না। দ্বাররক্ষী নিরঞ্জন! সে আর কাউকে ঢুকতে দেবে না। অনেক ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে, অনেক হুলস্থুল। এবার প্রভুকে একটু বিশ্রাম করতে দাও নির্জনে।

এই চুণীলালের কত দুঃখ ঠাকুর বুঝেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার আগে থেকেই তার কুলগুরুর থেকে তার দীক্ষা হয়েছিল। দুর্বল ফুসফুসে প্রাণায়াম করতে গিয়ে হাঁপানি হয়ে গেল তার। অনেক দিন যেতে পারেনি ঠাকুরের কাছে। একটু সুস্থ হয়ে সেদিন এসেছে, ঠাকুর তাকে দেখে তিরস্কার করে উঠলেন: 'তোমরা গৃহী মানুষ, তোমাদের ও সব কেন? ওসব যোগ-টোগ তোমাদের জন্যে নয়। অমন কাজ আর কোরো না, যাও গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ চেয়ে নাও গে। সেরে যাবে হাঁপানি।'

ঠাকুর কি করে জানলেন যে যোগ করে চুণীলাল? আর ঐ যোগের জন্যেই তার ব্যাধি?

আরো আশ্চর্য, গোপালের তিন মাত্রা ওষুধেই সেরে গেল হাঁপানি।

কত বুঝেছেন দুঃখদৈন্য। একটি গ্লাশ চেয়ে ফেলেছেন চুণীলালের কাছে, কিন্তু রুপো বা কাঁসার গ্লাশ কিনে দেয় চুনীলালের সাধ্যি কি? তখুনি বলে ফেললেন, 'তুমি শুধু একটা কাচের গ্লাশ দিও।'

প্রণব উচ্চারণের অধিকার নেই চুণীলালের। তাই মুখখানি ম্লান করে বসে আছে। ঠাকুর বললেন, 'সে কি-রে, নাই-বা হল প্রণবমন্ত্র। ভগবানের যে কোনো একটি নাম ধরে ডাক, অজস্র তাঁর ডাক নাম, দেখবি ঠিক সাড়া পাবি। মন্ত্রের জন্যে নামের জন্যে ভাবনা?'

কত বুঝেছেন!

কি তার নাম কিছু জানি না। একমাত্র তোমাকে জানি। তোমার নাম রামকৃষ্ণ। সুতরাং রামকৃষ্ণই আমার জপমন্ত্র, আমার ধ্যানবস্তু।

নরেন এসে বললে, 'আজ যা বুঝলাম ঠাকুরের শরীর বেশিদিন থাকবে না। এই বেলা যা চাইবার চেয়ে নিন।'

'কিন্তু নিরঞ্জন ঢুকতে দেয় না যে।'

ঢের হয়েছে, অনেক তোলপাড় করেছ। কেশব সেন বলেছিলেন গ্লাশ-কেশে তুলে রাখতে, গ্লাশ-কেসের বাইরে তাঁকে ফুল দিতে, সে গ্লাশ-কেস তোমরা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছ। আর কোনো প্রশ্রয়-প্রার্থনা শুনব না তোমাদের।

আমরা কি করব! ঠাকুর তো করুণায় নিজের থেকে নেমে এসেছেন। তিনিই তো বইয়ে দিয়েছেন অমৃতস্পর্শের বন্যা, চৈতন্যের মহাপ্লাবন।
ও-সব কথায় কান পাততে নিরঞ্জন রাজী নয়। ঢের শুনেছি। যাও ফিরে যাও। যেতে পাবে না উপরে। দেখা হবে না কিছুতেই।
কি একটা কাজে নিরঞ্জন একটু সরে গেল দরজা থেকে। ঠাকুরই সরিয়ে দিয়েছেন সন্দেহ কি। অন্তরের ব্যাকুলতার কাছে কিসের কি বাধার প্রহরা!
নিরঞ্জন সরে যেতেই নরেন ইশারা করল চুণীলালকে। আর অমনি চুণীলাল টুক করে ঢুকে পড়ল। একেবারে সটান দোতলায়। পা ছুঁয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে।
'আসতে দেরি হল বুঝি?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'আমার সব তাতেই দেরি।'
ধর্মের রাজ্যে ঈশ্বরের রাজ্যে কোনো দেরি নেই। দেরিতে এসেছ বলে তুমি পাত পাবে না, এ হতে পারে না। তোমার খাবার ঠিক তোলা আছে।
'তাতে কি।' ঠাকুর ইশারা করে চুণীলালকে কাছে ডাকলেন : 'তুমি কিছু চাও?'
'চাইব না, এ কখনো হতে পারে? চাই।'
'বেশ তো বলো না কি চাইবে?'
সত্যিই, কি চাইব কিছুই মনে এল না চুণীলালের। কোন চাওয়াটা সেরা চাওয়া, কোন বস্তুর তার তীব্রতম অভাব, কি চাইলে আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদাবান করা যায়, কিছুই বুঝে উঠল না। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল।
শোন, কিছুই চাইতে হবে না, শুধু এইটেতে ভক্তি-বিশ্বাস রাখিস, তা হলেই হবে। ঠাকুর নিজের দেহের দিকে সংকেত করলেন, 'শুধু তোর হবে না, সকলের হবে।'
জয় রামকৃষ্ণ! আর কি চাই। সাধ্যি কি কলি আমাদের বলি দেয়!
শুধু বিশ্বাস! শুধু নাম। অভ্যাসে অনুরাগ। অনুরাগই ভক্তি। অনুরাগই স্পর্শ-মণি। পতিত, স্খলিত, আর্ত, ক্ষুধিতও যদি 'হরিকে নমস্কার' একবার বলে তা হলেই তার সর্ব পাতকের মোচন ঘটে। সূর্য যেমন তমসাকে ও ঝড় যেমন মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি হরিনামও সকল দুঃখ-কুজ্‌ঝটিকা বিদীর্ণ করে ফেলে। যে কথায় হরির প্রসঙ্গ নেই সে কথা মিথ্যা, সে কথা অসৎ। সেই কথাই সত্য সেই কথাই মঙ্গল সেই কথাই পুণ্য যে কথায় ভগবানের গুণের কথার বর্ণনা আছে। উত্তম-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের জয়গানই রমণীয় ও রুচির ও নিত্যনবীন আর তাই মানস মহোৎসব। 'তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং।' হরিনামই মানুষের শোকার্ণবশোষণ।
আবার আরেকদিন রোগশয্যা থেকে উঠে পড়লেন ঠাকুর।
লাটু রাখাল নরেন নিরঞ্জন ঠিক করেছে বাগানের মধ্যে ঐ যে খেজুর গাছ আছে, শেষ রাত্রে তারা রস চুরি করে খাবে। ঠাকুর তা টের পেয়েছেন। কিন্তু ঐ খেজুর গাছের তলায় যে একটা কালসাপ। কি করলেন! উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে। যে পথ দিয়ে ছেলেরা যাবে সে পথ দিয়ে নয়, অন্য পথ দিয়ে তিনি রওনা হলেন গাছের দিকে। সাপটা তাড়িয়ে দিয়ে আবার এসে বিছানা নিলেন। যেমন বেগে গিয়েছিলেন তেমনি বেগে চলে এলেন।

অতন্দ্রা প্রার্থনার মত শ্রীশ্রীমা ছিলেন জেগে। তিনি দেখলেন ব্যাপারটা।

আর ছেলেরা? ছেলেরা সেই খেজুর গাছই খুঁজে পায় না। বাগানের প্রতিটি গাছ যাদের চেনা, চেনা সমস্ত আনাচ-কানাচ, তাদেরই চোখের কাছ থেকে গাছ আজ উধাও হয়ে গেল। ঘুরে-ঘুরে সবাই ক্লান্ত কিন্তু গাছের পাত্তা নেই।

সবাই বুঝল এ প্রভুর কৌতুক।

পরদিন পথ্য খাওয়াবার সময় শ্রীমা জিগগেস করলেন, 'কাল রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ছুটেছিলে কোথায়?'

'তুমি দেখেছ বুঝি?' ঠাকুর তখন বললেন কি হয়েছিল। তার পর বললেন অন্তরঙ্গের মত, 'তুমি যেন এই কথা কাউকে বোলো না।'

রামলালকে ডেকে পাঠালেন ঠাকুর। বললেন, 'এই অসুখ, খাজাঞ্চী-টাজাঞ্চী বলবে, প্রায়শ্চিত্ত করলে না। তুই দশটা টাকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যা, মা-কালীকে নিবেদন করে বামুন-টামুনদের বিলিয়ে দে।'

সারদামণিকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'আমার ইষ্ট-কবচ তুমি নাও, তোমার কাছে রেখে দাও।'

'না, না,' অন্তরে হাহাকার করে উঠলেন শ্রীমা, 'তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক।'

বলা বৃথা। ঠাকুর বাহু থেকে খুলে ফেলেছেন ইষ্ট-কবচ। শ্রীমা'র হাতে সঁপে দিয়েছেন। তবে কি মহাপ্রস্থানের আর দেরি নেই? চলে যাবেন বলেই কি দেহে আর ইষ্টকবচ রাখতে চাচ্ছেন না?

আমি আর তবে কি করতে পারি? কাঁদতে পারি মনের নিরালায়। প্রভু, তুমি শোনো। তুমি বিধান করো। তুমি আমাকে অবসন্ন হতে দিও না।

দ্রৌপদী খেয়ে-দেয়ে সুখাসীন হয়েছে, অযুত শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা কাম্যক-বনে এসে উপস্থিত। আতিথ্য-গ্রহণে নিমন্ত্রণ করল যুধিষ্ঠির। আহ্নিক সমাধান করে আসুন।

সশিষ্য স্নান করতে গেল দুর্বাসা। দ্রৌপদীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এত লোককে খাওয়াব কি করে?

অনন্যোপায় হয়ে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ডাকতে লাগল : হে বাসুদেব, হে জগন্নাথ, প্রণতার্তিবিনাশন, হে বিপন্নপাল, হে পরাৎপর, হে সর্বসাথী পরাধ্যক্ষ, আমাকে রক্ষা করো। হে শরণাগতবৎসল নীলোৎপলদলশ্যাম, পদ্মারুণেক্ষণ, দুঃশাসনের থেকে যেমন একদিন মুক্ত করেছিলে, আজ আবার এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ করো।

ভক্তবৎসল কৃষ্ণ পার্শ্বশায়িনী রুক্মিণীকে ত্যাগ করে চলে এলেন ত্বরিত গমনে। প্রণাম করে দ্রৌপদী বললে তাকে দুর্বাসার কথা।

কৃষ্ণ বললে, 'দ্রৌপদী, আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত, আগে আমাকে ভোজন করাও।'

লজ্জায় অধোমুখ হল দ্রৌপদী। কাতরকণ্ঠে বললে, 'আমার ভোজন পর্যন্ত থালা অন্নে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু আজ আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে, কিছু নেই আর থালাতে।'

বাসুদেব বললেন, 'আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত, এখন কি পরিহাস করা উচিত? শিগগির সেই থালা এনে আমাকে দেখাও।'
নির্বন্ধাতিশয় লঙ্ঘন করতে পারল না দ্রৌপদী। থালা এনে দেখাল। থালার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল, বাসুদেব তা খেয়ে কৃষ্ণাকে বললেন, 'এতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হোক।' ভীমকে বললেন, 'যাও, ব্রাহ্মণদের ডেকে আনো।'
দেবনদীতে স্নান করছে দুর্বাসা ও তার শিষ্যরা, ভীমসেন ডাকতে এল। দুর্বাসা বললে, 'আমাদের আর খেয়ে দরকার নেই, পেট ভরে গিয়েছে। পেট ভরে গিয়েছে।' উদ্গার তুলতে লাগল সকলে। বললে, 'আমাদের জন্যে আর রাঁধতে হবে না। পাকক্রিয়া বন্ধ করুন।'
বৃথা পাকের জন্যে হয়তো অপরাধী হলাম। পাণ্ডবের কোপদৃষ্টিতে আমরা না ভস্মসাৎ হই। ব্রতধারী তপস্বী সদাচাররত নারায়ণ-পরায়ণ পাণ্ডবেরা ক্রোধোদ্দীপ্ত হলে আমরা তুলোর মত পুড়ে মরব। অতএব শীঘ্র পালাই চলো।
পাঞ্চালকুমারী, ভয় নেই। বললে কৃষ্ণ, যারা ধর্মের অনুগত তারা কখনোই অবসন্ন হয় না।
ঠাকুর বললেন, সেখানে সন্তোষ করলেই সকলেই সন্তোষ।
মূলে জলসেচন করো। শাখায়-পল্লবে কে জল দেয়, গোড়ায় জল পেলেই বৃক্ষ পল্লবিত, কুসুমিত ও ফলান্বিত হয়ে উঠবে।
ডাক্তার সরকার বলছে ঠাকুরকে দেখিয়ে, 'ইনি যা বলেন তা অত অন্তরে লাগে কেন? ওঁর সব ধর্ম দেখা আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব—সব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবে চাকটি বেশ হয়।'
যত মত তত পথ কে বলতে পারে? যে সব মত আচরণ করেছে সব পথ বিচরণ করেছে। সব পথই পৌঁছেচে গিয়ে ঈশ্বরে। সব পথে হেঁটে সেই চূড়ান্তকে স্পর্শ করে ফিরে-ফিরে এসেছে।
ফিরে এসেছেন আমাদের জন্যে। ছেড়ে যাওয়াতেও ঈশ্বর, ফিরে আসাতেও ঈশ্বর। সন্ন্যাসেও ঈশ্বর, সংসারেও ঈশ্বর। যেখানে থাকো সেখানেই রামের অযোধ্যা।
মহিমাচরণ বললে, 'আপনার যখন অসুখ তখন ডাক্তারেরা তার কি করবে? এ হচ্ছে ডাক্তারদের অহঙ্কার বাড়ানো।'
ঠাকুর মহেন্দ্র সরকারকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি খুব ভালো ডাক্তার, আর এঁর খুব বিদ্যা।'
'তা কে সন্দেহ করে।' বললে মহিমাচরণ, 'উনি জাহাজ আর আমরা ডিঙি। কিন্তু ওখানে,' ঠাকুরের পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলে, 'ওখানে সবই সমান।'
আমি তো চিকিৎসা করতে আসিনি, আমি নিজেই চিকিৎসিত হতে এসেছি। আমার তিনি অহঙ্কার বাড়াবেন কি, আমার অহঙ্কার তিনি ধুলো করে দিলেন। জড়বাদী ছিলুম, জড় যে চৈতন্যের ছদ্মবেশ ছাড়া কিছু নয় তাই শিখলুম দেখতে। অবতার মানতুম না কিন্তু দেখলুম গোষ্পদীকৃত যে জল তাই আবার সমুদ্রায়িত। বিজ্ঞানী ছিলুম কিন্তু দেখলুম জানার বাইরে অজানা কি বিশাল! সেই মহৎ অজানাকে

স্বীকার করলুম, প্রণাম করলুম। শুষ্ক ছিলুম, ঠাকুর আমাকে 'রসিয়ে' দিলেন। বললেন, শুকনো আছ কিন্তু তুমি রসবে। আমি রসাস্বাদপরিপূর্ণ হয়ে উঠলুম। চিরপুরাতনের মধ্যে দেখলুম সেই নিত্যনতুনকে। যিনি সর্বদা অনুভূয়মান হয়েও আপন মাধুর্যের দ্বারা অননুভূতের মত বিস্ময় জন্মিয়ে থাকেন, তিনিই তো নিত্য-নতুন।

হে অপরিমেয় অমৃত, তোমাকে বুঝতে না দাও, দাও আস্বাদ করতে। অন্তত এটুকু যেন বুঝি তোমার সর্বব্যাপী ভূমামূর্তির কাছে সকলে পরাভূত। তোমার বিশ্বরূপ দেখলে পৃথিবীকে মনে হবে পরমাণু, সমুদ্রকে জলবিন্দু, জ্যোতির্মণ্ডলকে অগ্নি-কণা, বায়ুমণ্ডল ক্ষণিক শ্বাসক্রিয়া, বিশ্বব্যাপী আকাশ সূচীছিদ্র, জগৎ-উৎপত্তি-প্রলয়কারী ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতা সামান্য জীব আর অন্যান্য দেবদেবী ক্ষুদ্র কীটাণু।

হে পূষণ, হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করেছ। সত্যধর্মের জন্য যে উন্মুখ তার দৃষ্টিতে তুমি একে উন্মুক্ত করো।

তিনজনকে পরাভূত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম, নীরন্ধ্র সংশয়—নরেন্দ্রনাথ; দ্বিতীয় দুরপনেয় পাপ—গিরিশচন্দ্র; তৃতীয় স্পর্ধোদ্ধত বিজ্ঞান—মহেন্দ্র সরকার।

নিশাচর একটা পাখি ডেকে উঠল রাতের অন্ধকারে। অমঙ্গলের ভয়ে শ্রীমা'র মন শিউরে উঠল। না, অমঙ্গল কোথায়! সর্বত্র শিব, সর্বত্র শুভ। সর্বত্র শান্তি। সমস্ত বিশ্বের স্বস্তি হোক। খল প্রসন্ন হোক, অনুকূল হোক। সমস্ত প্রাণী পরস্পরের হিতচিন্তা করুক। শুধু ভজনা করুক মৃত্যুঞ্জয় মঙ্গলকে। আর কিছু নয়, ঈশ্বরে মতি হোক অহৈতুকী।

১৬১
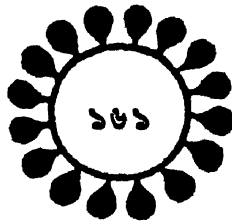
অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে বহু দেবসৈন্য মারা গেল। দুর্বাসার শাপেও স্বর্গ শ্রীহীন, যাগযজ্ঞ লুপ্তপ্রায়। নিরুপায় হয়ে দেবতারা সুমেরু পর্বতে ব্রহ্মার শরণ নিলে। ব্রহ্মা তাদের নিয়ে এল ক্ষীরোদসাগরের পারে, বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বললে, অসুর-দের সঙ্গে সন্ধি কর, তারপর সমুদ্রমন্থন করে উদ্ধার করো অমৃত। সেই অমৃতেই স্বর্গের পুনরুজ্জীবন হবে।

মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে নাও। প্রথমে বিষ উঠবে তাতে ভয় কোরো না। অনেক হয়তো কামনীয় বস্তু উঠবে তাতে লোভ কোরো না। লোভের জিনিস না পেলে ক্রোধ কোরো না। যদি কোথাও শান্তি থাকে তা অন্বেষে।

অসুররাজ বলির কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হল দেবতারা। সন্ধিতে সম্মত হল বলি। কিন্তু এ কি কাণ্ড, জলে নেমেই মন্দর ডুবে গেল অতলে। ভগবান তখন কচ্ছপশরীর ধারণ করে মন্দরকে পিঠে তুললেন। তাকে দাঁড়াবার আধার দিলেন।

শুরু হল মন্থন। প্রথমেই হলাহল উঠল। দেবতারা ভয় পেয়ে গেল, সর্বপ্রাণীর সুহৃদ শঙ্করের শরণ নিল। অন্যের বিপদে এগিয়ে যাওয়া, অন্যের দুঃখে সন্তপ্ত হওয়াই অখিলাত্মা পরমপুরুষের আরাধনা। যারা আত্মমায়ায় মুগ্ধ, পরস্পর বৈর-ভাবে আবদ্ধ তাদের প্রতি কৃপা করলেও ভগবান প্রীত হবেন। সুতরাং আমি এই বিষ পান করব। প্রজাগণের স্বস্তি হোক।

মহাদেব অঞ্জলি করে পান করল হলাহল। তীব্র বিষের প্রভাবে কণ্ঠ নীল হয়ে গেল।

আবার মন্থন চলল। ক্রমশ উঠল সুরভি নামে গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব, ঐরাবত নামে হস্তী, পুষ্পদন্ত প্রভৃতি অষ্ট দিগগজ, কৌস্তুভ নামে পদ্মরাগমণি আর পারিজাত নামে সর্বকামবরদ বৃক্ষ। সর্বশেষে উঠলেন শ্রীদেবী।

দেবী নিজের জন্যে আশ্রয় খুঁজতে লাগলেন। তাকালেন ব্রহ্মার দিকে। উচ্চপদ আছে কিন্তু কামজয় নেই। তাকালেন শুক্রাচার্যের দিকে। জ্ঞান আছে কিন্তু অনা-সক্তি নেই। তাকালেন সনকের দিকে। সর্বসঙ্গবর্জিত বটে কিন্তু সমাধিলীন। তাকালেন পরশুরামের দিকে। ধর্ম আছে কিন্তু দয়া নেই। তাকালেন মার্কণ্ডেয়ের দিকে। দীর্ঘ আয়ু আছে কিন্তু শীল নেই, মঙ্গল নেই। তাকালেন দুর্বাসার দিকে। তপস্যা আছে কিন্তু ক্রোধজয় নেই। কোথায়, কোথায় আমার আশ্রয়?

তাকালেন মুকুন্দের দিকে। আত্মারাম, জ্ঞানকর্মপ্রেমের মূর্তির দিকে। তাকেই বরণ করলেন। তার পর উঠল সুরা নামে আরেক কন্যা। অসুরেরা তাকে আয়ত্ত করল। তোমরা শ্রীকে নাও আমরা সুরাকে নেব। এবার অমৃতকুম্ভ হাতে উঠে এল ধন্বন্তরি। তার হাত থেকে অসুরেরা ছিনিয়ে নিল সুধাভাণ্ড।

দেবতারা হতভম্ব হয়ে গেল। ম্লান মুখে দাঁড়াল এসে শ্রীহরির সামনে। শ্রীহরি মোহিনী মূর্তি ধরলেন। মোহিনীকে দেখে অসুরেরা কামোন্মত্ত হয়ে উঠল। বললে, ভামিনি, অমৃতের অভিলাষে আমরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হয়েছি, তুমি আমাদের এই গৃহকলহ ভঞ্জন করো। এই অমৃতকুম্ভ তুমি নাও, তুমিই বণ্টন-বিতরণ করে দাও।

মোহিনীর হাতে অমৃতকুম্ভ তুলে দিল অসুরেরা। এক পঙক্তিতে দেবতা ও আরেক পঙক্তিতে অসুরদের আলাদা করে বসিয়ে দিল মোহিনী। এবার যাকে যোগ্য মনে করি তাকেই দেব এই অমৃত, জরামরণহারিণী সুধা।

শুধু চারুবাক্যে অসুরদের তৃপ্ত রাখল মোহিনী। অমৃত পান করাল দেবতাদের। অসুর-রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করে বসেছিল দেবতাদের পঙক্তিতে। সে-ও অমৃত পান

করলে। চন্দ্র-সূর্য চিনতে পারল রাহুকে। ছদ্মবেশী, তুমি এখানে? চক্র দ্বারা তার মাথা কেটে ফেলল তক্ষুনি। মাথা কাটলে কি হবে, অমৃত পান করেছে রাহু, তাই মরল না। চন্দ্র-সূর্যের চিরশত্রু হয়ে রইল।
শ্রীহরি তখন স্ত্রীরূপ ত্যাগ করলেন।
এই কান্ড?
অসুরেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দেবতাদের আক্রমণ করলে। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। দেবতারা অমৃত পান করেছে, তাদের সঙ্গে কে পারবে? বলি দ্বৈরথসংগ্রামে ইন্দ্রকে আহ্বান করলে। এত বড় কথা? ইন্দ্র তার শতপর্ব বজ্র উত্তোলন করে বলির দিকে ধাবমান হল। স্পর্ধা করে বললে, এখুনি আমি তোর শিরশ্ছেদ করছি।
বলি হাসল। বলল, বৃথা হর্ষ রাখো। আমরা সকলে কালপ্রেরিত হয়ে কর্ম করছি, তুমি যদি জয়ীও হও, মনে কোরো না তুমি তোমার জয়ের বা আমার পরাজয়ের কর্তা। কর্তা স্বয়ং বিভু। তুমি নিতান্ত অজ্ঞ, তাই স্পর্ধান্বিত রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করছ।
তর্ক রাখো। বজ্রাঘাতে বলিকে ভূতলে নিক্ষেপ করল দেবরাজ।
অসুরেরা বলিকে অস্তপর্বতে নিয়ে গেল। শুক্রাচার্য তাঁর সঞ্জীবনী দিয়ে বলিকে বাঁচিয়ে দিলেন। লোকতত্ত্বে বিচক্ষণ বলি, পরাজয়েও খিন্ন হল না, পরাভূত হল না।
পিতামহ প্রহ্লাদকে প্রণাম করে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ আরম্ভ করল। যজ্ঞের হুতাশন থেকে রথ অশ্ব ধ্বজ ধনু তূনীর কবচ উত্থিত হল। শুক্রাচার্য দিব্য শঙ্খ দিলেন। ইন্দ্র-পুরী অবরোধ করল। ধ্বনিত করল সেই মহাস্বন শঙ্খ। দেবগুরু বৃহস্পতি ভয়চকিত হয়ে ইন্দ্রকে গিয়ে বললেন, স্বয়ং শ্রীহরি ছাড়া কেউ বলিকে নিরস্ত করতে পারবে না। তোমরা দ্রুত অদৃশ্য হও, অর্থাৎ পলায়ন করো।
পালিয়ে গেল দেবতারা। বলি স্বর্গপুরী অধিকার করে বসল।
দেবমাতা অদিতি স্বামিত্যক্ত আশ্রমে অনাথার মত বাস করতে লাগল। অদিতিপতি কশ্যপ একদিন ফিরে এলেন আশ্রমে। দেখলেন আশ্রম আনন্দশূন্য, অদিতি দীনা-হীনার মত বসে আছে এক কোণে। কি, সমস্ত কুশল তো? কোনো অতিথি ফিরে যায়নি তো অনাদৃত হয়ে?
কুশল? এর চেয়ে ঘোরতর দুর্দিন আর কি হতে পারে? শত্রুরা আমার পুত্রদের লাঞ্ছিত করেছে, তাদের শ্রী হরণ করেছে, রাজ্য অধিকার করে নিয়েছে, আপনি যদি এর প্রতিবিধান না করেন তো কে করবে?
কিসের রাজ্য, কিসের শ্রী? কে-বা কার পতিপুত্র? কশ্যপ হাসলেন। সমস্তই বিষ্ণু-মায়া। সেই মায়াতেই এই জগৎ স্নেহবন্ধ, মোহাক্রান্ত। যদি কিছু সত্যবস্তু থেকে থাকে তা হচ্ছে ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বরভক্তিই অমোঘা, নিশ্চিতফলপ্রদা।
সুতরাং বাসুদেবপরায়ণ হও। পয়োব্রত নামে ব্রত উদ্‌যাপন করো। সে ব্রতের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অসদালাপ বর্জন, উচ্চ-নীচ সমস্ত রকম ভোগ-ত্যাগ, সর্বভূতে অহিংসা আর ঈশ্বরে নিশ্চল একাগ্রতা।

ব্রত উদ্‌যাপন করল অদিতি। আদিপুরুষ ভগবান তার কাছে আবির্ভূত হলেন। প্রীতি-বিহ্বল হয়ে অদিতি ভূমিতে দেহ রেখে দণ্ডবৎ তাঁকে প্রণাম করল। রোমাঞ্চিতকায়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ ছাপিয়ে নেমে এল আনন্দাশ্রু। প্রভু, দাঁড়াও, তোমাকে আরো একটুকু দেখি।

শোনো। বলপ্রয়োগে অসুররা এখন পরাজিত হবে না। আমি নিজে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করে তোমার পুত্রদের রক্ষা করব। বলে অন্তর্হিত হলেন শ্রীহরি।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ মুহূর্তে অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্ম হল। বটুরূপ ধারণ করলেন। কত জনে কত উপহার নিয়ে এল। সূর্য দিল সাবিত্রীমন্ত্র, বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, পিতা কশ্যপ মেখলা, মাতা অদিতি কৌপীন। স্বর্গ দিল ছত্র, সোম দণ্ড, সরস্বতী অক্ষমালা, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, কুবের ভিক্ষাপাত্র আর ভগবতী ভিক্ষা।

উপনয়নের পর ব্রাহ্মণবটু চলল বলির যজ্ঞক্ষেত্রে। প্রতি পদক্ষেপে ভূমিকে অবনমিত করতে-করতে।

এ কে তুমি অভিনব? তেজোদৃপ্ত রূপচ্ছটায় বলি অভিভূত হয়ে গেল। এস তোমার পা দুখানি নিজ হাতে ধুয়ে দিই।

নিজ হাতে পা ধুয়ে দিয়ে সেই পাদশৌচ জল মাথায় তুলে নিল বলি। বললে, আজ আমার যজ্ঞ ফলান্বিত, আমার পিতৃপুরুষ তৃপ্ত আর আমার কুল পাবিত হল। আপনার পদজলে আমার পাপ প্রক্ষালিত হল, আপনার পদন্যাসে ভূমিতল তীর্থীকৃত হল। আপনি যা ইচ্ছা করেন, তাই গ্রহণ করুন। আপনাকে প্রার্থী বলেই অনুমান করছি। গাভী কাঞ্চন গজ তুরঙ্গ রথ গৃহ অন্ন পেয় সমৃদ্ধ গ্রাম বিপ্রকন্যা যা আপনি অভিলাষ করেন, তাই আপনাকে দেব অকাতরে। দেব ভূরি-ভূরি।

তোমার এই বাক্য সুনৃত, ধর্মান্বিত, তোমারই কুলোচিত। বললে বামনদেব। তোমাদের বংশে এমন কেউ নিঃস্বত্ব কৃপণ জন্মেনি যে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মনে করো তোমার পিতা বিরোচনের কথা। শত্রু দেবতা ছদ্মবেশ ধরে এসেছে জেনেও তাকে তার পরমায়ু দিয়ে ফেললে। তুমি যোগ্য কুলভূষণ। শোনো আমার যাচনীয় বিশেষ কিছু নেই, আমি তোমার কাছে শুধু তিন পদ ভূমি প্রার্থনা করছি।

বলি পরিহাস করে উঠল। বললে, আপনার আকারের মতই আপনার বুদ্ধি! বালকের মত কথা বলছেন কেন? যে ত্রিলোকের একেশ্বর তার কাছে আপনি শুধু তিন-পা মাটি চাইছেন? ভূমিই যদি নিতে হয় অন্তত জীবিকা ধারণের উপযুক্ত পরিমাণ গ্রহণ করুন।

আমার যাবন্মাত্র প্রয়োজন, ততটুকুই আমি নেব। বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনং। তার বেশি নিলে আমার পাপ হবে। বললে বামনদেব। যা যদৃচ্ছাক্রমে আসে তাতে যে সন্তুষ্ট, সেই যথার্থ সুখী। যে অসন্তুষ্ট অজিতাত্ম তার ত্রিভুবনেও সুখ নেই। তিন-পা ভূমিই আমার যথেষ্ট, তাতেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি। সুতরাং তার অতিরিক্ত আমার কামনীয় নয়।

বেশ, তবে তিন-পা ভূমিই আপনাকে দেব।
ভূমিদানের জন্যে বলি জলপাত্র হাতে নিয়েছে, শুক্রাচার্য ছুটে এল। বললে, মহারাজ, ক্ষান্ত হোন।
সে কি?
আপনি জানেন না এই বামনবেশী ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিষ্ণু। মায়াবলে আপনার সমস্ত কেড়ে নিতে এসেছে। আপনার স্থান শ্রী যশ বিদ্যা—সমস্ত। সমস্ত কেড়ে নিয়ে দিয়ে দেবে ইন্দ্রকে, আপনার প্রতিপক্ষকে। এ আপনি কিছুতে সহ্য করবেন না। ইনি বিশ্বকায়, ত্রিপদ দিয়ে ত্রিলোক আক্রমণ করবেন। অবহিত হোন, এঁকে কিছু দান করবেন না। দৈত্যকুলের মহা অনর্থ ডেকে আনবেন না। তিন লোক দিয়ে এঁর তিন-পদ পূরণ করতে পারবেন না, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে নিরয়গামী হবেন। যে দানে দাতার জীবন বিপন্ন হয় সে দান অদেয়।
কিন্তু মিথ্যাকথনের পাপে লিপ্ত হব? বলি প্রতিবাদ করে উঠল।
শুক্রাচার্য বললে, স্ত্রীর কাছে, কৌতুকে, বিবাহ ব্যাপারে, জীবিকার জন্যে, প্রাণ-সংকটে, সর্বস্বাপহরণ কালে, গোব্রাহ্মণের হিতার্থে, কারু প্রাণহিংসা নিবারণকল্পে মিথ্যাকথন দূষণীয় নয়। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম অবগত না হয়ে সত্যানুষ্ঠানে উদ্যত হয় সে নিতান্ত বালক। আর যে সত্য ও অসত্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করতে পারে সে-ই প্রকৃত ধর্মজ্ঞ। অকৃতপ্রজ্ঞ লোক ধর্মাভিলাষী হয়ে কৌশিকের মত মহাপাপে নিমগ্ন হয়।
কে কৌশিক?
এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। গ্রামের অনতিদূরে অরণ্যপ্রান্তে বাস করতেন। একমাত্র ব্রত ছিল, সে হচ্ছে সত্যকথন। সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ। একদা কতকগুলি লোক দস্যুতাড়িত হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করল। পশ্চাদ্ধাবিত দস্যুরাও খুঁজতে-খুঁজতে এল সেই বনপ্রান্তে। কৌশিককে জিগগেস করলে, কতকগুলি লোক ভীত-ত্রস্ত হয়ে এই দিকে এসেছিল আপনি দেখেছেন? দেখেছি। কোন পথে গিয়েছে যদি জানেন সত্য করে বলুন। সত্যব্রতরত কৌশিক বললেন, ঐ বৃক্ষলতা-গুল্ম বেষ্টিত অটবীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। ক্রূরকর্মা দস্যুরা অরণ্যে ঢুকে লোক-গুলির সন্ধান পেল ও তাদের আক্রমণ ও বিনাশ করল। সূক্ষ্মধর্মে অনভিজ্ঞ কৌশিক সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হয়ে ঘোর নরকে নিপতিত হল।
বলি বললে, প্রভু, যা বললেন তা গৃহস্থদের ধর্ম। কিন্তু আমি প্রহ্লাদের বংশধর, দেব বলে কথা দিলে সে কথা ফিরিয়ে নিতে পারব না। বিত্তের বিবেচনা আমার কাছে বিবেচনাই নয়। তার নাশে-লাভে আমার সমান অস্পৃহা। পৃথিবী বলেছে, অসত্যের চেয়ে বড় অধর্ম আর কিছু নেই। অসত্যপর নর ছাড়া আর সকলের ভারই সহ্য করতে পারি, মিথ্যাবাদীর সংস্পর্শই অসহ্য। নরককে ভয় করি না, সর্ব-দুঃখের আকর দারিদ্র্যকে ভয় করি না, মৃত্যুকে না, স্থানচ্যুতিকে না; একমাত্র ভয় করি মিথ্যাকে, বঞ্চনাকে, প্রতিশ্রুতি-পালনের পরাঙ্মুখতাকে। সুতরাং ইনি বিষ্ণুই হোন আর শত্রুই হোন, এই বটুর প্রার্থিত ভূমি আমি দান করব।

শুক্রাচার্য বিফলমনোরথ হয়ে শাপ দিল বলিকে।
গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েও সত্য থেকে বিচ্যুত হল না বলি। বামনকে অর্চনা করে ভূমিস্পর্শ করে প্রথমে জলদান করল।
বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী স্বর্ণকুম্ভ ভরে আরো জল নিয়ে এল। সে জলে বলি স্বয়ং বামনের পদযুগল ধুয়ে দিল। আর সেই বিশ্বপাবন জল মাথায় ধরল।
এবার নিন আপনার ত্রিপাদ ভূমি।
এক পদে সমস্ত মর্তমহী আকাশ ও দিগ-দিগন্ত আক্রমণ ও আচ্ছন্ন করল বামন। যখন দ্বিতীয় পদ ক্ষেপণ করল স্বর্গ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মহর্লোক ও তপোলোক ছাড়িয়ে পেঁছুল গিয়ে শেষলোকে, সত্যলোকে। তৃতীয় পদের জন্যে আর অণুমাত্র স্থান রইল না।
বামন বললে, দুই পদে সমুদয় স্বর্গমর্ত ঢাকা পড়েছে, এবার তৃতীয় পদের জন্যে স্থান দাও। নিজেকে আঢ্য মনে করে দানের অঙ্গীকার করেছ, এবার পূরণ করো অঙ্গীকার। অর্থীকে প্রতিশ্রুত বস্তু না দিয়ে যে বঞ্চনা করে তার মনোরথ বৃথা, তার স্বর্গ দূরস্থ এবং তার পতন অনিবার্য।
আমার বাক্য কখনো মিথ্যে হবার নয়। বললে বলি। হে উত্তমশ্লোক, আপনার তৃতীয় পদের জন্যেও আমি স্থান দেব। আমি কখনোই ভঙ্গ করব না প্রতিজ্ঞা। আমার এই মাথাই আপনার তৃতীয় পদের স্থান। 'পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজং।' পদচ্যুতি পাশবন্ধন বা নরককেও আমি ভয় করি না, আমার ভয় অপযশে। আমার মাথায় রাখুন আপনার তৃতীয় পদ। অন্তে যে দেহের অবসান হবে তাতে কি প্রয়োজন? বিত্তাপহারী দস্যু স্বজনবর্গেই বা কি প্রয়োজন? সংসারহেতুভূতা স্ত্রীতেই বা কি দরকার? এ আমার কি সৌভাগ্য, যে সম্পদ কৃতান্তকে ভুলিয়ে রাখে সে সম্পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আপনার সামীপ্য পেলুম। পেলুম আপনার পদস্পর্শের অধিকার।
সেখানে তখন প্রহ্লাদ এসে উপস্থিত হল। পিতামহকে পূজোপহার দিতে পারছে না, বলি ব্রীড়ামণ্ডিত অধোমুখে অশ্রুবিলোল নয়নে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
শ্রীহরিকে প্রণাম করে প্রহ্লাদ বললে, ভগবন, আপনিই বলিকে ইন্দ্রপদ দিয়েছিলেন, আপনিই আবার সেই মোহকর সম্পদ প্রত্যাহার করলেন। এর চেয়ে বলির আর কি ভাগ্য হতে পারে?
কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে বিন্ধ্যাবলী, হে ঈশ্বর! আপনি নিজ খেলার জন্যে এই ত্রিজগৎ রচনা করেছেন। যারা কুবুদ্ধি তারাই কর্তৃত্বের অভিমান করে। যতই অহঙ্কার করুক তাদের সাধ্য কি দান করে আপনাকে?
ব্রহ্মা বললে, হে ভূতেশ, হৃতসর্বস্ব বলিকে মোচন করুন। এ নিগ্রহযোগ্য নয়, সত্য-রক্ষার জন্যে সর্বস্ব দান করেছে আপনাকে। দান করেছে নিজেকে, নিজের মাথা আপনার পায়ে বিকিয়ে দিয়েছে। আর কি চাই?
তাই তো হয়। বললেন শ্রীহরি। যাকে আমি কৃপা করি তার সকল সম্পদ আমি কেড়ে নিই। যে লোক সম্পদে মত্ত ও স্তব্ধ, সে যে আমাকেও অবজ্ঞা করে। দৈত্য-কুলের কীর্তিবর্ধন এই বলি দুর্জয়া মায়াকে পরাভূত করেছে। জ্ঞাতিরা একে ত্যাগ

করেছে, গুরু অভিসম্পাত দিয়েছে, তবুও আমার ছলনা বুঝতে পেরেও সত্য থেকে বিচলিত হয়নি। একে আমি দেবদুর্লভ স্থান দিচ্ছি। বলি, তুমি সুতলে গিয়ে বাস করো। সেখানে দেবদানব কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। আমি সানুচর তোমাকে রক্ষা করব। তুমি সর্বক্ষণ আমাকে তোমার কাছে সন্নিহিত দেখতে পাবে। তোমার মঙ্গল হোক।

ঠাকুর বললেন, 'ঠিক-ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাত। ঠিক-ঠিক সন্ন্যাসী, ঠিক-ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। মধু বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত, সন্দেশেও বসছে আবার পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বরভাবেতে রয়েছে আবার কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে মেতেছে। ঠিক-ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতক পাখির মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না। সাত সমুদ্র তেরো নদী ভরপুর, সে অন্য জল ছোঁবে না। ছোঁবে না কামিনী-কাঞ্চন। পাছে আসক্তি হয় কাছেও রাখবে না।'

ডাক্তার সরকারকে এবার লক্ষ্য করলেন ঠাকুর, 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ তোমাদের পক্ষে নয়। তবে এ জানবে টাকাতে ডাল-ভাত হয়, পরবার কাপড় হয়, থাকবার একটি স্থান হয় আর ঠাকুরের ও সাধু ভক্তদের সেবা হয়। ব্যস এই পর্যন্ত। আর স্ত্রী। স্বদারায় গমন দোষের নয়। তবে একটি দুটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে ভাই-ভগিনীর মত থাকবে।'

কিন্তু সন্ন্যাসী?

'সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। "সন্ন্যাসী নারী হেরবে না" এই সন্ন্যাসীর ধর্ম। ছোট হরিদাস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল, চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত্যাগ করলেন। কালো পাঁঠা মা'র সেবার জন্যে বলি দিতে হয়, কিন্তু একটু ঘা থাকলে হয় না। সন্ন্যাসী রমণীসঙ্গ তো করবেই না, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করবে না। জিতেন্দ্রিয় হলেও না, লোকশিক্ষার জন্যেও না। তার এমন স্থানে থাকা উচিত যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না বা অনেক কাল পরে দেখা যায়।'

আর টাকাকড়ি?

'টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা। হিসাব, দুশ্চিন্তা, অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, দেহের সুখের চেষ্টা, এই সব এসে পড়ে। সূর্য দেখা যাচ্ছিল, মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে। সন্ন্যাসীর পক্ষে গেরো দেওয়া সেলাইকরা পরদা গুটানো দোরবাক্সে চাবি দেওয়া এই সব চলবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন থুতু ফেলে থুতু খাওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা নেওয়া মানে ব্রাহ্মণের বিধবা হবিষ্য খেয়ে বাগদি উপপতি করা। সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? সন্ন্যাসীর ষোলো আনা ত্যাগ দেখলেই তো লোকের সাহস হবে।' বলে ঠাকুর গল্প গাঁথলেন :

একজন সস্ত্রীক বিবাগী হয়ে বেরুল তীর্থ করতে। পথে যেতে স্বামী দেখতে পেল এক জায়গায় কয়েকটা হীরে পড়ে আছে। ভাবলে এগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে রাখি,

নইলে যদি স্ত্রী দেখতে পায় তবে তার লোভ হতে পারে। মাটি চাপা দিয়ে রাখছে, স্ত্রী পিছন থেকে এগিয়ে এসে বললে, ও কি করছ? স্বামী থতমত খেয়ে গেল। স্ত্রী ছাড়বে কেন, নিজেই পা দিয়ে মাটিগুলি সরাতে লাগল। যেই সরিয়েছে দেখতে পেল, হীরে! তখন বললে, আশ্চর্য, এখনো হীরে-মাটি তফাত দেখছ, তবে তুমি মরতে বনে এলে কেন?

তেজচন্দ্র মিত্রকে ডেকে পাঠান ঠাকুর। কিন্তু তার কি আসবার সময় আছে? তার কেবল কাজ, কেবল আপিস! 'তোকে এত ডেকে পাঠাই আসিস না কেন?' সেদিন আসতেই জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আপনিই ডাকেন, আপনিই আবার আটকান। মন্দিরও আপনি আপিসও আপনি।'

'আমি তোকে আপনার জন বলে জানি, তাই ডাকি।'

'কিন্তু সাড়া দেবার মত প্রাণ দিচ্ছেন না কেন? অবসর নেই, অবসর নেই, এই তো প্রাণের কান্না।'

'অবসর নেই, অবসর নেই!' প্রতিধ্বনি করলেন ঠাকুর।

এই অনবসরের মধ্যেও ঈশ্বর। ঈশ্বর যখন তিন পায়ে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল আচ্ছন্ন করেছেন, তখন স্থানে-কালে অবসরে-অনবসরে কোথায় আর ব্যবধান? আমার ধ্যানে যেমন ঈশ্বর আমার বিক্ষিপ্ততায়ও তেমনি ঈশ্বর। আমার নামে যেমন ঈশ্বর, বিস্মৃতিতেও তেমনি ঈশ্বর। যেমন ঈশ্বরচিন্তনে তেমনি ঈশ্বর-বিভ্রান্তিতে।

তোমাকে যদি আমি ভুলে থাকি সে তুমিই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছ বলে। আমার মধ্যে উচ্ছ্বসিত যে এই নিশ্বাস এ তোমারই তপ্ত প্রাণ-স্পর্শ। আমি এই যে লিখছি এ-ও তোমাকেই লেখা। এই যে পড়ছি এ-ও তোমাকেই দেখা।

'দিবীব চক্ষুরাততং।' এক-সঙ্গে অতি সহজেই সমস্ত আকাশকে চোখ দেখে। তেমনি তোমাকে দেখতে দাও। ভেঙে-ভেঙে নয়, টুকরো-টুকরো করে নয়, জীবনের ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠের মধ্যে নয়, সম্মিলিত করে এক-সঙ্গে দেখা, সমগ্র করে এক-সঙ্গে আস্বাদ করা। ঈশ্বরের পদতলে বলি হওয়া।
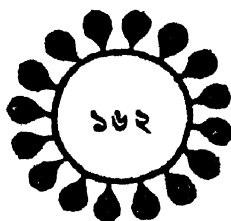
দুপুরবেলা। মেঘ নেই বৃষ্টি নেই, রোদেভরা আকাশ, হঠাৎ একটা বাজ পড়ল। আচমকা আওয়াজ শুনে চমকে উঠল লক্ষ্মী। চমকে উঠলেন শ্রীমা।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এ কি অলক্ষণ!
দুজনেই ছুটে গেল ঠাকুরের ঘরে।
ঠাকুর বললেন, 'কি গো, ভয় পেয়ে ছুটে এসেছ বুঝি?'
তা ছাড়া আবার কি! দুজনে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। ঠাকুরের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।
'রাম-অবতারে লীলা-অবসানের আগে কালপুরুষ স্বয়ং এসেছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'এবার বজ্রধ্বনিতে সঙ্কেত করে গেলেন দিন আর নেই। খেলাঘর ভেঙে দাও এবার।'
লক্ষ্মী বুঝি আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।
'কিসের দুঃখ কিসের শোক!' লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিলেন ঠাকুর: 'এখানকার কত কথাই তো শুনলি, সেই সব কথা বলবি সবাইকে। সে তো শুধু আনন্দের কথা, অমৃতের কথা। দেশে রঘুবীর আছে, তাকে নিয়ে থাকবি। আর কতদিনের জন্যেই বা এই তিরোধান। শোন, একশো বছর—মোটে একশো বছর—'
দুজনে তাকাল উৎসুক হয়ে।
'একশো বছর পরে আবার আসব।'
'এই একশো বছর থাকবে কোথায়?' জিগগেস করলেন শ্রীমা।
'থাকব ভক্তহৃদয়ে।'
'আপনি আসুন গে। আমি আর আসছি না।' অভিমানভরে বললে লক্ষ্মী, 'তামাক-কাটা করলেও না।'
ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'আমি যদি আসি তো থাকবি কোথায়? প্রাণ টিকবে না যে আমাকে ছাড়া। কলমির দল এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।'
লক্ষ্মীকে ঠাকুর শীতলা-জ্ঞান করতেন। কামারপুকুরের ঘরে যে মা-শীতলা আছেন লক্ষ্মী তাঁরই প্রতিরূপ।
হৃদয় যখন চলে যায় ঠাকুরকে বলেছিল, 'মামা, এখানে কি করতে পড়ে আছ? গঙ্গার ধারে তোমার জন্যে যে একখানা বাগান দেখে এসেছি সেখানে চল তোমাকে নিয়ে গিয়ে বসাই। তারপর দেখাই একবার ভানুমতীর খেল্।'
ঠাকুর বললেন, 'শালা তুই আমাকে শীতলা পেয়েছিস? শীতলার বামুনের মত তুই আমাকে ফিরি করে বেড়াবি? আমি তোর পয়সা রোজগারের ফিকির? এই হীন-বুদ্ধি নিয়ে তুই জীবন কাটালি? তোর দুঃখ তবে কে ঘোচাবে?'
যে শীতলা বামুনের থালায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় না, যে শীতলা ভক্তের হৃদয়পদ্মে স্থির হয়ে থাকে সে-ই লক্ষ্মী।
ভবতারিণী ও রাধাকান্তের জন্যে কত ভোগসামগ্রী আসে, কত ভালো-ভালো ফল আর মিষ্টি, আহা, আমার কামারপুকুরের শীতলা কিছুই খেতে পায় না এই ভেবে কষ্ট হয় ঠাকুরের। একদিন মা-শীতলা স্বপ্ন দিলেন ঠাকুরকে, 'গদাই, আমি এক-রূপে ঘটে আর এক রূপে তোমাদের লক্ষ্মীতে। লক্ষ্মীকে খাওয়ালেই আমার খাওয়া হবে।'

কাশীপুরে দুবার ঠাকুর পুজো করলেন লক্ষ্মীকে। তার উচ্ছিষ্ট খেলেন।
গিরিশকে বললেন, 'লক্ষ্মীকে মিষ্টি-টিষ্টি একদিন খাইও। তাহলেই মা-শীতলাকে ভোগ দেওয়া হবে। লক্ষ্মী মা-শীতলারই অংশ।'
শ্রীমাকে বললেন, 'আমার বড় সাধ লক্ষ্মীকে একজোড়া বালা ও একছড়া হার দি।'
রাম দত্ত কাছে ছিল, বলে উঠল, 'বেশ তো, আগামী রোববারই আমি নিয়ে আসব।'
আগামী রোববার আর আসে না। ঠাকুর বললেন, 'শালা ভেগেছে।'
শ্রীমা বললেন, 'বেশ তো, তোমার যখন অত সাধ, আমার পুরোনো বালা ও হার লক্ষ্মীকে দিয়ে দি।'
'না, না, তোমারটা দিতে যাবে কেন? আমার নতুন গড়িয়ে দেবার সাধ। মা-শীতলা বলে দেব।'
লক্ষ্মীর কানে গেল কথাটা। বললে, 'আমি হার-বালা চাই না। আমি ঐ টাকায় বৃন্দাবনে যাব।'
'সে তো যাবিই। কিন্তু তোর নতুন গয়নাও চাই যে।'
ঠাকুর বেঁচে থাকতে সে গয়না হয়নি। পরে যখন ভক্তরা জানতে পেল ঠাকুরের সাধের কথা, হার-বালা গড়িয়ে দিল লক্ষ্মীকে। ঠাকুরের সাধ, লক্ষ্মী তাই হাতে-গলায় পরল সে গয়না। কিন্তু পরামাত্রই খুলে ফেলল। দিয়ে দিল অন্যকে।
শ্রীমা বললেন, 'কাল উনি বীজমন্ত্র আমার জিভে লিখে দিয়েছেন। তুই যা না। তোকেও লিখে দেবেন দেখিস।'
লক্ষ্মী কেমন কুণ্ঠিত হল। বললে, 'আমার বড় লজ্জা করে।'
'সে কি রে? তাঁর কাছে যাবি, লজ্জা কিসের?'
'কি বলে চাইব?'
'মুখ খুলে চাইতে হবে কেন? অন্তরে অভিলাষটি নিয়ে দাঁড়াবি, তিনি ঠিক শুনতে পাবেন। একবার শোনাতে পারলে তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন, নিজের থেকেই ব্যবস্থা করবেন—'
'কারা সব আছে।'
সেদিন গেল না লক্ষ্মী। তারপর এমনি একদিন গিয়েছে প্রণাম করতে, ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তোর কোন ঠাকুর ভালো লাগে?'
লক্ষ্মীর বুকের ভিতরে আনন্দ উথলে উঠল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, রাধাকৃষ্ণ।
'জিভ বার কর।' জিভের উপর বীজ ও নাম লিখে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর গলায় দেখছি তুলসীর মালা। কে দিয়েছে?'
'লাহাবাবুদের পেসন্নদিদি।'
'হ্যাঁ, ঐ মালা রাখবি। তোকে বেশ দেখায়।'
শ্রীমা এসে বললেন, 'সে কি গো? লক্ষ্মীর যে আগে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।'
'সে আবার কবে?'
'ঐ যে হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী এসেছিল কামারপুকুরে, নাম পূর্ণানন্দস্বামী, তার কাছ থেকে।'

'তা হোক গে। লক্ষ্মীকে আমি যে মন্ত্র দিয়েছি ঠিকই দিয়েছি।'

পুরী এসেছে লক্ষ্মী। স্বর্গদ্বারে নেমেছে স্নান করতে। ঢেউয়ের দোলায় কি করে কে জানে ভাসতে-ভাসতে চলে এসেছে চক্রতীর্থ পর্যন্ত। গোপবেশী কে একজন হিন্দুস্থানী যুবক জলে নেমে তাকে উদ্ধার করল, টেনে তুলল ডাঙার উপর। সুস্থ হয়ে চোখ মেলে তাকে আর দেখতে পেল না লক্ষ্মী।

ক্লান্তদেহে মুহ্যমানের মতো বাড়ি ফিরে এল লক্ষ্মী। তারপর দেহে আরো একটু বল এলে গেল জগন্নাথদর্শনে। এ কি। মন্দিরের বলরামের জায়গায় যে সেই গোপবালক।

মাঝে-মাঝে বলরামের আবেশ হয় লক্ষ্মীর। তখন গলায় নবমল্লিকার মালা দুলিয়ে উত্তাল কেশ এলিয়ে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে। সঙ্গে-সঙ্গে গান ধরে বিভোর হয়ে। পায়ের নিচে মাটি টলমল করতে থাকে। বলে, 'মেয়েছেলে হয়ে এসেছি, নইলে দেখাতাম, কাকে বলে নৃত্য কাকে বা কীর্তন।'

জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়ে দেখে যে জগন্নাথ সেই রামকৃষ্ণ।

ঠাকুর বললেন, 'ঠাকুর দেবতা যদি স্মরণে না আসে তো আমাকে ভাববি। তাহলেই হবে। কি রে, আমাকে মনে হয় তো? কেমন, মনে হয়?'

লক্ষ্মী ঘাড় হেলিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, তা হয়।'

'কি রকম হয়?'

'এই যেমন দেখছি তেমনি।'

লক্ষ্মীকে ভিক্ষেয় পাঠালেন ঠাকুর। বললেন, 'যা বাড়ি-বাড়ি নাম বিলিয়ে আয়।'

'লোকে যদি গালাগাল দেয়?'

'দিক না গালাগাল। তোর পায়ের ধুলো তো তাদের বাড়িতে পড়বে। তাতেই ওদের মঙ্গল।'

কুঠিঘাটা রতনবাবুর বাড়ি ভিক্ষে করতে গেল লক্ষ্মী। তারা একটা সিকি দিল। লক্ষ্মী তো মহা খুশি।

ঠাকুরকে এসে বললে উচ্ছ্বসিত হয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'বড়লোকের বাড়ি গেলি কেন? গরিবের বাঁড়ি যাবি।'

ঠাকুরকে কি ভাবে স্মরণ করবে জানো? লক্ষ্মী প্রণালী বাতলে দিল। প্রথমে ভাববে, ভোরবেলা, ঠাকুর উঠলেন ঘুম থেকে। মুখ-হাত ধুলেন, গেলেন ঝাউতলায়। তারপর তাঁর পা ধুয়ে দিলে। কাপড় ছাড়িয়ে দিলে। তারপর তাঁর গলায় দিলে বেলফুলের মালা। তারপর তাঁকে খেতে দিলে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, বৃন্দাবনের রজ আর গঙ্গাজল। সঙ্গে মাখন-মিছরি। তারপর খেতে দিলে পান-তামাক। তারপর জপের জিনিস এগিয়ে দিলে হাতের কাছে।

দুপুরবেলা খাইয়ে দিলে, ডাল-ভাত ডুমুর কাঁচকলার ঝোল। তারপর তাঁকে শুতে দিলে। পাখা করতে থাকলে। কখনো বা পা টিপতে।

রাত্রে সামান্য লুচি আর পায়েস দিলে খেতে। তারপর আবার শয়ন দিলে। হাওয়া করলে। বসলে পাদপদ্মের সেবায়।

শ্রীমা আর লক্ষ্মীর দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'বলরামকেও বলেছি আর বেশিদিন কষ্টভোগ করতে হবে না।'

'আহা, বলরামের কি স্বভাব!' বলছেন ঠাকুর, 'রাতদিন ঠাকুর নিয়ে আছে। যেন মালী ফুলের মালাই গাঁথছে অবিরাম। আমার জন্যে উড়িষ্যায় কোঠারে যায় না। ভাই মাসোয়ারা বন্ধ করেছিল আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এসে থাক, মিছি-মিছি কেন এত টাকা খরচ। ও সব কথা কানে তুলল না বলরাম। শুধু আমার কাছে থাকবে বলে। আমাকে দেখবে বলে।'

বলরামের বাড়িতে রথ টানলেন ঠাকুর। সঙ্গে গিরিশ, নরেন, কালী, রাম দত্ত, প্রতাপ মজুমদার, মাস্টারমশাই, শশধর তর্কচূড়ামণি। সকলেই দড়ি ধরল।

গান ধরলেন ঠাকুর, সঙ্গে ভাবস্বচ্ছন্দ নৃত্য। নদে টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোল রে।

শশধরকে বললেন, 'শশধর, একেই বলে ভজনানন্দ। সংসারীরা বিষয়ানন্দ ভোগ করে, ভক্তরা ভজনানন্দ। ভজনানন্দ ভোগ করতে-করতেই ব্রহ্মানন্দ।'

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, শশধরের বাড়ি এলেন ঠাকুর। জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি রকম লেকচার দাও?'

[illegible] শশধর বললে, 'আজ্ঞে, শাস্ত্রের কথা বোঝাতে চেষ্টা করি।'

ঠাকুর বললেন, 'জানো তো, আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রুগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিকশ্চার।'

এত বড় পণ্ডিত, কথাটার মানে যেন ধরতে পেল না শশধর।

'বুঝলে না, শাস্ত্রবিহিত কর্ম করবার মতো মানুষের সময় কই? আজকাল শুধু নারদীয় ভক্তি। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।' শশধরের দিকে স্নেহচোখে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'বাবা, আরেকটু বল বাড়াও। আর কিছুদিন সাধনভজন করো। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি কোরো না। তবে, সন্দেহ কি, যেটুকু করছ লোকের ভালোর জন্যেই সব করছ।' বলে ঠাকুর মাথা নত করে শশধরকে নমস্কার করলেন। ভব-তারিণীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মা সেদিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তারপর আজ আবার এখানে এনেছিস। দেখলুম শশধরকে।'

আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।

শশধর বললে, 'তবে আপনারও বিচারবুদ্ধি ছিল?'

'তা এক সময় ছিল।'

'তাহলে বলে দিন আমাদেরও একদিন যাবে। আপনার কেমন করে গেল?'

'অমনি একরকম করে গেল।' বললেন ঠাকুর, 'এখন এই সার কথা, ভক্তিই সার, ঈশ্বরকে ভালোবাসাই সার। শুধু শুষ্ক জ্ঞান নিয়ে থেকো না। প্রেম ধরো। প্রেমই সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি।'

প্রেমই সর্বসাধ্যসার। এ হচ্ছে সেই অনুরাগ যা 'অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল।' তদার্পিতাখিলাচারিতা তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা।

শ্রীমাকে বললেন, 'তোমাকে থাকতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে। লক্ষ্মী তোমার

দোসর হবে। কখনো তাকে কাছছাড়া করবে না। আমার তো হয়ে এল। সে তোমার কাছে থাকলে কত ভালো কথা কয়ে তোমার প্রাণ ঠান্ডা করবে।'

কেন শোক করছি, কিসের জন্যে কার জন্যে শোক? শরীর মন ইন্দ্রিয় দিনে-দিনে ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে, তবে মৃত্যুরূপ পরিবর্তনকে ভয় কেন? মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের পরেও তো আছে আরেক অস্তিত্ব। লোকবিচ্ছেদজরামরণবর্জিত অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্বই তো অবিনাশী। আদ্যন্তরহিত আনন্দরসাশ্রয় অস্তিত্ব। মায়ার জন্যেই দুঃখ। কিসের ভ্রান্তি কিসের মায়া।

মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরেই বর্তমান, কিন্তু নিজে তিনি মায়ায় আবদ্ধ নন। সাপের মুখে বিষ, কিন্তু সে বিষে সাপ নিজে মরে না; সে মুখ দিয়ে সে খাচ্ছে ঢোঁক গিলছে, তবুও না, কিন্তু যাকে কামড়ায় সেই মরে।

সমস্ত জগৎ মায়ারই বিজৃম্ভণ মাত্র। মায়া পরমেশ্বরাশ্রয়া।

মনই মায়া। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণই দ্বৈত আছে। মন থাকলেই বিকার আর বিকার থাকলেই বিনাশ। বিকার মিথ্যা, আধারই সত্য। বিশ্ব তাই স্বপ্নমায়ার মত, গন্ধর্বনগরের মত। আসলে জীব সর্বাবস্থায়ই মুক্ত, শুধু অবিদ্যার বশে আত্ম-স্বরূপবিস্মৃত। কাঁধে গামছা আছে, কপালে-তোলা চশমা আছে, শুধু মনে নেই। হাত যায় না কাঁধে, চশমা ঠিক বসে না চোখের সামনে।

যা তিনকাল ও তিন অবস্থায় সৎ তাই সত্য, যা অবাধিত, অনিরুদ্ধ তাই সত্য। যার বাধ হয় রোধ হয় তা মিথ্যে। সত্য চিরকাল সমস্ত অবস্থাতেই সত্য। শুধু দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন। এই সত্য-মিথ্যে নিয়েই চলেছে লোকব্যবহার। এক বস্তুকে অন্যবস্তু বলে বোধই অজ্ঞান। যথার্থস্বরূপের বোধই জ্ঞান।

যথার্থস্বরূপকে দেখ।

যা বৃহৎ যা মহান যা বাধারহিত যা নিরতিশয় তাই যথার্থস্বরূপ। যার চেয়ে ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট কিছু নেই তাই যথার্থস্বরূপ। যা নশ্বর তাই দোষযুক্ত। যা দোষলেশশূন্য, নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত তাই যথার্থস্বরূপ। তাই ব্রহ্ম। তাই আত্মা, সকলের আত্মা। অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

পুরী থেকে মা ফিরেছেন কলকাতায়, সে তেরেশো এগারো সালের মাঘ মাস। এসেই বললেন, চল একবার আমার শাশুড়ি-ঠাকরুনকে দেখে আসি।

পালকি এসে থামল বোসপাড়া লেনের এক ভাড়াটে বাড়িতে। এখানে মা'র শাশুড়ি কে! এখানে তো নিবেদিতা থাকে।

নিবেদিতা তার নিজের বাড়িতেই নিয়ে এসেছে অঘোরমণিকে, গোপালের মাকে। হাঁটবার-চলবার শক্তি নেই গোপালের মা'র, কেউ দেখবার-শোনবার নেই, তাই নিবেদিতা নিয়ে এসেছে নিজের কাছে। আর কে না জানে গোপালের মা-ই সারদামণির শাশুড়ি।

শয্যায় মিশে আছে গোপালের মা। বাইরে কি একটা কথা বলেছে সারদামণি, কণ্ঠ-স্বর ঠিক চিনতে পেরেছে। কে ও? আমার মা কি এলে? আমার বৌমা? আমার বৌমা এসেছ?

'হ্যাঁ, মা, আমি এসেছি।' কয়েকটি ফল হাতে নিয়ে সারদামণি ঘরে ঢুকল। ফল কটি গোপালের মা'র হাতে দিয়ে প্রণাম করল সারদামণি। চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে একটু আদর করল গোপালের মা। বললে, 'ও বৌমা, আমার গোপাল কেমন আছে?'

'তিনি তো ভালোই আছেন।'

'তুমি সময়মত আমার কথা তাকে মনে করিয়ে দিও, মা।'

'তিনি তো আপনার কাছেই রয়েছেন।'

এই গোপালই তো মীরাবাঈ-এর রণছোড়, তার গিরিধারী নাগর। 'মেরে তো গিরি-ধর গোপাল, দুসরা ন কোঈ।' আমার আছে শুধু গিরিধারী গোপাল, আর কেউ আমার দোসর নেই। যার মাথায় ময়ূরপুচ্ছের মুকুট সেই আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব। বাপ মা ভাই বন্ধু কেউ আমার স্বজন নয়। গিরিধারীই আমার স্বজন। আমি কুলের মর্যাদা ছেড়েছি, আর কে কী আমার করবে? সাধুদের সঙ্গ করে লোকলজ্জা খুইয়েছি। চোখের জল ঢেলে-ঢেলে প্রেমলতা পুঁতেছি, সে লতায় ফুল ধরেছে, ধরেছে আনন্দফল। আমাকে দেখে সংসার কাঁদছে কিন্তু ভক্তের দল খুশি। হে ভক্তের ভগবান, তুমিও খুশি হও। হে লাল-গিরিধর, মীরা তোমার দাসী, তাকে তুমি ত্রাণ কর।

মেবারে মেড়তা-তালুকের জমিদার রতনসিং-এর মেয়ে মীরাবাঈ। ছেলেবেলায় কোন এক প্রতিবেশিনীর বাড়িতে গিয়েছে বিয়ের নেমন্তন্নে। মাকে জিগগেস করছে, মা, আমার বিয়ে কার সঙ্গে? আমার বর কই?

বাড়িতে কুলদেবতা গিরধারীলাল, সেই বিগ্রহ দেখিয়ে মা বললেন, 'ঐ তোমার বর, ওরই সঙ্গে তোমার বিয়ে।'

মীরার যখন সত্যি বিয়ে হয়, দেখল সংসারবিলাসে সুখ নেই, 'হরি বিন রহ্যা ন যায়।' সখি আর যে থাকতে পারি না হরিহারা হয়ে। শাশুড়ি কাটব্য করে, ননদ গঞ্জনা দেয়, রানা তো বিরস-বিরক্ত হয়েই আছেন। ঘরে বন্দী করেছেন, দরজায় তালা লাগিয়েছেন, রেখেছেন পাহারাওয়ালা। কিন্তু এ তো আমার পূর্ব-পূর্ব জন্মের পুরোনো প্রেম, এ আমি ভুলি কি করে? হে মীরার গিরিধারী নাগর, তুমি ছাড়া আর কাউকে যে আমার মনে ধরে না।

হে মীঠাবোলা, সাজন-ঘরে একবার এস। পথের পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কতদিন আর চেয়ে থাকব? আসতে তোমার ভয় কি, তুমি এলেই তো সুখোৎসব। হে শ্যামলমোহন, তোমাকেই তো দেব আমার দেহমন, তুমি এলেই তো রঙ্গ পূর্ণ হবে। আর দেরি কোরো না। 'কাজল-তিলক-তমোলা' সব রঙ ত্যাগ করেছি তোমার জন্যে, তোমারই রঙে রঙিন হব বলে। তোমার জন্যে বুকের আঁচল আজ খুলে দিয়েছি, তুমি এস।

হে প্রভু, মীরাকে তোমার 'সাঁচী দাসী' করে নাও। মিথ্যা সংসারমায়ার ফাঁদ ছাড়িয়ে দাও। আমার বিবেকের ঘর এরা লুঠ করে নিল, শত বল-বুদ্ধি খাটিয়েও এঁটে উঠতে পারছি না। হে রাম, কিছুই যে আমার বশে নেই, মৃত্যুর পথে চলেছি বিকল হয়ে। তুমি এস, আমাকে বাঁচাও। প্রত্যহ ধর্মের উপদেশ শুনছি, মনকে ভয় পাইয়ে

রেখেছি কুপথ থেকে, সর্বদা সাধুসেবা করছি, স্মরণে-ধ্যানে চিত্তকে ধরে আছি দৃঢ় করে। তুমি এবার মুক্তির পথ দেখাও। মীরাকে 'সাঁচী দাসী বনাও।'

ননদ এসে বললে, 'ভাবি, সাধুসংগ ছাড়, তোমার কলঙ্কে যে কান আর পাতা যায় না, তোমার নিন্দায় শহর-গাঁ তোলপাড়। তুমি যে রাজকুলের বধূ তা কি ভুলে থাকবে?'

'আমি গিরিধারীর দাসী। গিরিধারীই আমার যশ, গিরিধারীই আমার নিন্দা।'

'তোমার এই শুষ্ক বেশ আর দেখতে পারি না। পর তোমার মুক্তাহার, তোমার কেয়ূর কঙ্কন। রাজকুলশোভা হয়ে বিরাজ করো।'

মীরা বললে, 'অসার রত্নভূষণ ছেড়ে শীলসন্তোষকেই আমি বরণ করেছি।'

মা গো, আমি রামরতনধন পেয়েছি। আমি তো রামরতনধনই পেয়েছি। এ ধন খরচ হয় না, চুরি যায় না, দিন-দিনই বেড়ে চলে। এ ধন জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, এত প্রকাণ্ড যে ধরণীও ধরে উঠতে পারে না। নামের তরীতে ভজনের প্রদীপ জেবলে বসেছি, হে কাণ্ডারী, হে নাগর গিরিধর, আমাকে ভবসাগর পার করে দাও।

রানা হরিচরণামৃত বলে বিষ পাঠালে মীরাকে। মীরা সে বিষ খেয়ে ফেলল। মীরার স্পর্শে সে বিষ অমৃত হয়ে গেছে।

হে প্রিয়, তুমি এ বন্ধন ছিঁড়তে পারো, আমি ছিঁড়ব না। তোমার প্রীতির ডোর ছেড়ে আর কার সংগে বাঁধব? আমার আর কে আছে? তুমি তরু আমি বিহংগ। তুমি সরোবর আমি মীন। আমি চকোর তুমি সুধাংশু। তুমি মুক্তো আমি সুতো। তুমি আমার সোনা আমি সোহাগা। হে ব্রজবাসী, মীরার প্রভু, তুমি ঠাকুর আমি তোমার দাসী।

বিয়ের দশবছরের মধ্যেই বিধবা হল মীরা। সবাই বললে কুলবধূর মতো অন্তঃপুরচারিণী হয়ে থাক। লজ্জাহীনার মতো পথে-বিপথে সাধুসংগ করে বেড়িও না। কে কার উপদেশ শোনে! সংসারবিষ পান করে হরিপ্রেমস্পর্শে অমৃতত্ব আস্বাদ করেছি, বল, কোথায় গেলে সে হরির দর্শন পাব? সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী সেজে মীরা চলল বৃন্দাবনে।

'তুম বিন সব জগ খারা।' তোমাকে ছাড়া সমস্ত জগৎ বিস্বাদ। আমার দুঃখ কে বোঝে বল? তোমার বিরহে শূলশয্যায় শুয়ে আছি, কি করে ঘুম আসে? তোমার শয্যা গগনমণ্ডলে, সেখানে তোমার সংগে কি করে মিলব? ব্যথিত যে সেই ব্যথা বোঝে আর বোঝে সে, যার জন্যে ব্যথা। রত্নের মূল্য বোঝে জহুরি আর বোঝে যে কেনে সেই রত্ন। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথায় সেই জ্বরহর? আমার শ্যামলসুন্দর যখন বৈদ্য হয়ে দেখা দেবে তখনই আমি শীতল হব।

ফাগুন যে শেষ হতে চলল, দিন চারেক আর বাকি। ওরে মন, হোলি খেলে নে। করতাল নেই পাখোয়াজ নেই, শুধু অনাহতের ঝঙ্কার উঠেছে, রোমে-রোমে অনুভব করছি সেই পুলকপ্রবেশ। প্রেমগীতির পিচকিরি করেছি, শীলসন্তোষের কেশর গুলেছি, গুলালের বাদলে অপার আনন্দ ঝরে পড়ছে। 'ঘটকে সব পট খোল দিয়ে হৈ, লোকলাজ সব ডার রে।' সমস্ত আবরণ খুলে দিয়েছি, জলাঞ্জলি দিয়েছি সব

লোকলজ্জা। ওরে মন, হোলি খেল, ঐ দেখ মনোহরের চরণকমল, প্রিয়তম ঘরে এসেছেন।
সখি, আমি তো প্রিয়তমের রঙে রঙিন। পাঁচ রঙে আমার চোলি রাঙিয়ে দে, এবার আমি ঝুরমুট খেলতে যাই। ঝুরমুট খেলায় পাব আমার প্রিয়তমকে, দেহের আবরণ ফেলে আমি মিলব তাঁর সঙ্গে। তখন আর কিছুই থাকবে না, চাঁদ যাবে সূর্য যাবে পৃথিবী আকাশ সব যাবে, থাকবে শুধু সেই অটল অবিনাশী। মনের প্রদীপে নিত্যস্মরণের শিখা জ্বালাও, প্রেমের হাট থেকে তেল আনো তাঁর জন্যে, সে দীপের নির্বাণ নেই। আমার বাস বাপের বাড়িতেও না, শ্বশুরবাড়িতেও না, সদগুরুর উপদেশই আমার আশ্রয়। অন্তরসখি, আমারও ঘর নেই তোরও ঘর নেই। শুধু হরির রঙেই রঙে আছি আমরা। হরিই আমাদের ঘরদোর।
বৃন্দাবনে এসে শ্রীরূপ গোস্বামীর দর্শন যাচ্ঞা করল। গোস্বামী বলে পাঠালেন, 'আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী, আমি প্রকৃতি সম্ভাষণ করি না।'
মীরা বলে পাঠাল, 'আমি জানতুম বৃন্দাবনে একমাত্র বৃন্দাবনচন্দ্রই পুরুষ আছেন। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ পুরুষ আছেন তা আমার জানা নেই।'
লজ্জা পেলেন গোস্বামী। বুঝলেন মীরার দিব্যদৃষ্টি কতদূর এসে পৌঁচেছে। দর্শন দিলেন মীরাকে।
নিন্দা কুৎসা নির্যাতন অত্যাচার কিছুই গ্রাহ্য করেনি মীরা। তোমার জন্যে সব ছাড়লাম তুমি আমাকে কি করে ছেড়ে থাকবে? দিনরাত্রি এই কান্নাই শুধু তার সম্বল। মেবার ছেড়ে বৃন্দাবনের দিকে যেদিন যাত্রা করে মীরা, সেইদিন থেকেই মেবারের দুর্দিনের সূচনা। মেবারবাসীরা বুঝল মীরাই মেবারের রাজলক্ষ্মী, যে করে হোক তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মীরা তখন দ্বারকায়। সেখানে মেবারদূত এসে তাকে মিনতি-বিনতি করতে লাগল। তুমি ফিরে চল। মেবারের দুরবস্থা দেখবে একবার সচক্ষে। তার রাজলক্ষ্মী আজ ধূলায় নির্বাসিতা।
রণছোড়জীর মন্দিরে গিয়ে ঢুকল মীরা। গান ধরল। 'সাজন, সুধ জ্যোঁ জানে ত্যোঁ লীজে হো।' হে প্রিয়তম, তুমি যদি আমাকে শুদ্ধ বলে জানো তবে তুমি আমাকে তুলে নাও। কৃপা করো, তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। অন্নে রুচি নেই চোখে নিদ্রা নেই, দিন নেই রাত নেই, পলে-পলে দেহ শুধু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। হে মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, এই যে মিলন তোমার সঙ্গে, এতে আর বিচ্ছেদ ঘটিও না।
গাইতে-গাইতে ঢলে পড়ল মীরা। রণছোড়জীর বিগ্রহে বিলীন হয়ে গেল।
ঠাকুর বললেন, 'সংসারীদের অনুরাগ ক্ষণিক, তপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে। একটা ফুল দেখে হয়তো বললে, আহা, কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি। ব্যস, হয়ে গেল।'
এতটুকুতে হবার নয়। দুর্দাম ব্যাকুল হও। বন্যার উলঙ্গ উন্মাদনা, আগুনের লেলিহান আনন্দ।
'ব্যাকুলতা চাই।' বললেন আবার ঠাকুর, 'ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

তিনি যেকালে জন্ম দিয়েছেন সেকালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাবা, আপনার মা, তাঁর উপর জোর খাটে। দাও পরিচয়। নয় গলায় এই ছুরি দিলাম।'
সারদামণির দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমিও যা আমিও তা। আমরা অভেদ। আমি যাব তুমি থাকবে।'
দুধে যেমন ধাবল্য অগ্নিতে যেমন দাহিকা পৃথিবীতে যেমন গন্ধ তেমনি আমিই তোমাতে ওতপ্রোত আছি। আমি অচ্যুতবীজরূপ আর তুমি সৃষ্টির আধারভূতা। সমতুল্য প্রকৃতি-পুরুষ। আমাদের অনশ্বর ঐক্য, শাশ্বত সাযুজ্য।
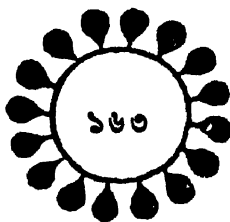
দুই শালতরুর মাঝখানে অমিতাভ বুদ্ধ শুয়েছেন বিশ্রামের জন্যে। আশ্চর্য। অকালবসন্তের উদয় হল বৃক্ষশাখে। অমিত পুষ্পভারে বৃক্ষশাখা নুয়ে পড়ল। নুয়ে পড়ল অমিতাভের শয়নমঞ্চের উপর। আকাশ হতেই ফুল ঝরে পড়তে লাগল। আকাশ থেকে গীতধ্বনি নেমে এল মাটিতে।
আনন্দকে উদ্দেশ করে বললেন তথাগত : 'আনন্দ দেখ, দেখ এখন ফুল ফোটবার সময় নয়, তবু গাছ ভরে অজস্র ফুল ফুটেছে। শুধু তাই নয় সে ফুল ঝরে পড়ছে আমার উপর। আকাশে সুর বাজছে মধুক্ষরা। দেবতারা বুদ্ধপূজা করছেন। তাই না?'
'তাই।' আনন্দ চোখ নত করল।
'কিন্তু আনন্দ, এই ভাবে বুদ্ধের সম্যক পূজা হয় না।' বললেন বুদ্ধদেব। 'সত্যে শ্রদ্ধাবান সকল নরনারী নিজের জীবনে ধর্মের যথাযথ শীলন ও পালন করলেই বুদ্ধের যথার্থ পূজা হয়। তাই তোমাকে বলি ধর্মানুসারে জীবন যাপন করবে। অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপারেও ধর্মের পবিত্র বিধি পালন করতে কুণ্ঠিত হবে না।'
আনন্দ কাঁদছে। পাছে তার কান্না দেখে ফেলেন, আনন্দ সরে পড়ল।
আমি এখনো লক্ষ্যে উপনীত হইনি। এর জন্যে আনন্দের কান্না। আমার কাম্যবস্তু পাইয়ে দেবার আগেই চলে যাচ্ছে কাম্যতম। জগজ্জ্যোতি যাত্রা করেছে নির্বাণে।
আনন্দকে ডেকে পাঠালেন বুদ্ধদেব। বললেন, 'আনন্দ, শোক কোরো না, হতাশ হয়ো না। ভেবে দেখ, শোকের বা নৈরাশ্যের কিই বা আছে! যা আমাদের প্রীতিকর

যা আমাদের ভালোবাসার বস্তু তার থেকে একদিন বিচ্ছিন্ন হবই। যা অচিরস্থায়ী তাকে হারিয়ে শোক কি? যা জাত, গঠিত, তা কি করে অবিনাশী হবে? তা ধ্বংসান্ত হতে বাধ্য।'
আনন্দ চোখ ফিরিয়ে নিল।
'আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল আমার সেবা করেছ, বিশ্বস্ত বন্ধুর মত থেকেছ আমার পাশে-পাশে, চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে তোমার আদর্শ থেকে এক তন্তু ভ্রষ্ট হওনি। এই তো যথার্থ পথ। এই পথ ধরে চলে যাওয়াতেই তো সিদ্ধি।'
যুগ্ম শালতরুর নিচে ভগবান বিশ্রাম করছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দলে-দলে বুদ্ধকে পূজা করবার জন্যে আসতে লাগল নরনারী।
নিশীথ রাত্রি। বুদ্ধদেবের কাছে এসে বসল আনন্দ। বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমার হয়তো মনে হবে, আমাদের শিক্ষা দিতে আর কেউ রইলেন না। কিন্তু তা মোটেই নয়। ধর্ম রইল, যে ধর্ম আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, এই ধর্মই তোমাকে পথ দেখাবে। এই ধর্মই তোমার একমাত্র শাস্তা।'
আবার বললেন, 'যা নির্মিত হয়েছে তা বিনষ্ট হবেই। তার জন্যে শোক করা বৃথা। আনন্দ, তুমি নিজেই নিজের আলোকবর্তিকা হও, নিজেতেই আশ্রয় গ্রহণ কর। অবিশ্রান্ত যত্ন করে নিজের মুক্তির পথ নিজে পরিষ্কৃত কর।'
নিজের খোঁজ নাও। চলো কৃত্রিমকে লঙ্ঘন করে সহজের মধ্যে। যারা বলে তিনি দূরে আছেন তারাই দূরে আছে। অনুভবের রসে মাতাল হও। অনুভবই অগম্যের বাণী।
আমি নিজেই নৌকা নিজেই মাঝি নিজেই নদী নিজেই কূল।
আত্মপূজা করছেন ঠাকুর।
ঠাকুরের সামনে পুষ্পপাত্রে ফুলচন্দন এনে রেখেছে। ঠাকুর উঠে বসেছেন শয্যায়। ফুলচন্দন দিয়ে নিজেকেই পুজো করছেন। সচন্দন ফুল কখনো রাখছেন মাথায় কখনো কণ্ঠে কখনো হৃদয়ে কখনো নাভিদেশে। ফুলের মালা নিজেই নিজের গলায় দোলালেন।
পূজা-অন্তে মনোমোহনকে নির্মাল্য দিলেন। মাস্টারমশাইকে একটি চাঁপা ফুল। আর সুরেন মিত্তির এলে তার গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।
আমি কাকে পূজা করি? আমার মাঝে মা আছেন সেই শুদ্ধবোধানন্দময়ী মাকে পূজা করি। সর্বকেন্দ্রস্বরূপিনী সুধাসিন্ধুনিবাসিনী মাকে।
তুলসী দত্ত, নির্মলানন্দ স্বামী, যখন প্রথম আসে দক্ষিণেশ্বরে, দেখল ঠাকুর নিজ সাধনস্থান পঞ্চবটীতে প্রণাম করে বসলেন নিচের সিঁড়িতে আর ভাবাবিষ্ট হয়ে জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কি যে কথা বোঝবার সাধ্য নেই তুলসীর, শুধু মাঝে-মাঝে কানে আসতে লাগল হৃদয়পরিপূর্ণ ধ্বনি, মা, মা!
বাগবাজারে তুলসীর বাড়ি। সে বাড়িরই এক অংশে গঙ্গাধর, অখণ্ডানন্দ স্বামী থাকে, সামনেই হরিনাথ বা তু[illegible] বাসা। তিনজনের গলায়-গলায় ভাব।
হরিনাথ আর গঙ্গাধর ঠাকুরকে প্রথম দেখে দীননাথ বসুর বাড়িতে, তুলসী দেখে

বলরাম বসুর বাড়িতে। হরিনাথরা শোনে কে একটা পাগল গান গাইছে, যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি, আর তুলসী দেখল কে একটা মাতাল টলতে-টলতে বৈঠকখানায় এসে ঢুকছে। চোখে চোখ পড়ল তুলসীর আর মুহূর্তে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা বিদ্যুৎকম্পন উঠে গেল।

যেন বার্তা পাঠালেন। যাস দক্ষিণেশ্বর। যাস একা-একা। যখন শুধু তোতে-আমাতে।

কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ঠাকুরের ভাষায়, জীবন্ত শিব। তুলসী যখন নিতান্ত বালক মা-বাবার সঙ্গে কাশী এসেছে। খেলবার জায়গা করেছে যেখানটায় মৌনী হয়ে অবস্থান করছেন ত্রৈলঙ্গ। এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে তুলসীও ত্রৈলঙ্গর শান্তিভঙ্গ করছে। একদিন খাপ্পা হয়ে সব শিশুগুলোকে তাড়িয়ে দিল, কিন্তু কি মনে করে তারই মধ্যে থেকে তুলসীকে ডাকল ইশারায়। কি জানি কেন তাকে একটু প্রসাদ খেতে দিল।

তুলসী বলে, দীক্ষা নানারকমের হয়, কখনো বা উদরের মাধ্যমে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছ থেকে আমি উদর-মাধ্যমে প্রথম দীক্ষা পেলুম।

কিন্তু এই দীক্ষা দৃষ্টির মাধ্যমে। যে হয় আপনজনা, সহজেই যায় যে চেনা।

একদিন দুপুরবেলা একা-একা গিয়েছে তুলসী। বলা-কওয়া নেই সটান ঢুকে পড়েছে ঠাকুরের ঘরের মধ্যে। কোনটা যে ঠাকুরের ঘর এও তার জানার কথা নয়। গিয়ে দেখল ঠাকুর খাচ্ছেন। বলা-কওয়া নেই, মেঝের উপর নিচু হয়ে ঢিপ করে প্রণাম করল। এই কি প্রণাম করবার ছিরি? খাবার সময় কেউ প্রণাম করে? কে জানে! নিয়মকানুন শিখলুম কোথায়!

খাওয়াশেষে ঠাকুর ঘাটে ডেকে নিয়ে গেলেন। মুখ-হাত ধুয়ে ঘাটে বসেই পান-তামাক খেতে লাগলেন। বললেন, 'জানিস, তোর মতন একটা ছেলে সেদিন এসেছিল আমার কাছে—'

'আমার মতন?'

'অবিকল তোর মতন। এমনি মুখ-চোখ, এমনি ছিরি-ছাঁদ। ধর্ না, 'তুইই এসে-ছিলি।'

'বা, আমি আসলুম কখন?'

'তা তুই কি করে জানবি। ধর্ ঘুমের মধ্যে চলে এসেছিলি।'

'এসে কি বললাম?'

'বললি, আমার মধ্যস্থ হতে পারবেন?'

'বা, আমি কার সঙ্গে ঝগড়া করলাম যে আপনাকে মধ্যস্থ হতে বলব!'

'ওরে ঝগড়ার মধ্যস্থ নয়, মিলনের মধ্যস্থ। বুঝতে পারছিস না?'

'না।'

'তুই এসে আমাকে বললি, আপনি আমাকে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবেন? তুই যদি ভাগ্যক্রমে এসে না মিলিস তবে তোকে মেলাব কি করে?' ঠাকুর তাঁর বাঁ হাতখানা রাখলেন তুলসীর কাঁধের উপর।

তুলসী চকিতে বুঝল ইনিই হচ্ছেন গুরু, মধ্যস্থ। পরে বুঝল, অনাদিমধ্যান্ত।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপং।
বরানগরের নারায়ণ শিরোমণি প্রকাণ্ড কথক। ঠাকুরকে দেখতে একবার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। বলছে, 'আমি দেশবিদেশ ঘুরে কত হরিনাম করে বেড়াই, কত গীতা-ভাগবতের কথা শোনাই, কত লোককে মাতিয়ে দি। শুনতে পাই আপনিও নাকি অনেক উপদেশ দেন, হরিগুণগান করে লোক মাতান। আমাতে-আপনাতে তফাত কতটুকু? শুনতে পাই আপনার নাকি খুব উচ্চ অবস্থা। বলতে পারেন সে অবস্থায় পেঁছুতে আমার কত দেরি?'
ঠাকুর একটু হাসলেন। বললেন, 'ওগো, বেশি দেরি নেই, বেশি তফাতও নেই—এই একটুকুন বাকি।' বলে আঙুলের একটি কড় দেখালেন। 'তুমি কি কম লোক গা? তোমার গুণের অবধি নেই। তুমি হরিকথা শুনিয়ে কত প্যালা পাও, আর আমার এখানে কারু প্যালা লাগে না। তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে কি আমার তুলনা হতে পারে? আমি মুখ্খু-সুখ্খু মানুষ, লেখাপড়ার ধার ধারি না, মা যা বলান তাই বলি। আর তোমার কত বিদ্যা কত মুখস্ত কত জ্ঞানগরিমা—'
আবার বললেন, 'মাকে বলি, মা, মুখ্খুর মত গাল নেই। তুই আমার এই গালটা ঘুচিয়ে দে। কিন্তু মা আমার কথায় কানও দেয় না।'
যোগীনকে ডাকলেন ঠাকুর। 'যোগীন, পাঁজিখানা নিয়ে আয় তো।'
যোগীন পাঁজি নিয়ে এল।
'পঁচিশে শ্রাবণ থেকে প্রতিদিনের তিথি-নক্ষত্র সব পড়ে শোনা তো।'
যোগীন পড়তে লাগল। পঁচিশে, ছাব্বিশে, পড়তে লাগল পর-পর। পড়তে-পড়তে এল শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে। একত্রিশে শ্রাবণ।
'রাখ্, আর পড়তে হবে না।' ইঙ্গিতে পঞ্জিকা রেখে দিতে বললেন।
'কেন?' যোগীনের কণ্ঠ উদ্বেগভারাতুর।
'বেশ রাত্রি, বেশ তিথি। ঝুলনপূর্ণিমা।'
নরেনকে ডাকলেন। শশী ছিল দাঁড়িয়ে, তাকে বললেন, নিচে যা। কেউ যেন না থাকে ধারে-কাছে। শুধু আমি আর নরেন।
ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। নরেনকে বললেন, 'চারদিকে ভালো করে দেখে আয় উঁকি দিয়ে, কেউ যেন না উপরে আসে।'
নরেন দেখে এল। বললে, কেউ নেই।
'বোস আমার কাছটিতে।'
শান্ত হয়ে তন্ময় হয়ে পিপাসু হয়ে বসল নরেন।
আরেকদিনের কথা মনে পড়ল নরেনের। বলছে মাস্টারমশাইকে, 'আমাকে একদিন একলা একটি কথা বললেন। কাউকে বলবেন না যেন সে কথা।'
'না। কি বললেন?'
'বললেন আমার তো সিদ্ধাই করবার যো নেই। তোর ভিতর দিয়ে করব।'
'তুমি কি বললে?'

'আমি তাঁকে এক-কথায় হটিয়ে দিলুম। বললুম, না, তা হবে না। তিনি চুপ করে গেলেন।' স্বগতোক্তির মত বলছে নরেন, 'ওঁকে মানতুম না, ধরতুম না, ওঁর সব কথা উড়িয়ে দিতুম। তিনি বলতেন, ওরে, আমি কুঠির উপর থেকে চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে কে কোথায় আছিস তোরা আয়, তোদের না দেখে যে আর থাকতে পারি না। মা বলে দিলেন ভক্তেরা সব আসবে। ঠিক-ঠিক মিলল। তোরা সব এলি একে-একে।'

কত আপনার জন, চক্ষুর চক্ষু শ্রোত্রের শ্রোত্র প্রাণের প্রাণ, এমনি ঘনতম অন্তরঙ্গতায় বসেছে নরেন। দয়াঘন স্নেহপরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন ঠাকুর।

সেই মধুরভাবের পাগলিনী, যাকে দেখে ঠাকুরের ভয়, তারও প্রতি ঠাকুরের কি করুণা!

থেকে-থেকে চলে আসে ফটক খুলে। কারুর নিষেধ-বাধা মানে না একেবারে সোজা দোতলায় উঠে আসে। এসেই মায়ের গান ধরে। কি মিষ্টি গলা! গান শুনেই ঠাকুরের সমাধি হয়ে যায়।

আমার সন্তানভাব। মধুরভাবের পসারিণীকে আমার এখন বড় ভয়।

'ওরে পাগলীকে বাগান থেকে বের করে দে। ওকে এখানে আসতে দিস না।'

নিরঞ্জন লাঠি নিয়ে তাড়া করে তবু সরে না পাগলী। কালীপ্রসাদ তো একদিন হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে থানায়ই রেখে এল। আবার কখন থানা থেকে সরে পড়ে চলে এসেছে বাগানে। আবার গান ধরেছে। গান শুনে ঠাকুরের আবার ভাবাবেশ। এবার আর তাড়া নয়, এবার রীতিমত প্রহার।

তবুও নিবৃত্তি নেই। দিগম্বর বালক হয়ে ভক্তসঙ্গে বসে আছেন ঠাকুর, পাগলীর সাড়া পাওয়া গেল বাইরে। শশী বলল, 'উপরে উঠলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব।'

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না, না, আসবে আবার চলে যাবে।'

'না, আসবে না।' নিরঞ্জন হুমকে উঠল।

রাখাল দুঃখ করতে লাগল, পাগলের উপর আবার আস্ফালন!

'তোর মাগ আছে কিনা তাই তোর মন কেমন করে।' নিরঞ্জন গর্জে উঠল, 'আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।'

'কি বাহাদুরি!' রাখালও পাল্টা বললে, 'কিন্তু জিগগেস করি ঠাকুর কি শুধু তোর-আমার? শুধু এই ঘরের লোকদের? বাইরের লোকদের নন? তিনি কি শুধু আমাদের এই কয়জনের জন্যেই এসেছেন? আপামর সকলের জন্যে আসেননি? উনি কি শুধু সদগুরু? উনি জগৎগুরু। সদগুরুই জগদগুরু। উনি সকলের। পাগলেরও।'

'তাই বলে অসুখের সময় কেন?' শশী প্রতিবাদ করল : 'উপদ্রব করে কেন?'

'উপদ্রব সবাই করে। আমরা করিনি? গিরিশ ঘোষ করেনি? নরেন-টরেন আগে কি রকম ছিল, কত যন্ত্রণা দিত, কত তর্ক করত। কষ্ট কি আমরাই কিছু কম দিয়েছি? ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে। বলেনি? ধরতে গেলে কেউই নির্দোষ নয় নিরুপদ্রব নয়।'

ঠাকুর বললেন, 'রাখাল, কিছু খাবি?' রাখালের প্রতি তাঁর স্নেহ উচ্চারিত হয়ে উঠল।
রাখাল বললে, 'খাবোখন।'
পাগলী সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। আজ আর কোনো উপদ্রব করল না। শুধু প্রণাম করে চলে গেল।
কিন্তু ঠাণ্ডা থাকবার পাত্র নয় পাগলী। আবার হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছে। আবার গান জুড়েছে। আবার ভাবাবেশে ঠাকুরকে ক্লিষ্ট করা।
এখন শুধু মন নিচে নামিয়ে রাখবার প্রয়োজন।
নরেনকে একদিন বলেছিলেন, 'আচ্ছা, তোর কি মনে হয়? এখানে সব আছে না? নাগাদ মুশুর ডাল, ছোলার ডাল তেঁতুল পর্যন্ত।'
নরেন বললে, 'সব আছে, আপনি সব অবস্থা ভোগ করে নিচে এসে রয়েছেন।'
'সব অবস্থা ভোগ করে ভক্তের অবস্থায়।' মাস্টারমশাই বললে।
'কে যেন নিচে টেনে রেখেছে।' বললেন ঠাকুর।
পাগলীকে নিরঞ্জন একদিন একটা খালি ঘরে বন্ধ করে রাখল। যদি এমনিতরো শাস্তিতে শিক্ষা হয়। কতক্ষণ পরে দরজা খুলে দিতেই আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে। আবার সেই গান।
তখন নিরঞ্জন কাঁচি দিয়ে পাগলীর মাথার চুলগুলি কেটে দিল। তারপর পাগলী আর এল না।
নিরঞ্জনের যা কিছু করা তার মূলে গুরুসেবা।
'দেখ না নিরঞ্জনকে।' বলছেন ঠাকুর, 'কিছুতেই লিপ্ত নয়, নিজের টাকা দিয়ে গরিবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিয়ের কথায় বলে, বাপরে, ও বিশালাক্ষীর দ। নিরঞ্জনকে দেখি, একটা জ্যোতির উপর বসে আছে।'
আহা এই তো চাই! কোনো লেনা-দেনা নেই। যখন ডাক পড়বে তখনই যেতে পারবে।
'লোক বাছা যা বলছ তা ঠিক।' মাস্টারকে বলছেন ঠাকুর, 'এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে কেমন আছেন মশাই জিগগেস করে তারা বহিরঙ্গ।'
নীলকণ্ঠের গানেই বা কত মধু কত ভক্তি। কৃষ্ণলীলায় বৃন্দাবনদূতী সেজে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় সকলকে। হাটখোলায় বারওয়ারিতলায় শ্রীকৃষ্ণ যাত্রাগান করবে, ঠাকুর বালকের মত মেতে উঠলেন তিনি যাবেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আয়। লাটু আর কালী, চল আমার সঙ্গে।
লোকে লোকারণ্য ভিড়। ভিতরে ঢোকেন এমন সাধ্য নেই। সুতরাং স্বয়ং নীলকণ্ঠকে ধরো। খবর পৌঁছল তার কাছে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব এসেছেন। শোনামাত্র গান থামাল নীলকণ্ঠ। নিজে গিয়ে ভিড় সরিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে এল আসরে।

শ্রীরাধার প্রেমে মত্ত হয়ে গান ধরল নীলকণ্ঠ : 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে।' ঠাকুর নিজের থেকে আখর দিতে শুরু করলেন। গান ভীষণ জমে উঠল। কতক্ষণ পরে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে সমাধিস্থ দেখে নীলকণ্ঠ বারে-বারে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে লাগল। সমাধি ভাঙবার পর আবার চুপ করে বসে গান শুনতে লাগলেন। গানে আর শোভায় সারা বারওয়ারিতলা গমগম করতে লাগল।

সেই নীলকণ্ঠ আবার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুরকে বলছে, 'আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ।'

'ওগুলো কি বলছ? আমি সকলের দাসের দাস। গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউয়ের কখনো গঙ্গা হয়?'

'যাই আপনি বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি।'

'বাপু হে, আমার আমিই তো খুঁজে ফিরছি, কিন্তু পাই কই?'

'আমরা কি অতশত বুঝি?' নীলকণ্ঠ হাত জোড় করল : 'আমাদের শুধু কৃপা করবেন।'

'কি বল! তুমি কত লোককে পার করছ, তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে!'

'পার করছি বলছেন?' নীলকণ্ঠ হাসল। 'কিন্তু আশীর্বাদ করুন যেন নিজে না ডুবি!'

'যদি ডোবো তো, ঐ সুধা-হ্রদে।' বললেন ঠাকুর। 'তোমার এখানে আসা, যাকে অনেক কিনা সাধ্যসাধনা করে তবে পাওয়া যায়। বেশ, তবে একটা তুমি গান শোনো।' বলে গান ধরলেন ঠাকুর। গান শেষ করে বললেন, 'আমার ভারি হাসি পাচ্ছে। ভাবছি তোমাদের আবার গান শোনাচ্ছি।'

'আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই তার আজ পুরস্কার হল।' ঠাকুরকে আবার প্রণাম করল নীলকণ্ঠ।

নরেন একবার বলেছিল ঠাকুরকে, 'আমি শান্তি চাই, ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না।'

আহা, ঈশ্বরই তো শান্তি।

ঠাকুরের পাশটিতে বসে সেই শান্তিই যেন আস্বাদ করছে নরেন।

নরেন তাকিয়ে আছে ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের নিষ্পলক দৃষ্টি। সর্বসংশয়চ্ছেদী অভয় আশ্বাসে পরিপূর্ণ। চেয়ে থাকতে-থাকতে নরেনের মনে হল কি একটা আশ্চর্য স্পন্দন তার সমস্ত দেহে আলোড়িত হচ্ছে। মনে হল ঐ দুটি পুণ্যচক্ষুর আভা ছাড়া সংসারে আর তার কোনো অনুভূতি নেই।

হঠাৎ চমক ভাঙল নরেনের। দেখল ঠাকুর কাঁদছেন।

'এ কি, কাঁদছেন কেন?'

'নরেন, আমার যা কিছু ছিল, আমার যথাসর্বস্ব, তোকে আজ দিয়ে দিলুম।' নরেনের একটা হাত ঠাকুরের একখানি হাতের মধ্যে ধরা : 'দিয়ে আমি আজ ফকির হয়ে গেলুম, ফতুর হয়ে গেলুম। তুই রাজরাজেশ্বর হয়ে গেলি।'

নরেন অনুভব করল এ কান্না আনন্দের নির্ঝর। এ কান্না তার রাজাভিষেকের পুণ্য-বারি।
নরেনও কাঁদতে লাগল।
ঠাকুর বললেন, 'তুই সবাইকে আঁকড়ে থাকবি, সকলের আশ্রয় হবি। সকলের ভার তোর হাতে দিয়ে গেলুম। তারপর তোর যখন কাজ ফুরুবে, যখন একদিন বুঝতে পারবি তুই সত্যি কে, ফিরে যাবি স্বধামে।'
নরেন গুরুবলে বলীয়ান হয়ে উঠল। অয়মহং ভোঃ। ওঠো জাগো, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈপ্সিততমকে অর্জন করতে পারছ ততক্ষণ নিবৃত্ত হয়ো না।
ঠাকুর বললেন, তিনিই সব হয়েছেন। কেন? সবই আবার তিনি হবে বলে। তুই এই হওয়ার বার্তাটি পেঁাছে দে ঘরে-ঘরে। পেঁাছে দে জনে-জনে।
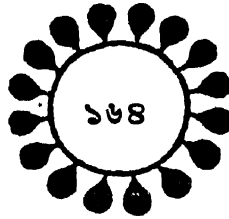
'আমরা গোরার সঙ্গে থেকেও তার ভাব বুঝতে নারলাম রে।' চৈতন্যলীলায়ও এ আক্ষেপ করেছিল পার্ষদরা, এবারও বুঝি সেই মনস্তাপ। ঠাকুর তাই ঠিক করলেন, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাবেন।
'এখানকার যা কিছু সব নজির স্বরূপ।' বললেন ঠাকুর।
কিসের নজির?
জীবমাত্রেই ব্রহ্মের প্রতিভাস। তুমিও তাই 'তদগতান্তরাত্মা' হয়ে ওঠো। ঈশ্বর-লাভের জন্যেই মানবজীবন। তাই এখানে দেখ সেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। 'আমি ষোলো টাং করে গেলাম যদি তোরা এক টাং করিস।' যদি ষোলো দেখে অন্তত এক হতে চাস। যদি মহৎকে দেখে অণু হবারও প্রেরণা জাগে।
'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ!' নরবপু যে তাঁর স্বরূপ এটুকু অন্তত বুঝে যাও। একই অগ্নি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে রূপে-রূপে রূপায়িত প্রাণে-প্রাণে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। ঠাকুর বললেন, 'নরলীলায় মন কুড়িয়ে আনলেই হয়ে গেল। আরশুলা কুমরে পোকা হয়ে গেলেই হয়ে গেল।' সেই মহত্তম পরমতম হয়ে-ওঠাকে দেখ। 'নরলীলা কেমন জানো?' আবার বললেন ঠাকুর : 'যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড়-হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ—তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে, নলের ভিতর দিয়ে আসছে।'

তুমি আমি হয়ে ওঠ। অর্জুনকে তাই তো বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'মদভাবমাগত' হও।
'সকলের চেয়ে গুহ্যতম পরমকথা এবার শোনো।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, 'তুমি আমার প্রিয় হতে প্রিয়তর তাই তোমাকে বলছি এ গোপন কথা। সব ভুলে আমাকে ভাবো, আমার দিকে চোখ ফেরাও, আমাগতপ্রাণ হয়ে ওঠ। তুমি আমার প্রিয় তাই প্রতিজ্ঞা করে তোমাকে বলছি, তোমাকে আমি হয়ে উঠতেই হবে। বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ। অনেকে শুধু আমার হাত ধরে আমা-সম হয়ে উঠেছে।'
অরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বললেন, এই সুবিশাল বটবৃক্ষ দেখছ, এর থেকে একটি ফল আহরণ কর।
বটফল আহরণ করল শ্বেতকেতু।
'ভাঙো।'
ভাঙল বটফল।
'কি দেখছ?'
'ছোট-ছোট বীজকণা।'
'একটি কণাকে ভাঙো। আরো ভাঙো। কি দেখছ?'
'এখন আর কিছুই দেখছি না।'
'যা এখন আর দেখছ না সেই সূক্ষ্মাংশ থেকেই উৎপন্ন হয়ে এই মহাবল বটবৃক্ষ বিদ্যমান আছে।' অরুণি বললেন, 'বৎস, শ্রদ্ধান্বিত হও। শ্রদ্ধা না থাকলে এই তত্ত্ব বুদ্ধির অগম্য।'
'কিন্তু সত্যই যদি জগতের মূল হয় তবে তা প্রত্যক্ষ হয় না কেন?' জিগগেস করল শ্বেতকেতু।
অরুণি বললেন, 'এই নুন নাও, জলে ফেলে দিয়ে এস। কাল প্রাতঃকালে দেখা কোরো।'
প্রভাতে দেখা করতে এল শ্বেতকেতু। অরুণি বললেন, 'বৎস, রাত্রে যে নুন জলে ঢেলে দিয়েছিলে সেই নুন নিয়ে এস।'
অনেক অনুসন্ধান করেও সে নুন পাওয়া গেল না। যদিও সে নুন বিলীনরূপে বিদ্যমান। জলপাত্র নিয়ে উপস্থিত হল শ্বেতকেতু।
অরুণি বললেন, 'বৎস, এই জলের উপরিভাগ থেকে আচমন করো। কেমন বোধ হচ্ছে?'
'লবণাক্ত।'
'মধ্যভাগ থেকে আচমন করো। কেমন বোধ হচ্ছে?'
'লবণাক্ত।'
'অধোভাগ থেকে আচমন করো। কেমন বোধ হচ্ছে?'
'লবণাক্ত।'
'এবার জল ফেলে দিয়ে আমার কাছে বোস।'
বসল শ্বেতকেতু। অরুণি বললেন, 'শোনো, ঐ লবণ জলের মধ্যেই সর্বদা বিদ্যমান

ছিল। এই জলের মধ্যে বিদ্যমান থেকেও যেমন তুমি লবণকে দেখতে পাওনি তেমনি এই দেহমধ্যেই সেই সত্য সেই ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান আছেন।'

আগে নুন যখন হাতে করে নিয়ে এসেছিলে তখন তাকে স্পর্শ করে জেনেছিলে চোখ দিয়ে দেখেছিলে। কিন্তু যেই জলে মিশে গেল অমনি চক্ষু আর স্পর্শের বাইরে চলে গেল। তখন সেই নুনকে জানবে কি করে? সেই জানার উপায়ান্তর আছে। সেই উপায়ান্তর হচ্ছে জিহ্বা। তখন তুমি জিহ্বা দিয়ে জানবে এই সেই নুন।

তেমনি জগতের মূল সৎব্রহ্ম এই দেহে বিদ্যমান থাকলেও ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য। কিন্তু তাকেও জানবার উপায়ান্তর আছে।

আছে? কি সেই উপায়ান্তর?

অরুণি বললেন, 'যদি কাউকে চোখ বেঁধে গান্ধারদেশ থেকে নিয়ে এসে তারও চেয়ে নির্জন জায়গায় এনে ছেড়ে দেয় তার কি দশা হয়? সে দিগভ্রান্ত হয়ে কখনো পূবে কখনো উত্তরে কখনো দক্ষিণে কখনো বা পশ্চিমে ছুটোছুটি করতে থাকে। আর এই বলে আর্তনাদ করে, আমাকে চোখ বেঁধে নিয়ে এসেছে আর, দেখ, বন্ধ-চক্ষু অবস্থাতেই ফেলে গেছে এখানে। তখন কেউ যদি তার বন্ধন মোচন করে দিয়ে বলে, এই দিকে গান্ধারদেশ এই দিকে যাও, তখন সেই আলোকপ্রাপ্ত উপদেশ-প্রাপ্ত লোক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের কথা জিগগেস করতে-করতে সেই গান্ধারদেশে এসেই উপস্থিত হয়। তেমনি সংসারপ্রবিষ্ট ব্যক্তি, আচার্যবান পুরুষ গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।'

অবতারই সেই মানুষরতন। যিনি তরণ করে তারণ করেন।

'অবতারের ভিতরই ঈশ্বরের শক্তির বেশি প্রকাশ।' বললেন ঠাকুর, 'অবতারের আমির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়।'

কে একজন ভক্ত বললে, 'আজ্ঞে, আপনাকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা।'

'ও কথা আর বোলো না।' বলে উঠলেন ঠাকুর, 'গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা নয়। আমি এত বড় লোক, আমি অমুক, আমি শম্ভু মল্লিক বা আমি মহিম চক্রবর্তী, আমি ধনী আমি বিদ্বান এই আমি ত্যাগ করতে হবে। আমি-ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফেল।'

সেইবার ঠাকুরের যখন হাত ভাঙা, হাতে বাড়-বাঁধা, উত্তরগীতা পড়ে শোনাচ্ছে মহিমাচরণ। 'ব্রাহ্মণদের দেবতা অগ্নি, মুনিদের দেবতা হৃৎস্থ অর্থাৎ হৃদয়মধ্যে, স্বল্পবুদ্ধি মানুষের দেবতা প্রতিমায় আর সমদর্শী মহাযোগীদের দেবতা সর্বত্র।' 'প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্বত্র সমদর্শিনাম। সর্বত্র সমদর্শিনাং'—কথা কয়টি শোনা-মাত্র ঠাকুর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। হাতে সেই বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ভক্তেরা নির্নিমেষে দেখছে সমদর্শী মহাযোগীকে।

আকীটপতঙ্গপিপীলক ব্রহ্ম। সকলেই তাঁর অবতার। 'তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।' পর ও অবর, উৎকৃষ্টে ও অপকৃষ্টে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করো। সেই দর্শনেই হৃদয়বন্ধন ভিন্ন, সংশয়জাল ছিন্ন ও কর্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত। 'মোমের বাগানে সবই মোম।'

চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছেন ঠাকুর। সিংহদর্শন করেই ঠাকুর সমাধিস্থ।
'ঈশ্বরীর বাহনকে দেখেই ঈশ্বরের উদ্দীপন হল।' বললেন ঠাকুর।
আবার বললেন, 'আমি একবার মিউজিয়মেও গিয়েছিলুম। দেখলুম ইট পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখ, সঙ্গের গুণ কি। তাই সর্বদা যদি সাধুসঙ্গ কর সাধু হয়ে যাবে।'
উপনিষদের ভাষায় ঐটিই উপায়ান্তর।
'নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে, ভবনদী পার হতে জানা দরকার।' বললেন ঠাকুর।
নৌকো করে কজন গঙ্গা পার হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল পণ্ডিত, সর্বদা বিদ্যা জাহির করতে ব্যস্ত। পাশের লোককে জিগগেস করল, বেদান্ত জানো? সে বললে, আজ্ঞে না। সাংখ্য-পাতঞ্জল জানো? আজ্ঞে না। ষড়দর্শন? তাও না। এমন সময় ঝড় উঠল নদীতে। নৌকো প্রায় ডোবে। তখন পাশের লোকটি ভীতত্রস্ত পণ্ডিতকে জিগগেস করলে, 'পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত মুখ কাঁচু-মাচু করে বললে, না। পাশের লোকটি বললে, 'পণ্ডিতজী, আমি সাংখ্য-পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি।'
স্টার-থিয়েটারে 'বৃষকেতু' অভিনয় দেখছেন ঠাকুর। গিরিশকে শুধোলেন, 'এ কার থিয়েটার? তোমার, না, তোমাদের?'
গিরিশ বললে, 'আজ্ঞে আমাদের।'
'আমাদের কথাটিই ভালো, আমার বলা ভালো নয়। কেউ-কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি, নিজেই করেছি।' বলছেন ঠাকুর, 'এ সব হীনবুদ্ধি অহঙ্কেরে লোকের কথা।'
নরেন বললে, 'সবই থিয়েটার।'
'হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক কথা।' বললেন ঠাকুর, 'তবে কোথাও বিদ্যার খেলা কোথাও অবিদ্যার।'
নরেন জোর গলায় বললে, 'সবই বিদ্যার।'
'হ্যাঁ, তবে ওটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়। ভক্তের কাছে দুই আছে, বিদ্যামায়া আর অবিদ্যা-মায়া। খোসাটি আছে বলেই আমটি আছে। মায়া হচ্ছে খোসা, আম হচ্ছে ব্রহ্ম। মায়ারূপ ছালটা আছে বলেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব।'
নরেনের হঠাৎ মনে হল, এখন যদি প্রকাশ করে বলেন, বলতে পারেন, তাহলে বুঝি। তবেই বিশ্বাস করি।
কি বলবেন? কি শুনতে চাস?
অনেক সময় বলেন তিনিই সেই, ছদ্মবেশে রাজ্যভ্রমণে এসেছেন। তিনিই ভগবানের অবতার, তিনিই পুরুষোত্তম। এখন সে কথা কি তিনি ঘোষণা করতে পারেন? এই অসহন রোগক্লেশের মধ্যে, এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে? বলতে পারেন, তিনিই আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, সমস্ত বিশ্বের নিলয়-নিধান? বলতে পারেন তিনিই বেত্তা তিনিই বেদ্য তিনিই সেই অব্যয় অক্ষর? বলতে পারেন, তিনিই ভগবান?
'এখনো তোর জ্ঞান হল না?' নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে কমলবিশদ প্রসন্ন চোখ

মেলে ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে। বললেন : 'এখনো তোর সংশয়? সত্যি-সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।'
থমকে দাঁড়াল নরেন। অপরাধের গ্লানিতে দুই চোখ জলে ভরে উঠল। ভুবনমঙ্গল স্বরূপানন্দ ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল অপলকে। তোমার চরণে শাশ্বতী স্থিতি দাও। বৈরাগ্যবলসম্পন্ন জ্ঞান দাও। ভবপ্রদা গূহাসক্তি ছেদন কর।
এই অসুখ হবার প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে শ্রীমাকে একদিন বলেছিলেন ঠাকুর, 'যখন দেখবে যার-তার হাতে খাচ্ছি, কলকাতায় রাত কাটাচ্ছি আর খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকিটা নিজে খাচ্ছি, তখনই বুঝবে দেহরক্ষার আর বাকি নেই।'
কত দিন থেকেই তো কলকাতায় নানা ভক্তের বাড়িতে অন্ন ছাড়া অন্য ভোজ্য খাচ্ছেন, বলরামের বাড়িতে তো অন্নই খেয়েছেন রীতিমতো, আর রাতও কাটিয়েছেন মাঝে-মাঝে। তবে দিন কি ঘনিয়ে এল? তবু খাবারের অগ্রভাগ তো এখনো কাউকে দেননি।
কিন্তু সেবার কি হল? নরেনের পেট খারাপ হয়েছে, কদিন আসছে না দক্ষিণেশ্বর। কেন আসছে না রে? দক্ষিণেশ্বরে তার উপযুক্ত পথ্য হবে না। কিন্তু বল গে, আমি তাকে ডেকেছি। সকালবেলা তার কাছে লোক পাঠালেন ঠাকুর। নরেনকে আসতে হল। ঠাকুরের নিজের জন্যে ঝোলভাত তৈরি হয়েছে তারই অগ্রভাগ নরেনকে খেতে দিলেন। বললেন, 'যা বাকি আছে তাই আমার জন্যে নিয়ে এস।'
সারদামণি বুকের মধ্যে ধাক্কা খেলেন। বললেন, 'না, না, আমি তোমাকে ফের নতুন করে রেঁধে দিচ্ছি।'
কিন্তু ঠাকুর শোনবার পাত্র নন। বললেন, 'নরেনকে দিয়ে খাব তাতে দোষ কি! নিয়ে এস যা আছে।'
ঠাকুর কি বলেছিলেন তা যেন মন থেকে মুছে দিতে চাইলেন শ্রীমা। ভাবলেন নরেনের সঙ্গে কার কথা! নরেন যেন সব কিছুর ব্যতিক্রম।
কিন্তু আজ, ১২৯৩ সালের শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন মা এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন? ঠাকুরের মহা-সমাধির দিন কি তবে সমুপস্থিত?
একখানি দিশি শাড়ি শুকোতে দিয়েছিলেন ছাদে, খুঁজে পেলেন না। জলের কুঁজোটা তোলবার সময় হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সেবক-সন্তানদের জন্যে খিচুড়ি রাঁধছেন, তলাটা ধরে গেল।
সারাদিনই ভাববিভোর হয়ে আছেন। ঘন-ঘন সমাধি হচ্ছে। কিছুই খাওয়ানো যাচ্ছে না।
অতুলের নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসা করতেন ঠাকুর। সে এসে নাড়ী দেখল। মুখ অন্ধকার করে বললে, 'আলো নিভতে আর দেরি নেই।'
বিকেলের দিকে অবস্থা আরো খারাপ হল। শ্বাসক্লেশ দেখা দিল। ডাক্তার আর কি করবে, তবু শশী ছুটল ডাক্তারের সন্ধানে। যে ডাক্তার দেখছিল শেষদিকে তার বাড়ি এখান থেকে সাত মাইল। সাত মাইল পথ প্রায় এক নিশ্বাসে পার করে দিল

শশী। ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসল, ডাক্তার বাড়ি নেই। কোথায়, কত দূর যেতে পারে? কি করে বলব, দেখুন এদিক-সেদিক। এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। আরো এক মাইল ছুটে ধরল ডাক্তারকে। চলুন শিগগির কাশীপুর। ডাক্তার বললে, জরুরি কল আছে অন্যত্র। এর চেয়েও জরুরি? ডাক্তারের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

দেখে-শুনে ডাক্তার বললে, যেমন বলে, ভয় নেই।

সন্ধ্যের দিকে চোখ খুললেন ঠাকুর। নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সারাদিন দেবতাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। আমি এখন খাব। ভারি খিদে পেয়েছে।'

সারাদিন কিছু মুখে তোলেননি, সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিছু তরল পথ্য নিয়ে এল। কিন্তু গিলতে পারলেন না। অগত্যা জল দিয়ে মুখ মুছে দিল আস্তে-আস্তে। পায়ের নিচে দিল কটা বালিশ গুঁজে। হে আত্মারাম, কি আরাম তোমাকে আমরা দিতে পারি?

হরি ওঁ তৎসৎ—মুখে উচ্চারণ করে ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়লেন।

মধ্যরাত্রের দিকে আবার সমাধি হল ঠাকুরের। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল। পাখা করছিল শশী, তার মনে হল এ সমাধি যেন অন্যরকম। শিশুর মত কাঁদতে লাগল ফুলে-ফুলে।

গিরিশ আর রামকে খবর পাঠাও।

কোনো ভয় নেই, এস, হরি ওঁ তৎসৎ কীর্তন করি। নরেন ডাকল সবাইকে। ঠাকুরকে ঘিরে বসল। শোকগদগদ কণ্ঠে কীর্তন শুরু হল, হরি ওঁ তৎসৎ।

রাত প্রায় একটার সময় ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। স্পষ্ট, সুস্থস্বরে বললেন, 'আমি খাব। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

সবাই আনন্দচকিত হয়ে উঠল। কি খাবেন?

'ভাতের পায়েস খাব।'

ভাতের পায়েস আনা হল। ঠাকুর বললেন, 'বসে খাব।'

যে শয্যাবিলীন দুর্বল সে কিনা উঠে বসতে চায়। ছেলেরা ধরাধরি করে সন্তর্পণে ঠাকুরকে বসিয়ে দিল বিছানায়।

শশী খাওয়াতে লাগল ভাতের পায়েস।

আশ্চর্য, স্বাভাবিক অনায়াসে খেতে লাগলেন। গলায় যেন ঘা নেই যন্ত্রণা নেই। বললেন, এত খিদে যে ইচ্ছে হচ্ছে হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ি খাই।

সবাই অবাক হয়ে গেল। কেন এই খিচুড়ি খাবার ইচ্ছে?

শ্রীমা সকালে যে খিচুড়ি রেঁধেছিলেন তিনি কি তার গন্ধ পেয়েছেন? আরো কি টের পেয়েছেন তলাটা ধরে গিয়েছিল তার? উপরের ভালো অংশ সন্তানদের দিয়ে নিচেকার সেই পোড়াঝোরা নিজে খেয়েছেন শ্রীমা?

না কি আর সব অবতারের যেমন বিশেষ প্রিয় ভোজ্য থাকে, ঠাকুরের তেমনি খিচুড়ি! রঘুনাথের প্রিয় ভোজ্য রাজভোগ, বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রিয় ভোজ্য ক্ষীর-সর, বুদ্ধদেবের

প্রিয় ভোজ্য ফাণিত বা ফেণী বাতাসা। তেমনি নবদ্বীপচন্দ্রের মালসাভোগ, শঙ্কর-পন্থীদের পুরি-নাড়ু আর রামকৃষ্ণের খেচরান্ন।

খেয়ে খানিক সুস্থ বোধ করলেন। নরেন বললে, এবার তবে একটু ঘুমুন।

কালী, কালী, কালী—স্বচ্ছ স্পষ্টকণ্ঠে তিনবার উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। জগজ্জনকে বরাভয় দেবার ইচ্ছায় দু-হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিলেন। ধীরে-ধীরে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

রাত তখন একটা বেজে গেছে, ঠাকুরের সর্বদেহ কাঁপল দু-একবার, গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি নাসাগ্রভাগে এসে স্থির হল। মুখের উপর ভেসে উঠল অম্লান আনন্দজ্যোতি।

এই সমাধি বুঝি আর ভাঙে না।

হরি ওঁ, হরি ওঁ, আবার সবাই কীর্তন শুরু করল। বিগতমেঘ আকাশের মত এই বুঝি আবার চক্ষু উন্মীলন করবেন। কতবার গভীর সমাধি থেকে উঠে এসেছেন, এবারও উঠবেন বোধ হয়।

দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুঘরে রকে বসিয়ে ঠাকুরের একবার ফোটো তোলা হয়েছিল। তাঁর যে পদ্মাসনস্থ ধ্যানমূর্তি, যে মূর্তি ঘরে-ঘরে পটে-পটে বিরাজমান সেই ফোটো। ফোটো তোলাতে বসে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যান। ফোটো তোলা শেষ হয়ে যাবার পরেও সমাধি ভাঙে না। ফোটোওয়ালা ভয় পেয়ে যন্ত্রপাতি ফেলে চম্পট দেয়। তারপর সমাধি ভাঙলে পরে ঠাকুর বললেন, 'দেখবি কালে ঘরে-ঘরে এই ছবিরই পুজো হবে।' সে ছবি পরে তাঁকে দেখানো হলে তিনি তাকে প্রণাম করলেন, পুজো করলেন।

এই বুঝি জাগেন, এই বুঝি ওঠেন, সর্বক্ষণ সকলের মনে এই ঔৎসুক্য।

বুড়ো গোপালকে ডাকাল নরেন। বললে, 'একবার রামলালকে ডেকে আনতে পারো?'

লাটুকে নিয়ে বুড়ো গোপাল চলল দক্ষিণেশ্বর।

আকাশের পূর্ণ চাঁদ লাল হয়ে উঠল। ক্রমে হলদে হল। শেষে নীল হয়ে অস্ত গেল।

রাতেই চলে এসেছে রামলাল। বললে, 'ব্রহ্মতালু এখনো গরম আছে। তোমরা একবার কাপ্তেনকে খবর দাও।'

ভোর হয়ে গেল তবু ঠাকুর তখনো ঘুমে।

বাগান থেকে ফুল তুলল ছেলেরা। দিব্যতনুর শেষ পূজার আয়োজন করল। শ্রীপদে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিল। গলায় পরিয়ে দিল ফুলের মালা। এ কি, শ্রীঅঙ্গে যে এখনো তাপ। এখনো দিব্যদ্যুতি।

কে খবর দিয়েছে কে জানে, ভোর হতে না হতেই ডাক্তার সরকার এসে হাজির। তিনি দেখে-শুনে বললেন, এ মহাসমাধি ভাঙবার নয়। লীলা সম্বরণ করেছেন ঠাকুর।

কাপ্তেন, বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এসে ঘি মালিশ করতে বললে। বললে, দেহে যখন

এখনো তাপ আছে, তখন বলা যায় না, এ মহাসমাধি ভাঙতেও পারে। যোগশাস্ত্রে বিধি আছে সমাধিস্থ যোগীর গ্রীবা বক্ষ ও গুলফে যদি কোনো ব্রাহ্মণ গব্যঘৃত মালিশ করে তাহলে সমাধিভঙ্গের সম্ভাবনা। ঘি আনা হল। শশী গ্রীবায় শরৎ বক্ষে ও বৈকুণ্ঠ সান্যাল পায়ে মালিশ করতে লাগল। তিন ঘণ্টারও উপর মালিশ করা হল একনাগাড়ে। কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু হল না।
সমস্ত অবরোধ ভেঙে নদীর উচ্ছ্বাসের মত শ্রীমা ছুটে এলেন। পড়লেন মাটিতে লুটিয়ে। কণ্ঠে শুধু এক বুকভাঙা আর্তনাদ : আমার কালী মা কোথায় গেলে গো ?
যোগীন আর বাবুরাম ছুটে গেল মা'র কাছে। গোপাল-মা এসে মাকে তুলে নিল। মা একবার কেঁদে সেই যে চুপ করলেন তাঁর গলার আওয়াজ আর শোনা গেল না।
বাতাসের মুখে খবর ছুটল। নানা ধারায় আসতে লাগল জনস্রোত। ডাক্তার সরকার বললেন, 'এই দিব্যাবস্থার ছবি নেওয়া দরকার। আমি যাই, কলকাতায় গিয়ে এর একটা ব্যবস্থা করি।'
উদ্ধব বললে, হে অচ্যুত, যোগচর্চা অতি দুশ্চর। মানুষ যাতে সহজে সিদ্ধিলাভ করতে পারে তাই বলুন।
শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আর কিছু নয়, আমাকে এবং আমার জন্যই তোমার কর্ম এ ভাবটিকে সর্বদা মনে রেখে কর্ম করা অভ্যাস করবে। সকল ভূতের অন্তরে ও বাইরে আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখবে না। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সাধু-তস্কর সূর্য-স্ফুলিঙ্গ ক্রূর-অক্রূর সকলকে যে সমান দেখে সেই পণ্ডিত। মন বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্ববস্তুতে মদ্‌ভাব অনুভব করাই আমাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়।'
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মাথায় নিল উদ্ধব। বললে, হে অজ, হে আদ্য, আপনার সান্নিধ্য-গুণেই আমার মোহজাল ছিন্ন হয়েছে। আর কিছু চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার অনপায়িনী রতি হোক।
'উদ্ধব, তুমি আমার প্রিয়ধাম বদরিকায় চলে যাও। সেখানে আমার পাদতীর্থোদকে স্নান ও আচমন করে শুচি হও। বল্কল পরিধান করে বন্য ফল ভোজন করে অলকানন্দা দর্শন করে বিধৌতকলুষ হয়ে বিরাজ করো। সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বভাব ত্যাগ করে মন আমাকে সমর্পণ করে আমারই প্রদত্তজ্ঞান স্মরণ করো।'
বদরিকায় চলে গেল উদ্ধব।
বাসুদেব চলে এলেন প্রভাসে। সেখানে যদুকুল একে-অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হতে লাগল। কৃষ্ণ ও বলরামকেও তারা আক্রমণ করলে। বলরাম আর কৃষ্ণের হাতে কেউ আর অবশিষ্ট রইল না।
তখন সমুদ্রবেলাতে বসলেন বলরাম। যোগ অবলম্বন করে পরমাত্মাতে আত্মা সংযুক্ত করে মনুষ্যলোক ত্যাগ করলেন। বলরামের নির্যাণ দেখে বাসুদেব একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে এসে বসলেন। চতুর্ভুজ মূর্তি ধরে দিঙমণ্ডল আলোকিত করে বিধূম পাবকের মত বিরাজ করতে লাগলেন। দক্ষিণ উরুর উপর কমলকোরক-সন্নিভ বাম পদতল স্থাপিত। তুষ্ণীম্ভূত সমাহিত মূর্তি।

সেই পদতলকে মৃগ মনে করে জরা-ব্যাধ শর ছুঁড়ল। শর বিন্ধ করল পদতল। ব্যাধ এগিয়ে গিয়ে দেখল চতুর্ভুজ বিভ্রাজ-মূর্তি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হে অনঘ উত্তমশ্লোক, বুঝতে পারিনি, আমার এই অনপনেয় পাপ ক্ষমা করুন।
'তুমি আমার অভিলষিত কাজই করেছ।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'সুকৃতীদের পদ স্বর্গলোক লাভ করো।'
কৃষ্ণসারথি দারুক এল রথ নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'রথে চড়ে নয়, আমি লোকাভিরাম ধ্যানমঙ্গল নিজ দেহ নিয়েই স্বধামে প্রবেশ করব। ভুবনে এই প্রতিষ্ঠিত করে যাব যে মর্ত তনু দ্বারাই দিব্যগতি লাভ করা যায়। আমি কি ব্যাধের খরশর থেকে আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিলাম। না, দারুক, এইটুকু শুধু জেনো যে আমিই সত্য আর সমস্তই আমার মায়ারচনা।'
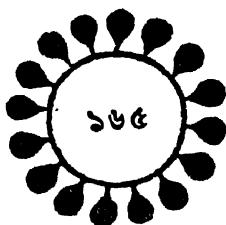
আমাকে দেখ।
চিদমৃতমুখরাশিতে চিত্তফেন বিলীন হয়ে গিয়েছে। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিতরঙ্গ আর নেই। নিশ্চলসুখসমুদ্র নিশ্চেষ্ট ও সুপূর্ণ। আমি সর্বদা একাবস্থ। আমাতে দুঃখ কি করে সম্ভব? আমি আনন্দরূপ, আমি অখণ্ডবোধ। আমি পরাৎপর, ঘনচিৎপ্রকাশ। মেঘ যেমন আকাশকে ছোঁয় না, আমিও তেমনি সংসারদুঃখের বাইরে।
যে সূর্যালোকে অলিখজগৎ প্রতীত, তাঁকে কে সন্দেহ করে? তেমনি আমি যে স্বয়ংপ্রকাশ পরমপ্রকাশ কেবল-শিব তাতে কার সংশয়? দেখ আমাকে। আমি নিত্যস্ফূর্তি, নির্মলসদাকাশ, আমি নিত্যসুখশান্ত, আমার থেকেই সমস্ত মহামোহ দূরীকৃত, আমিই বেদ-প্রত্যয়-বিহীন অখিলতত্ত্ব।
চীনেবাজারের বেঙ্গল ফোটোগ্রাফার কোম্পানির লোক এল ফোটো তুলতে। আসতেআসতে বিকেল করে ফেলল। সকালের দিকে ঠাকুরের দিব্যদেহে, হরিপাদপঙ্কজপরাগপবিত্র দেহে, যে জ্যোতির্ময় দীপ্তি ছিল তা তখন ম্লান হয়ে গিয়েছে। পীতবস্ত্রে সাজানো হল সেই দেহ। নিচে নামানো হল খাটে করে। ভক্ত ও সন্তানেরা দাঁড়াল সন্নিহিত হয়ে, নরেনের কাঁধে হাত দিয়ে রাম দত্ত। ফোটো নেওয়া হল দুখানা।
সেদিনের কথা মনে পড়ছে ডাক্তার সরকারের, যেদিন প্রথম এসেছিল শ্যামপুকুরের

বাড়িতে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে সেই ধন্য সেই বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দু-মণ বোঝা আছে, আর এদিকে বর যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। মাথায় বোঝা তবু বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে কি এ সম্ভব?'
'দেখ আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু মা'র নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে-পড়ে মাকে ডাকতুম, বলতুম, মা আমি কিছু শুনিনি কিছু জানি না, তুই শুধু আমায় দেখিয়ে দে। কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে। আমার কিছু নেই, আমার আছে শুধু ভক্তি। তোকে ভালোবাসি এই অখণ্ড অধিকার। এই অধিকারেই নেব তোর অভয়পদ—আমার পরম পদ।'
ডাক্তার বলেছিল আর-আরদের, 'বই পড়লে এঁর এত জ্ঞান হত না।'
ঠাকুরেরও সেই কথা : 'অনেকে মনে করে বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে দেখা। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশী দেখা অনেক তফাত।' আবার বললেন, 'যারা নিজে দাবা খেলে তারা চাল তত বোঝে না, কিন্তু যারা না খেলে উপর-চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক-ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে আমরা বড় বুদ্ধিমান। তারা নিজে খেলছে তাই তারা নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসার-ত্যাগী সাধু নিজে খেলে না, তাই উপর-চাল ঠিক-ঠিক বলে দিতে পারে।'
চারদিকে শোকের পাথার দুলে উঠেছে। সব চেয়ে কাঁদছে বেশি শশী।
ডাক্তারের মনে পড়ল একবার ঠাকুর বলেছিলেন, শোকেরই মতই এই ঈশ্বর। যদি কারু পুত্রশোক হয় সেদিন কি আর সে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না, নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে জাঁক করে বেড়াতে পারে, না সুখ সম্ভোগ করতে পারে? তেমনি যদি ঈশ্বরে সত্যি ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম-গুণগান ভালো লাগে তাহলে কি আর ইন্দ্রিয়ভোগে মন যায়?
মহেন্দ্র মুখুজ্জে বললে, 'সংসারে কি শুধু দারিদ্র্যই দুঃখ? এ দিকে ছয় রিপু, তারপরে রোগ-শোক।'
'আবার মানসম্ভ্রম।' বললেন ঠাকুর, 'টাকা থাকলেই বা কি হবে! জয়গোপাল সেন কত টাকা করেছে, কিন্তু বিষম দুঃখ, ছেলেরা মানে না। যা হোক, তুমি তো একটা ধরেছ—নিরাকার। যা বিশ্বাস তাই রাখবে, কিন্তু এটা জানবে যে তাঁর সবই সম্ভব।'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই সম্ভব। সাকারও সম্ভব।'
'আর জেনো তিনি চৈতন্যরূপে বিশ্ব ব্যাপ্ত করে আছেন।'
'তিনি চেতনেরও চেতয়িতা।'
'এখন ঐ ভাবেই থাকো, টেনেটুনে ভাব বদলাবার দরকার নেই। ক্রমে জানতে পারবে ঐ চৈতন্য তাঁরই চৈতন্য। যাকে জড় বলছ তাও চৈতন্যেরই আবরণ।'
তাই ঠাকুর যখন সায়েন্স-এ্যাসোসিয়েশান বা বিজ্ঞানসভায় যাবার জন্যে ডাক্তারকে

পীড়াপীড়ি করেছিলেন তখন ডাক্তার বলেছিল, 'কি সর্বনাশ! তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।'
'কেন, কেন?'
'ঈশ্বরের নানা আশ্চর্য কাণ্ড দেখে।'
'তা বটে।' গম্ভীরমুখে বললেন ঠাকুর।
ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ডাক্তার। ভাবছে, আমার কি এখনো গ্রেপ্তার হবার সময় আসেনি?
রবীন্দ্র নামে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে আসত ঠাকুরের কাছে। একবার এক-নাগাড়ে তিন রাত তাঁর কাছে বাসও করেছিল। তাকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর কিন্তু দেরি হবে, এখনো তোর একটু ভোগ আছে কপালে। এখন কিছু হবে না। যখন ডাকাত পড়ে তখন ঠিক সেই সময়ে পুলিশ কিছু করতে পারে না। একটু থেমে গেলে তবে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে।'
ডাক্তার ভাবছে তার ডাকাতি কি শেষ হয়নি এখনো? এখনো কি সই হয়নি পরোয়ানা?
ঠাকুরের তিরোধানের ক-মাস পরে রবীন্দ্র একদিন পাগলের মত ছুটতে-ছুটতে বরানগর মঠে এসে উপস্থিত। পরনে আধখানা মোটে কাপড়। আর আধখানা কোথায় গেল কে জানে?
'তোমার আর আধখানা কাপড় কোথায় গেল?'
'আসবার সময় কাপড় ধরে টানাটানি করলে, তাই আধখানা ছিঁড়ে গেল। নাও আধখানা। তবু তোমার খপ্পর থেকে যে করে পারি আসব বেরিয়ে—'
'কে সে?'
'আর কে? মদ আর তার সঙ্গিনী অবিদ্যা।'
'কি করে এলে?'
'স্রেফ পায়ে হেঁটে। ছুটতে-ছুটতে। যাই গঙ্গাস্নান করে আসি। আর সংসারে ফিরব না।'
রামলালও কাঁদছে অঝোরে। কি কথা ভাবছে কে জানে।
ঠাকুর যখন চিকিৎসার জন্যে চলে যান কলকাতা তখন রামলাল বলেছিল, আপনার জন্যে বড় মনকেমন করবে। ঠাকুর বললেন, মনে করবি যে ঝাউতলায় গেছি আবার আসব। যাব কোথায়? সর্বদাই আছি আমি দক্ষিণেশ্বরে।
মনে পড়ছে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ বারান্দার দেয়ালে ঠাকুরের কাঠ-কয়লা দিয়ে আঁকা ছবিটি। একটি টবের উপর পদ্মফুলের গাছ, আর সেই ফুলের উপরে একটি পাখি। কাশীপুরের বাড়িতেও ছোট একটা কাঠির সাহায্যে দেয়ালে বালির উপর একটি গাছ এঁকেছেন আর গাছের ডালে বসা একটি পাখি। পাখিটা এমন জীবন্ত যেন এখুনি উড়ে যাবে।
'ছেলেবেলায় কত ছবি আঁকতাম।' বলতেন সবাইকে : 'পোটোদেরও তাক লেগে যেত।'

শম্ভু মল্লিকের বাগানে কে একজন এসেছে, হিপনটিজম জানে। ঠাকুর শুনে শুধোলেন সেটা কি জিনিস? সেটা হচ্ছে মন্ত্রের গুণে লোককে অজ্ঞান করে তাকে দিয়ে ইচ্ছা মত কাজ করানো। ঠাকুর তাকে বললেন, হ্যাঁ গা, তুমি তো অনেককে করো, কই আমায় একবার ঐ রকম করো না। পারলে না, লোকটা ঠাকুরকে পারলে না অজ্ঞান করতে। ঠাকুর বললেন, কে জানে বাপু মা'র ইচ্ছে নয় যে আমি অজ্ঞান হই।

সেই সেবার আলমবাজারে শিবু আচার্যির পাঁচালি শুনতে গিয়েছিল রামলাল। আসরে ভারি মজার ব্যাপার, একতাড়া কলার ঝাড় ও পঞ্চাশ-টাকার নোট ঝোলানো। তার মানে যে ভালো করতে পারবে সে পঞ্চাশ-টাকা পাবে আর যারটা সবচেয়ে খারাপ হবে সে পাবে ঐ কলার ঝাড়। গান শুনে এসে ঠাকুরকে বললে রামলাল, কি সুন্দর গান! 'এমন অমূল্য শ্রীরামনাম কে শুনালে আমার কর্ণে।' ঠাকুর দুঃখ করে বললেন, আহা, আমি শুনতে পেলুম না।

কদিন পরেই শিবু আচার্যি হাজির দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বললেন, আহা, সেই গানটা গাও না। রামলাল শুনে কত প্রশংসা করলে। শিবু গান ধরল। দু-চক্ষের জলে ভেসে গেলেন ঠাকুর, রামলালকে বললেন, গানটা লিখে নে। শিবুকে বললেন, 'আহা, কত লোককে গান শোনাচ্ছ, চার-পাঁচ ঘণ্টা গাইছ একভাবে, তোমার গলা খারাপ হয় না, এ কি কম কথা! যার দ্বারা দশজন আনন্দ পায় আর যার আকর্ষণ-শক্তি বেশি, তার হৃদয়ে যেন শক্তি বিরাজ করছে।'

একদিন শিবু আচার্যি চারখানি নৌকো নিয়ে হাজির। ওপারে ভদ্রকালিতে তার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবে। সে কি ধুমধাম করে যাওয়া হল সেবার। এক নৌকোয় ঠাকুর, নরেন, রাখাল আর রামলাল, আরেক নৌকোয় অক্ষয় মহিম আর মাস্টার-মশাই। নিশান টাঙানো হল নৌকোয়। শিঙে খোল-করতাল বাজিয়ে হরিনাম করতে-করতে যাত্রা। পারে কত লোক এসে দাঁড়িয়েছে। কারু হাতে ফুলের মালা, কারু হাতে বা ধামিভরা বাতাসা। ঠাকুরের গলায় মালা দিলে, হরিবোল-হরিবোল বলে বাতাসগুলি ছড়িয়ে দিল চারদিকে। টলমল-টলমল করতে-করতে ঠাকুর নামলেন নৌকো থেকে।

কি হচ্ছে এখানে? একদিকে কীর্তন অন্যদিকে পণ্ডিতদের আলোচনা। ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বসিয়ে দিল। সে কি তর্ক পণ্ডিতদের মধ্যে। সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়। তার জিভের আগে কেউ টিকতে পাচ্ছে না। যে যা বলছে সব সে কেটে দিচ্ছে। কিছু মানছে না কিছু রাখছে না। অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলেন ঠাকুর, পরে রামলালকে বললেন, চল্ তো রে একটু বাইরে যাব। বাইরে গিয়ে তিনি হঠাৎ মাকে বললেন, মা, শালা ভারি তর্ক করছে। কারু কথাই নিচ্ছে না ধরছে না। ভারি শুকনো পণ্ডিত। তুই ওকে একটু ঠাণ্ডা করে দে দিকিনি। তাড়া-তাড়ি ফিরে এসে ঠাকুর সামাধ্যায়ের ডান হাঁটুটা খপ করে ধরে ফেলে বললেন, হ্যাঁ গা, কি বলছিলে বলো না। সামাধ্যায় হেসে বললে, ও আমি ঠাট্টা-তামাশা করছিলাম!

যখন খেয়ে-দেয়ে দুপুরে শুতেন কত তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছি। কতক্ষণ পরেই বলতেন, যা এইবার একটু গড়িয়ে নে গে যা। মাদুর-বালিশ নিয়ে একটু শুতুম, তারপর দপ্তরখানায় চিলে-ছাতে যেতুম রসিকের সঙ্গে গল্প করতে। কামারপুকুরের রসিকলাল সরকার মা-কালীর ঘরের সমস্ত কাজের যোগানদার, তখন থাকত সেই চিলে-কোঠায়। ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর ডাকতেন, ওরে রামনেলো, শালা, শিগগির আয়, আমি বাইরে যাব। গল্পে এত মত্ত থাকতুম কখনো ঠিক-ঠিক শুনতে পেতুম না। যখন শুনতুম, পড়ি-মরি ছুট মারতুম। বলতেন, 'শালার রসকের ওপর এমন ভালোবাসা, গল্প করবে তো মাদুর-বালিশ তুলতেও সময় পায়নি।'

কত তামাক সেজে দিয়েছি। ঠাকুরের বায়ুবৃদ্ধি হয়েছে, আগড়পাড়ার বিশ্বনাথ কবরেজ চিকিৎসা করছে। হ্যাঁ গা, তামুক খেলে কি হয়? বায়ু কমে। বললে বিশ্বনাথ। তবে যখন তামাক খাবেন তখন চিলিমের উপর কিছু ধনের চাল আর মৌরী দিয়ে খাবেন। ও রকম করে কতবার সেজে দিয়েছি।

কত ডাকা-আনা করেছি নরেনকে। ওরে রামলাল, একবারটি লরেনের খবর নিয়ে আয়। এই দ্যাখ এক মাড়োয়ারি ভক্ত এসে বাদাম-কিসমিস খেতে দিয়ে গেছে। যা এগুলো পেঁৗছে দিয়ে আয় লরেনকে।

আবার কবে আসবি? নরেনকে জিগগেস করলেন ঠাকুর। বুধবার আসব। ক'টায়? তিনটেয়। সেই বুধবার এসেছে, আর ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে কথা কইবেন কি, বারে-বারে বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, চটিজুতো পায়ে দিয়ে হনহন করে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন ঠাকুর। এ কি, নরেন দাঁড়িয়ে। কি রে, কখন এলি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নরেন বললে, এখন সবে দুটো, অনেক আগে এসে পড়েছি। সত্যরক্ষার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, তিনটে বাজলে যাব। ঠাকুর দাঁড়িয়ে রইলেন। ফটকের সামনে দুজনের দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা। যখন ঠিক তিনটে বাজল তখন নিয়ে এলেন ঘরে।

কত দিনের কত কথা ভিড় করছে মনে।

মনে পড়ছে কাপ্তেনকে। কুকুর-কাপ্তেন। কোন একটা কুকুর মন্দিরের সামনে চাতালে বসে থাকত। ঠাকুর তাকে কাপ্তেন-কাপ্তেন করে ডাকতেন। ডাকলেই সে ঠাকুরের পায়ে এসে গড়াগড়ি দেয়, ঠাকুরের হাতের লুচি-সন্দেশ পেলে দারুণ খুশি। ঠাকুর বললেন, দ্যাখ এত যে কুকুর রয়েছে, কই কেউ তো মায়ের সামনে বসে না। গঙ্গার ধাপে বসতে, গঙ্গাজল খেতে এর আর জুড়ি নেই। এ কাপ্তেনটা শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছে। ওর পূর্বজন্মের সংস্কার যা ছিল তাই এখানে এসে করছে। ধন্য হয়ে গেল।

সিস্টার নিবেদিতা শ্রীমা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দেখল বাড়িতে ঢোকার সিঁড়ির উপর একটা কুকুর শুয়ে আছে। নিবেদিতা হাত জোড় করে কুকুরটিকে বললে, 'ভক্তবর, দয়া করে পথ ছেড়ে দাও। আমি জগন্মাতার পাদপদ্মে প্রণাম করতে এসেছি, আমার পথরোধ করে থেকো না। আমি জানি, তুমি ছদ্মবেশী মহাভক্ত, পূর্ব-পূর্ব জন্মে অনেক সুকৃতি ছিল, কিন্তু কি কারণে কে জানে এবার কুকুরদেহ

ধারণ করেছ। মায়ের পদধূলি পড়েছে এ সিঁড়িতে, পড়েছে কত সন্তান ভক্তের, তাই তুমি এ মহাতীর্থ ছাড়ছ না। আমিও তোমার সতীর্থ, আমাকে একটু পথ করে দাও।' কুকুর দোর ছাড়ল না, শুধু একটু পাশ দিল নিবেদিতাকে।

ঠাকুর যখন কল্পতরু হলেন তখন সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে রামলাল ভাবতে লাগল, সকলের তো একরকম হল, আমার কি গাড়ু-গামছা বওয়াই সার হবে? এই কথা যেমনি মনে হওয়া ঠাকুর অমনি পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কি রে রামলাল, অত ভাবছিস কেন? আয়-আয়।' এই বলে রামলালকে টেনে এনে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন, তার গায়ের চাদর খুলে দিলেন। তার বুকে হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন, 'দ্যাখ দিকিনি এইবার।' রামলাল দেখল চারদিক অপার্থিব আলোতে ভরে গিয়েছে।

আর নরেন? নরেন কি ভাবছে?

ভাবছে তার গুরুদায়িত্বের কথা। বলে গেলেন যাবার আগে, তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, তোর হাতে আর সব ছেলেদের ভার দিয়ে গেলাম। দেখিস ওদের, ছাড়িসনে।

রাত্রে, আহারান্তে, ঠাকুর যখন খানিক স্বস্তি বোধ করলেন, বললেন, 'জানিস, আজ সারাদিন ভগবানের খেলা দেখে বিভোর ছিলাম তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। তখন নরেন বলে উঠল, 'ভগবান তো সর্বভূতেই আছেন, ভুবনজোড়া তাঁর খেলার মাঠ—'

তখন ঠাকুর বললেন, 'ওরে তোর বেদান্তের ঈশ্বর নয়। তিনি চিন্ময়ও বটেন আবার চিদঘনও বটেন। লীলায় সেই চিন্ময়ের জমাট রূপ। দেখছি তিনি অপরূপ বালকৃষ্ণ হয়ে আপনমনে ধুলোখেলা করছেন। নবীন মেঘের মত রঙ, জ্যোতিতে সব দিক আলো, রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে। পথ দিয়ে যত লোক যাচ্ছে তাদের গায়ে ধুলো দিয়ে আনন্দ। কেউ গাল দিয়ে গেল ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ আদর করে কোলে করতে এল, অমনি দে-দৌড়। আবার কেউ আনমনে চলে যাচ্ছে, ঝাঁপ দিয়ে তার কোলে উঠলেন। বালকের খেলা কিনা, কোনো হেতু নেই। যে আদর করলে তাকে উপেক্ষা, আর যে ভুলেও ডাকেনি তাকে কৃপা।'

বিকেল পাঁচটায় শুরু হল শোভাযাত্রা। গলায় ফুলের মালা, শ্রীপাদপদ্মে সচন্দন ফুল, চললেন ঠাকুর নারয়ণী দেহে আনন্দৈকমাত্র বৈকুণ্ঠলোকে। প্রেমাশ্রুব্যাকুল হয়ে সবাই ছুটোছুটি করতে লাগল কেউ একটু খাট ছুঁতে পারে কিনা। কেউ একটু পারে কিনা কাঁধ দিতে। হে চরমশরণ, তোমাতে দৃঢ়া দুরাপা রতি দাও, দাও পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্তি। শতবর্ষ তুমি ভক্তহৃদয়ে বাস করবে, আমার হৃদয় তোমার বাসের যোগ্য করে তোলো।

খোল-করতালে সংকীর্তন চলল আগে-আগে। সঙ্গে নিশান, ওঁকার, ত্রিশূল। সমস্ত ধর্মের প্রতীক। বৈষ্ণবের খুন্তি, খৃস্টানের ক্রুশ, মুসলমানের অর্ধচন্দ্র। চলেছেন সর্বধর্মসমন্বয়—সর্বধর্মএকীকরণমন্ত্রের উদ্গাতা। যত মত তত পথ তো বটেই, যত মত এক পথ।

জ্ঞানে শঙ্কর, ভক্তিতে গৌরাঙ্গ, বৈরাগ্যে বুদ্ধ, আত্মবলিদানে যীশুখৃস্ট, ঔদার্যে

মহম্মদ। সর্বত্র অবিরোধ, সর্বত্র অবিদ্বেষ। তুমি সেই সর্বত্রগামী। সেই সর্বাত্মা। এক ঈশ্বর। এক পৃথিবী। এক মানুষের সত্তা। হে এক, তোমাকে অনন্ত চক্ষুতে দেখতে দাও।

রাম দত্ত লাটুকে বললে, 'তুই বাগানে এখন কিছুক্ষণ থেকে যা। পরে যাস শ্মশানে।'

লাটু তাই থেকে গেল। শোভাযাত্রার সঙ্গে গেল না। ছন্নছাড়া শিশুর মত এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

'ঠাকুরের মিরাক্‌ল্‌ বা বিভূতি যদি কিছু দেখতে চাও তো লাটু মহারাজকে দেখ।' বলেছিল অতুল। 'ঠাকুর যে বলতেন ওরে লেটো, তোর মুখ দিয়ে বেদবেদান্ত ফুটে বেরুবে, ঠিক তাই ফলেছে।'

'দেখো, এইটুকু বুঝেছি যে এক ভাঁড় জল আলাদা করে রাখলে শুকিয়ে যায়,' বলছে লাটু, 'বাকি সেই ভাঁড়কে যদি গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখতে পারি তাহলে জল আর শুকোয় না। তেমনি এই জগতে হামাদের মনকে যদি ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারি তাহলে বিষয়বাতাসে হামাদের মন আর শুকিয়ে উঠতে পারে না, জগৎ আর নিরানন্দ লাগবে না।' আবার বলছে, 'দেখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে মাথার উপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারটা বোঝা যায় না, তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে সংসারের বোঝা আর বোঝা বলে মনে হয় না। সংসারকে মনে হয় আনন্দের নিকেতন। যো যাকে শরণ লিয়ে সে রাখে তাকো লাজ, উলঠ জলে মছলি চলে বহি যায় গজরাজ।'

সব তাঁর ইচ্ছা এই ভাবে নিষ্পন্ন থাকো। ঠাকুরের সেই গল্প মনে পড়ল।

একজন লোক অনেক মেহনত করে পাহাড়ের উপর একখানি কুঁড়েঘর করেছিল। একদিন ভারি ঝড় উঠল। টলমল করতে লাগল ঘর। লোকটি তখন কাতরে প্রার্থনা করতে লাগল, হে পবনদেব, দেখো, ঘরটি যেন না পড়ে। পবনদেব শুনছেন না, ঘর মড়মড় করতে লাগল। তখন লোকটি একটা ফন্দি ঠাওরাল। হনুমান তো পবন-দেবের ছেলে, তার নাম করে দোহাই দিলে। বাবা, এ হনুমানের ঘর, দেখো যেন ভেঙো না। কিন্তু তখনো ঘর পড়ো-পড়ো। তখন অনুপায় হয়ে লোকটি বললে, বাবা, এ লক্ষ্মণের ঘর। তবুও বারণ মানছে না ঝড়। বাবা, এ রামের ঘর, রামের ঘর। তবুও না। ঘর যখন সত্যি ভাঙতে শুরু করেছে, যখন আর উপায় নেই, তখন লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, যা শালার ঘর।

কিছুই করবার নেই। তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে তাঁর ইচ্ছায় যাচ্ছে।

আবার সবই তাঁর কৃপা।

দরোয়ান হনুমন্ত সিং-এর সঙ্গে এক ভারি পাঞ্জাবী কুস্তি লড়তে এসেছে। পাঞ্জাবী লোকটা ভীষণ জোয়ান, দিন পনেরো ধরে খুব কসরত চালাল আর ঘি দুধ মাংস খুব খেতে লাগল। তার চেহারা দেখে সবাই সাব্যস্ত করলে তারই জিত হবে। হনুমন্ত সিং-এর কোনো আয়োজন নেই, শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের আশীর্বাদ চাইলে। ঠাকুর বললেন, খাওয়া কমাতে হবে, কসরত কমাতে হবে আর

দিনভোর মহাবীরজীর শরণ নিতে হবে। মহাবীরজীর কৃপা হলে সব বিপক্ষ নিরস্ত হবে। লোকে ভাবলে এ কি সর্বনেশে বিধান, খাওয়া-দাওয়া কমালে লড়বে কি করে? কিন্তু ঠাকুরের উপর হনুমন্তের অটুট-বিশ্বাস, তাঁর কথা পুরোপুরি মেনে নিলে। জয় মহাবীরের জয়। কুস্তিতে হনুমন্তের জয় হল।

আর সে কৃপার কোনো কার্যকারণ নেই।

একদিন দুপুরবেলায় লাটুকে নিয়ে ঠাকুর চললেন তালতলায়, ডাক্তার দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যের বাড়ি। চল, একবার তাকে গলাটা দেখিয়ে আসি, এমন ডাকসাইটে ডাক্তার। অনেকক্ষণ ধরে দুর্গাচরণ ঠাকুরকে পরীক্ষা করলে, কিন্তু কি যে অসুখ, বলতে পারলে না। ঠাকুর তাকে যতবার বলেন, হ্যাঁ গা, রোগ সারবে তো, দুর্গাচরণ তত বলে, ওষুধটা আগে খেয়ে দেখুন। বাড়ি ফিরে এসে ঠাকুর লাটুকে বলছেন, রোগ সারবে কিনা তার খোঁজ নেই, বলে ওষুধটা খেয়ে দেখুন। খাব না ওর ওষুধ। তবে সেখানে গেলেন কেন? ওরে তুই জানিস না, ও লুকিয়ে-লুকিয়ে যেত দক্ষিণেশ্বর। কতবার গিয়েছে, একবার আমার না গেলে কি ভালো দেখায়? ও তো নিজে থেকে ডাকল না ওর বাড়ি, না ডাকুক, আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে গেলাম। কতদিন রাত্তির দশটা-এগারোটার সময় গিয়ে 'হৃদে, হৃদে' করে ডাকত। ওর গলা শুনে বুঝতে পারতুম, হৃদেকে বলতুম, ওরে দোর খুলে দে, কলকাতা থেকে দুর্গাচরণ এসেছে। হৃদয় দোর খুলে দিত। ডাক্তার একটাও কথা বলত না। চুপচাপ বসে থাকত অনেকক্ষণ। ঠাকুর বললেন, 'কি চোখে আমাকে দেখেছিল তা ও-ই জানে।'

রোজ সকালে ঘুম ভাঙতেই দু-চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে ঠাকুরকে ডাকত লাটু। ঠাকুর এসে দাঁড়াতে তবে চোখ খুলত। দিনের প্রথম দর্শন দিনমণি নয়, দিনের প্রথম দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এখন কোথায় দেখব তোমাকে?

লাটু ছুটল কাশীপুর শ্মশানে। চন্দনকাঠের চিতা জ্বলছে। চিরঞ্জীব শর্মা গান গাইছে শোকাশ্রু-গম্ভীর কণ্ঠে : 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে, হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ সুখ-দুঃখের ভিতরে।' 'মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ি অবাক হয়েছি। হাসিব না কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি।'

কিন্তু প্রজ্জ্বলিত চিতার পাশে পাখা হাতে কে বসে? আগুনকে হাওয়া করছে এ কে উন্মাদ?

উন্মাদ নয়, গুরুগতপ্রাণ শশিভূষণ। প্রভুর সেবাকালে অহরহ পাখা করেছে, এখনো দেহরক্ষা করার অন্তেও চলেছে সেই সেবাকাজ। দেহে নেই বলে যারা ভাবছে ঠাকুর তিরোহিত তারাই শশীকে উন্মাদ বলবে কিন্তু শশী সর্বকালে সর্বঘটে তার ইষ্টকে দেখছে, তার দৃষ্টিতে অগ্নিতে আর রামকৃষ্ণে কোনো ভেদ নেই, তাই সে-ই সত্যদ্রষ্টা সে-ই সত্যধ্যানী।

চিতা নিবে গেল তবুও শশীর পাখার বিরাম নেই।

লাটু তুলল তার হাত ধরে। নরেন আর শরৎ নিজেদের কি প্রবোধ দেবে তা জানে না, শশীকে প্রবোধ দিতে লাগল।

ঠাকুরের সব ভস্মাস্থি একত্র করে একটি তামার কলসীতে রাখল শশী। মাথায় করে নিয়ে চলল। কাশীপুরের বাড়িতে ফিরে ঠাকুরের শয্যাস্থানে রাখল। আবার বসল পাখা করতে।

কে বলে তিনি নেই?

আমি আছি। আগুনে দগ্ধ হলেও আমি উড়ে যাই না, জলে মগ্ন হলেও আমি ধুয়ে যাই না। আমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। আমি নিত্য সর্বব্যাপী স্থির অচল ও সনাতন। আমিই প্রাণীর গতি ও প্রতিপালক। আমিই প্রভু, সকল প্রাণীর নিবাসস্থল ও কৃতাকৃতের সাক্ষী। আমিই প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ হিতকারী। স্রষ্টা ও সংহর্তা। আধার ও প্রলয়ভাণ্ড। আমিই অক্ষয়কারণ।

আমাকে দেখো।

'নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।' আমার বিভূতির অন্ত নেই। যা কিছু শ্রেষ্ঠ যা কিছু পরম-প্রধান তাই আমি। প্রকাশকদের মধ্যে আমি মরীচিমালী সূর্য, পুরোহিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে কার্তিক আর জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র। পর্বতের মধ্যে মেরু, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, নক্ষত্রের মধ্যে সুধাংশু। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, অষ্ট বসুর মধ্যে অচল, সর্বভূতে অভিব্যক্ত চেতনা। বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, স্থাবরের মধ্যে হিমালয়, শব্দের মধ্যে ওঁকার। দেবর্ষির মধ্যে নারদ, গন্ধর্বের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধের মধ্যে কপিল। অশ্বের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, মানুষের মধ্যে নরপতি। আয়ুধের মধ্যে বজ্র, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, সর্পের মধ্যে বাসুকী। সৃজনশক্তির মধ্যে কাম, নিয়ামকদের মধ্যে যম, সংখ্যাকারিকের মধ্যে কাল। পশুর মধ্যে সিংহ, পাখির মধ্যে গরুড়, মৎসের মধ্যে মকর। নাগের মধ্যে অনন্ত, জলদেবের মধ্যে বরুণ, দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ। বেগবানের মধ্যে বায়ু, নদীর মধ্যে গঙ্গা, শাস্ত্রপাণিদের মধ্যে রামচন্দ্র। অক্ষরের মধ্যে অ-কার, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস, বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা। সমস্ত সৃষ্টির আমিই আদি আমিই মধ্য আমিই শেষ, ক্ষণ-রূপে আমিই অক্ষীণ কাল, আমিই সর্বকর্মের ফলদাতা। অপহারীদের মধ্যে মৃত্যু, ভাবীকালের উৎকর্ষ, বিতণ্ডার মধ্যে বিচার। নারীর মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত। ছলের মধ্যে অক্ষ, তেজস্বীর মধ্যে তেজ, বিজয়ীর মধ্যে বিজয়, উদ্যোগীর মধ্যে অধ্যবসায়। যাদবের মধ্যে কৃষ্ণ, পাণ্ডবের মধ্যে অর্জুন, মুনির মধ্যে ব্যস, কবির মধ্যে শুক্রাচার্য। আমিই শাসকের দণ্ড, জিগীষুদের নীতি, গুহ্য বিষয়ে মৌন, জ্ঞানীর জ্ঞান। যা কিছু বীজস্বরূপ তাই আমি। সমস্তই আমার সত্তায় সত্তান্বিত। সবই মদাত্মক। আমার বিভূতির এত কথা জেনেই বা তোমাদের কি দরকার? এইমাত্র জেনে রাখো আমিই এক পাদমাত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ আবৃত করে আছি।

'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি
জয় জয় পরমা নির্বৃতি হে নমি নমি।

অশ্রুশ্রাবণপ্লাবন হে নমি নমি
পাপক্ষালনপাবন হে নমি নমি।
সর্ব ভয় ভ্রম ভাবনার
চরমা আবৃতি হে নমি নমি॥'
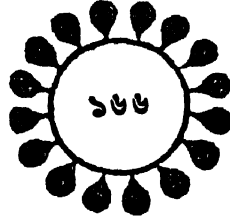
মা-ঠাকরুন হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, ঠাকুর সশরীরে দেখা দিলেন। বললেন, 'কেন গো, আমি কি কোথাও গেছি? এ তো এঘর আর ওঘর।'

কারু সাধ্য নেই মাকে থানকাপড় এগিয়ে দেয়। নিজ হাতেই মা কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে সরু করে নিয়েছেন।

লোকনিন্দা যায় না। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণকন্যা সোনার বালা পরে পেড়ে কাপড় পরে এ কি কথা! তাহলে মানতে হয় দেশাচার। আবার খুলতে যাচ্ছেন বালা আবার ঠাকুরের আবির্ভাব। এবার একেবারে মা-ঠাকরুনের হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'আমি কি মরেছি যে বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিগগেস কোরো, ও সব শাস্ত্র জানে।'

গৌরীকে কোথায় পাব? সে তো এখন বৃন্দাবনে।

ঠাকুরের তিরোধানেব খবর পেয়ে গৌরীমা তো কেঁদে আকুল। ভৃগুপাতে দেহত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। অমনি চোখ চেয়ে দেখল সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। তুই মরবি নাকি; ঠাকুর ধমক দিয়ে উঠলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে গৌরীমা উঠে দাঁড়াল। ঠাকুর অদৃশ্য হয়ে গেছেন। গৌরীমা বুঝতে পারল তার দেহত্যাগ ঠাকুরের ইচ্ছা নয়। এখনো অনেক বুঝি তার কাজ বাকি।

'কি বলবে বলোই না।' কাশীপুরে একদিন মা দেখলেন ঠাকুর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন অপলকে। দুই চোখ কি যেন বলি-বলি করছে।

'হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? সব এ-ই করবে?' নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর।

'আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি?'

'না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।' নিজের দেহের দিকে আবার ইঙ্গিত

করলেন ঠাকুর : 'এ আর কি করেছে? তোমার অনেক-অনেক কাজ বাকি। দায় কি শুধু আমারই? দায় তোমারও।'

এখন ঠাকুর অপ্রকট হবার পর, মা'র ইচ্ছা হল আমিও চলে যাই। ঠাকুর দেখা দিলেন। বললেন, 'জগতে মাতৃভাব প্রকাশের জন্যে তোমাকে রেখে গিয়েছি। তুমি থাকো।'

এদিকে মায়ের সন্তানদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। ঝগড়া বেধেছে ঠাকুরের ভস্মাস্থি নিয়ে। কাশীপুরের বাড়ির ভাড়া টানবার আর সংগতি নেই সন্তানদের, তবে ঠাকুরের পূতাস্থিপূর্ণ কলসীটি কোথায় রাখা হবে? যতদিন এ-বাড়ির মেয়াদ আছে ততদিন না হয় এখানেই সে কলসীর পূজার্চনা হবে—তারপর?

রাম দত্ত আর তার দলের লোকদের ইচ্ছা কলসী কাঁকুড়গাছিতে তার যোগোদ্যানে নিয়ে সমাহিত করা হয়। কিছুতেই তা হতে দেবে না। শশী আর নিরঞ্জন রুখে দাঁড়াল। গঙ্গাতীরে জমি কিনব নিজেরা আর সেখানে সমাহিত করব পূতাস্থি। কিন্তু জমি কেনবার মত টাকা কই? নিজস্ব একটা বাড়ি পর্যন্ত নেই যেখানে এ সম্পদ আগলাতে পারি। সন্ন্যাসী ভক্তরা যুক্তি করতে বসল। তাম্রকলসী রাম-বাবুকেই দেওয়া হোক কিন্তু তার আগে পূতাস্থিভস্মের অধিকাংশ সরিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু দেখো, রামবাবু যেন জানতে না পারে।

তাই হল। বেশির ভাগ পূতাস্থিভস্ম সরিয়ে নেওয়া হল কলসী থেকে। রাখা হল একটি আলাদা কৌটোয়। সে কৌটোটি লুকিয়ে রাখা হল বলরাম বসুর বাড়িতে। সেখানেই হবে নিত্যপূজা।

মায়ের কানে গেল এই ঝগড়ার কথা। গোলাপ-মাকে বললেন দুঃখ করে, 'এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন, দেখেছ গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে।'

এত কথার দরকার কি। বললে নরেন, 'আমাদের দেহেই ঠাকুরের জীবন্ত সমাধি হোক।'

পূতাস্থির খানিকটা হামানদিস্তাতে চূর্ণ করা হল। সেই চূর্ণ ভাগ করে নিল সন্ন্যাসী-সন্তানরা। জিহ্বায় স্পর্শ করল সকলে।

ঠাকুর মহাপ্রয়াণ করেছেন ৩১শে শ্রাবণ, তার কিছুদিন পরে, জন্মাস্টমীর দিনে, অস্থির কলসী নিয়ে যাওয়া হল যোগোদ্যানে। কে আর নেবে, শশীই মাথা পাতল। যথোচিত পূজা হল কলসীর। তারপর তাকে যখন মাটির নিচে পোঁতা হল, উপরে মাটি ফেলে দুরমুষ করতে লাগল, তখন শশী তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল : 'ওগো, ঠাকুরের গায়ে যে বড্ড লাগছে।'

নবীন শ্যামল ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে ঠাকুরের যেমন হত। ওগো, মাড়িয়ো না, মাড়িয়ো না, বুকে ভীষণ বাজছে।

ঘটে পটে কাঠে শিলায় সর্বত্র চৈতন্য।

একটি ভক্ত মেয়ে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। উত্তরদিকের দরজা একটু ফাঁক করে দেখে একলা ঘরে ঠাকুর তক্তপোশের উপর বসে পশ্চিমদিকের দেয়ালে টাঙানো দেবদেবীর ছবিদের সঙ্গে হাত নেড়ে-নেড়ে হাসছেন, কথা কইছেন। ভিতরে ঢুকে তাঁর

আনন্দের ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছা হল না। কিন্তু অন্তর্যামী ঠাকুর জানতে পেরেছেন, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন মেয়েকে, বললেন, 'দেয়ালের এই সব ছবি চৈতন্যময়, তাই এদের সঙ্গে কথা কইছি। তোমার ঘরে যে গোবিন্দের পট আছে তাকে ছবি মনে কোরোনি, তার সঙ্গে কথা কোয়ো—তাকে চিন্ময় ভাবতে-ভাবতে একদিন ঠিক তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। সেইদিনই সার্থক হবে তোমার পূজা, তোমার ভোগরাগ।'

গোবিন্দ মানে জানো তো? যিনি ইন্দ্রিয়সকলকে রক্ষা ও পরিচালনা করেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ তিনিই গোবিন্দ। বৃন্দাবনে গরু চরিয়ে বেড়াতেন যে গোবিন্দ সেই তিনিই জীবের ইন্দ্রিয়ের রাখাল। সকল ইন্দ্রিয়ের কর্তা মন, সেই মন গোবিন্দ-পাচনবাড়িতে জব্দ থাকে। গোবিন্দই মনোরথের সারথি।

মনকে নিগৃহীত করো। মন নিগৃহীত না হলে অভয়লাভ অসম্ভব। মন নিগৃহীত হলেই দুঃখ ক্ষয়, প্রবোধ ও পরাশান্তি। ধীরে-ধীরে মননিগ্রহ করো। কুশাগ্রের মুখে বিন্দু-বিন্দু করে জল তুলে সমুদ্র সেঁচে ফেল। কামেই চিত্তের বিক্ষেপ। কামভোগে কেবল দুঃখ এই বোধে বৈরাগ্যবলে উদ্দীপ্ত হও। আত্মানাত্মবিবেকই উপসেব্য।

মনের সংযমই শম। কর্মেন্দ্রিয়ের সংযমই দম। সকল ব্রহ্ম এ জেনে ইন্দ্রিয়গ্রাম যদি সংযত হয় তখন যে অবস্থা তাই যম। প্রতিকারের চেষ্টা না করে চিন্তা আর বিলাপ না করে দুঃখ সহ্য করাই তিতিক্ষা। নিগৃহীত মন আবার যদি বিষয়াভিমুখী হয় তাকে প্রত্যাহৃত করাই উপরতি। গুরু ও বেদান্তবাক্যে আস্তিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধা। পরমগুরু পরমেশ্বরে একান্ত অনুরক্তিই সমাধান।

বলরামকে ঠাকুর বললেন, 'আমার ইচ্ছে দুখানি ছবি যদি পাই। একটি ছবি, যোগী ধুনি জেবলে বসে আছে; আরেকটি ছবি, যোগী গাঁজার কলকে মুখে দিয়ে টানছে আর সেটা দপ করে জ্বলে উঠেছে। এ সব ছবিতে বেশ উদ্দীপন হয়। যেমন শোলার আতা দেখলে সত্যিকার আতার উদ্দীপন হয়।'

একটা থেকে আরেকটা।

অরুন্ধতী পাতিব্রত্যের প্রতীকস্বরূপ। তাই নবোঢ়াকে অরুন্ধতীনক্ষত্র দেখানো হয়। সে নক্ষত্র অত্যন্ত ছোট, সহজে চোখে পড়ে না। সুতরাং স্বামী নিকটের একটি স্থূল উজ্জ্বল তারার দিকে সঙ্কেত করে বলে, ঐ দেখো অরুন্ধতী। যখন বধূর দৃষ্টি তাতে সুস্থির হল একাগ্র হল তখন স্বামী বললে, না, না, ওটা নয়, ওর কাছে ঐ যে ছোট্ট তারাটি আছে ঐটিই অরুন্ধতী।

প্রতিমা দেখছ, তারপর দেখ সেই নিষ্প্রতীককে। মনোবুদ্ধিঅহঙ্কার চিত্ত দেখছ, তারপর দেখ এই আপনাকে। আত্মসাক্ষাৎকার করো।

কি চাই জানবার আগে কে চায় নির্ণয় করো। অন্বিষ্ট বস্তু ও অন্বেষক শক্তি কি আলাদা? তাই নিজেকে ফোটাও, নিজে হও। নিজেকে জানো। নিজেকে জানাই সত্য, নিজেকে জানাই সাধুতা। নিজের তাগিদে নিজের অনুপাতে হয়ে ওঠো। অন্যকে নকল করে নয় নিজে অবিকল্প থেকে।

শিবের কোলে কালী বসে, এই ক্ষেমঙ্করী ছবিটি ঠাকুরকে দিয়েছিল সুরেশ মিত্তির। ঠাকুর বললেন, 'বা, বেশ হয়েছে। মা, এই ঘরে থাকো, আর মন্দিরে গিয়ে খেও। ওরে রামলাল, কালীপুজোর দিন মা'র ছবিটি মা'র ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবি। মা সেদিন অনেক কিছু খাবে।'
ভবনাথ এনে দিয়েছিল নবদ্বীপের গৌরাঙ্গকীর্তনের ছবি। যমুনাপুলিনের ছবিটি দিয়েছিল রাখাল। 'বা, রাখালের কি পছন্দ! রাধিকা কোমরে হাত দিয়ে যেন বাঁশরী কাড়তে যাচ্ছে।' শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তিটি দিয়েছিল পাইকপাড়ার রানী কাত্যায়নী। নেপালের বিশ্বনাথ উপাধ্যায় দিয়েছিল গণপতি মূর্তি। কেশবচন্দ্র দিয়েছিল যীশুখৃষ্টের ছবি, মহেন্দ্রলাল দিয়েছিল ষোড়শী আর যশোদাগোপাল। শিকদারপাড়ার পোটো দিয়েছিল পাষাণী অহল্যা, রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র।
সব কি সজীব। সর্বত্র উদ্দীপন।
নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছেন ঠাকুর। ব্রাহ্মমন্দিরের বেদীর সামনে ঠাকুর প্রণাম করলেন। বললেন, 'নরেন বলে সমাজ-মন্দিরে প্রণাম করে কি হয়? উদ্দীপন হয়। মন্দির দেখলেই তাঁকে মনে পড়ে। যেখানে তাঁর কথা সেখানেই তাঁর আবির্ভাব। সেখানেই সকল তীর্থের উপস্থিতি। একজন, জানো তো, বাবলাগাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল, কেননা ঐ কাঠে রাধাকান্তের বাগানের জন্যে কুড়ুলের কাঠ হয়। একজনের এমন গুরুভক্তি, গুরুর পাড়ার লোককে দেখেই ভাবে বিভোর। মেঘ দেখে নীল বসন দেখে রাধিকার ব্যাকুলতা।'
নন্দনবাগানে সদরালা কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতেই এই ব্রাহ্মমন্দির। সেদিন সে উৎসবে উপস্থিত আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বেদমন্ত্রপাঠের পর উপাসনা হচ্ছে। তারপরে প্রার্থনা। মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা।
অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে। মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে। হে চিরপ্রকাশ, একবার আমার হয়ে প্রকাশ পাও, আমাতেই তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ করো। হে রুদ্র হে ভয়ঙ্কর, তোমার প্রসন্নসুন্দর মুখ আমাকে দেখাও, সে মুখের অভয়লাবণ্যে আমাকে বাঁচাও, আমাকে উজ্জীবিত করো।
ঠাকুর খুব খুশি। বলছেন, 'অশ্বত্থই সত্য, ফল দুদিনের জন্যে। গাছ কে দেখে সব ফল কুড়োতেই ব্যস্ত। অন্তর শুদ্ধ না হলে বিশ্বাস হয় না। যার ঠিক বিশ্বাস তারই ঠিক দর্শন। তবে কিনা সংসারী লোকদের ঈশ্বরানুরাগ ক্ষণিক—যেন তপ্ত লোহায় জলের ছিটে, জল যতক্ষণ থাকে।'
এক শিখ-সেপাই এসেছিল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'আমরা হরদম মারপিট করছি, সরকারি হুকুমে গুলি করে লোক মারছি, আমরা কি রকম থাকব?'
ঠাকুর ভাবে দেখলেন একটা ঢেঁকি ধান ভানছে। বললেন, 'দেখ ঢেঁকি যেমন অনেক মাথা নাড়ে, অনেক উঁচু-নিচু ওঠে, গড়ের ভিতর অনেক ধান ভানে, অনেক কাজ করে কিন্তু দু-পাশের দুটো কাঠি দুটো খোঁটাতে আটকানো থাকে, কোনো নড়চড় নেই, তেমনি মন রেখে কাজ কোরো।'
কাশীপুর বাগানের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে ছেলেরা। নরেন, নিরঞ্জন আর

কালী। কালীই বেশি ওস্তাদ। নরেন-নিরঞ্জন একটি মাছ গাঁথতে যত সময় নেয়, তার মধ্যে কালী প্রায় চার-পাঁচটি ধরে ফেলে। ঠাকুরের কানে গেল এ সংবাদ। ছেলেদের তিনি ডেকে পাঠালেন।
কালীকে বললেন, 'তুই নাকি পুকুরে ছিপ ফেলে খুব মাছ ধরিস?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
'ছিপ দিয়ে মাছ ধরা বড় পাপ।'
'কেন, জীবহত্যা?' নরেন বললে।
'হ্যাঁ, জীবহত্যা।'
'সে কি? নায়ং হন্তি ন হন্যতে। আত্মা কাউকে মারতেও পারে না, নিজেও মরে না, তাহলে পাপ কোথায়?'
'পাপ বিশ্বাসঘাতকতায়।' বললেন ঠাকুর, 'আহারের লোভ দেখিয়ে বঁড়শি লুকিয়ে রাখা আর অতিথিবন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তার খাদ্যে গোপনে বিষ দেওয়া একই পাপ। আত্মা মরে না, অন্যকেও মারে না—এ সত্য, কিন্তু এই জ্ঞান যার হয়েছে সে তো আত্মা-স্বরূপ হয়েছে। তার আর অপরকে হত্যা করার প্রবৃত্তি হবে কেন? যতক্ষণ ঐ হত্যাবৃত্তি আছে ততক্ষণ সে আত্মা-স্বরূপ হয়নি, সুতরাং তার আত্ম-জ্ঞানও হয়নি। তাই জেনে রাখ, ঠিক-ঠিক জ্ঞান হলে পা আর পড়ে না বেতালে।'
প্রয়াগে এসেছেন মা-ঠাকরুন। ঠিক করলেন ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানকালে কেশদাম বিসর্জন দেবেন। কাউকে সে কথা প্রকাশ করলেন না, লক্ষ্মীকেও না। স্নানের দিন খুব প্রত্যুষে মা শুনতে পেলেন কে যেন লক্ষ্মীকে ডাকছে। 'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।' বেদনাবিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মা চঞ্চল হয়ে ছুটে গেলেন দরজার দিকে। দেখলেন ঠাকুর দুই হাত দিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পলক স্থির হতে না হতেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মায়ের প্রাণ অধীর হয়ে উঠল। কেন, কেন ঠাকুরের এই কাতরতা? সহসা মনে হল তাঁর কেশদাম জলাঞ্জলি দেওয়া ঠাকুরের ইচ্ছে নয়।
কাশীধামে এসেছেন শ্রীমা। মৃত্তিকার কাশী নয় সুবর্ণের কাশী।
কাশীতে এক গুরু তার শিষ্যকে এক ডেলা মাটি আনতে বললে। শিষ্য সারা কাশী ঘুরে-ঘুরে গুরুর কাছে ফিরে এল দিনান্তে। বললে, গুরুদেব, আমি হতভাগ্য, আপনার আদেশ পালন করতে পারলুম না। কোথাও একটু মাটি নেই।
এ কি অসম্ভব কথা! গুরু ক্রুদ্ধ হল। সারা কাশী খুঁজে এক ডেলা মাটি পেলে না তুমি?
বিনয়বচনে শিষ্য বললে, না গুরুদেব। অন্নপূর্ণার সোনার কাশী, এখানে মাটির ছিটেফোঁটাও নেই—সমস্তই সোনা।
গুরু স্তম্ভিত হয়ে গেল। শিষ্য তাকে ছাড়িয়ে সাধনভূমির কত উঁচুতে উঠে গেছে।
বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালছেন শ্রীমা, আর দেখছেন, অনাদি লিঙ্গ কোথায়, ঠাকুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। যত জল ঢালছেন সব ঠাকুরের পায়ে পড়ছে। হাত-পা

কাঁপতে লাগল শ্রীমা'র, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলেন। এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন মা? কে একজন জিগগেস করলে। মা বললেন, ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।

আরেকদিন মা নারায়ণ দেখলেন। বৃন্দাবনে শেঠদের মন্দিরে যেমন দেখেছেন তেমনি। শুধু নারায়ণ নয়, নারায়ণের পাশে ঠাকুর। ঠাকুর হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুর হাতজোড় করে কেন? 'তাঁর কথা ছেড়ে দাও।' বললেন মা। 'সকলের কাছেই তাঁর দীনভাব—ঐ ওঁর বিশেষত্ব। এবার যে বালকবৎ অবস্থা অবলম্বন করে লীলা করলেন।'

একবার এক ভক্ত ঠাকুরকে একজোড়া মোজা দিল। নতুন মোজা পরে ঠাকুর ছোট ছেলের মত আহ্লাদে আটখানা। হুটকো গোপাল এসেছে দর্শন করতে, আনন্দময় ঠাকুর বলে উঠলেন, 'ওরে, আমাকে আজ মোজা পরে কেমন বাবু সাজিয়েছে দ্যাখ।'

গোপাল হাসছে।

'তুই বড় হাসছিস যে?'

'মোজা পরে তো বেশ সেজেছেন।' বললে হুটকো গোপাল, 'এদিকে পরনের কাপড়খানার যে ঠিক নেই।'

ঠাকুরের কাপড়খানা এলোমেলো হয়ে ছিল। তিনি নির্লিপ্তের মতো বললেন, 'তাই তো রে, ঠিক বলেছিস তো।'

কাপড়খানা ঠিকঠাক পরিয়ে দিলে গোপাল। একেবারে শিশু। সদানন্দ সর্বানন্দ শিশুর মতই হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

কামারপুকুরে একদিন রঘুবীরের ভোগ হয়ে গেলে ঠাকুরকে ডাকতে গেলেন মা। দেখলেন ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন। মা একবার ভাবলেন ভাঙাবেন না ঘুম; আবার ভাবলেন ঘুম না ভাঙালে খেতে যে দেরি হয়ে যাবে। ভাবতে না ভাবতেই ঠাকুরের ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, 'জানো গা, এক দূর দেশে গিয়েছিলাম। সেখানকার লোক সব শাদা-শাদা। তারা পরে আসবে। কিন্তু আমার দেখা তারা পাবে না।'

তাদের অগ্রদূতী নিবেদিতা। মাকে একটি জার্মান সিলভারের কৌটো দিয়েছে, তাতে মা ঠাকুরের কেশ রেখেছেন। বলেন, 'নিত্য পূজার সময় যখন এই কৌটোটির দিকে তাকাই নিবেদিতাকে মনে পড়ে। নিবেদিতা আমায় বলেছিল, মা, আমরা আর জন্মে হিন্দু ছিলুম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি।'

কোয়ালপাড়াতে খুব জ্বরে ভুগছেন শ্রীমা। বেহুঁশ হয়ে বিছানাতেই অসামাল হয়ে পড়ছেন। হুঁশ হয়ে যখনই ঠাকুরকে স্মরণ করছেন তখনই দর্শন পাচ্ছেন।

সেই হৃষীকেশ থেকে এক সাধু লিখেছে মাকে, মা তুমি বলেছিলে, সময়ে ঠাকুরের দর্শন পাবে, কই তা হল?

চিঠি পেয়ে মা বললেন, 'ওকে লিখে দাও তুমি হৃষীকেশে গিয়েছ বলে ঠাকুর তোমার জন্যে সেখানে এগিয়ে থাকেননি। সাধু হয়েছে ভগবানকে ডাকবে না তো কি করবে? তিনি যখন ইচ্ছা দেখা দেবেন।'

'আপনাকে দর্শন করেছে অথচ আপনার উপর বিশ্বাস-ভক্তি নেই তাদের কি কিছুই হবে না?' একজন জিগগেস করল ঠাকুরকে।
ঠাকুর বললেন, 'ওরে নাই বা মানলেক, দর্শনের ফল যাবে কোথায়? পরের জন্মে তাদের সাধন-ভজনে মতিগতি হবে।'
কেউ-কেউ বা অশরীরী অবস্থাতেও উদ্ধার পায়।
গোপালের মা'র বাড়িতে ঠাকুর আর রাখাল গেছেন মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণে। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়ির নিচের ঘরটিতে থাকে গোপালের মা। কি রাশীকৃত রান্নার আয়োজন করেছে কে জানে, তার রান্না তখনো শেষ হয়নি। উপরের ঘরটি খুলে দিয়ে অতিথিদের বিশ্রাম করতে বললে।
ঠাকুরের পাশে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে রাখাল চোখ বুজে শুয়ে রইল। খানিক পরে শুনতে পেল কে যেন ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইছে। বলছে, 'আপনি এখানে আসাতে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাইরে এই দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে আমাদের।'
ঠাকুর বললেন, 'তোমরা কারা?'
'আমরা প্রেতাত্মা। পাশের চটকলে কাজ করতুম, অপঘাতে প্রাণ গিয়েছে। সদ্গতি হয়নি এখনো। এই বাগানে ঘুরে বেড়াই আর এই খালিঘরে থাকি।'
'আহা, তোমাদের এত কষ্ট; এখুনি চলে যাচ্ছি আমি।'
ঠাকুর উঠে পড়লেন।
রাখাল চোখ চেয়ে দেখল পাশে ঠাকুর নেই। ছুটে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে ধরল। এ কি, নেমে যাচ্ছেন কেন? কার সঙ্গে কথা কইছিলেন এতক্ষণ?
'ওরে, এই ঘরটাতে ভূত থাকে। তারা বলছিল তাদের কষ্ট হচ্ছে বাইরে থাকতে। তাই নেমে যাচ্ছি। খবরদার এ কথা যেন বলিসনি বামনিকে।'
'আপনাকে দেখেও কি ওদের উদ্ধার হবে না?'
'হবে। এখানকার টান চলে গেলেই উঠে যাবে উপরে।'
এখানকার টান কি যে-সে টান। ঠাকুর ছড়া কাটলেন :

রানী টানেন কোল পানে
রাখাল টানে বন পানে
রাই টানেন চোখের টানে
বল শ্যাম দাঁড়াই কোথা—

'সংসারে থাকো কিন্তু আসক্তির গোড়া কেটে।' বললেন ঠাকুর, 'আসক্তি পুষে রাখলে এগুবি কি করে? নোঙর না তুলে দাঁড় টেনে গেলে নৌকো এক হাতও এগোয় না।'
'তবে কি সংসারে থেকে দয়া-মায়া স্নেহ-ভালোবাসা তুলে নেব?'
'তোমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে এ কে বলছে? সংসারের সবাইকে আপনার জন মনে না করে ভগবদ্‌জন বলে ভাবতে শেখ। তারই জন্যে মনের জঞ্জাল আগে সাফ করো।

মনের জঞ্জাল ঘুচলেই চোখের দৃষ্টি ফুটবে। তখন দেখতে পাবে এ সংসারও তাঁরই রচনা। যার যা পেটে সয় তার জন্যে তেমন খাবারের ব্যবস্থা।'

যেখানে থাকো না কেন স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরেই। তুমি ছাড়া কেউ তা তোমার হয়ে আবিষ্কার করতে পারবে না।

ঈশ্বরে যুক্ত হয়ে থাকো। সব সময়ে তাঁর কথা ভাবো। তাঁর নাম করো। পুণ্যতীর্থ, নদীতীর, গুহা, পর্বতশৃঙ্গ, তীর্থস্থান, নদীসঙ্গম, পবিত্র বন, নির্জন উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, দেবমন্দির, সমুদ্রতীর, নিজ গৃহ অথবা যে স্থানে মন প্রশস্ত হয় প্রসন্ন হয় সেখানেই নাম করো। অত বাছবিচারের বা দরকার কি। যখনই মনে পড়বে তখনই নাম করবে। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে খেতে-শুতে—যখন-তখন। নাম করতে-করতে মনের জঞ্জাল সাফ হবে। দেখা দেবে পবিত্রতা। পবিত্রতাই চির-তুষারমণ্ডিত কৈলাসধাম। নাম করতে-করতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। চিত্তকে একতান বা একাগ্র করার নামই যোগ। বুদ্ধির সমস্ত মুখ বেঁধে দিয়ে একটিমাত্র মুখ খুলে রাখার নাম যোগ। আর সব মুখ বেঁধে দিয়ে ঈশ্বরের মুখটি খুলে রাখো। দেখো কি রকম বেগ কি রকম শক্তি!

চিত্তে বাসনা থাকতে যোগ হবার সম্ভাবনা নেই। তোমার চিত্ত তোমারই অধীন হবে, তুমি চিত্তের অধীন হবে না এইটিই যোগের লক্ষণ। সবদিকে নিরুদ্ধ, শুধু এক দিকে একাগ্র। ঈশ্বরে তীব্রভাবনার নামই যোগ। সে অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত হও। প্রস্তুত হওয়া মানেই অধিকারী হওয়া।

নিশ্চিন্তপুরুষ হয়ে যাও।

বর্ষার রাত, অবিশ্রাম বৃষ্টি হচ্ছে, ঝড়ও চলেছে দুর্নিবার, এক গোয়ালার ঘরের দেয়ালের ধারে ছেঁচতলায় আশ্রয় নিয়েছেন বুদ্ধদেব। জানলা দিয়ে গোয়ালা দেখলে, গেরুয়া কাপড়। হেসে বললে, 'সন্ন্যাসী, ওখানেই থাকো, ঐ তোমার ঠিক জায়গা।' তারপরে গান ধরল গোয়ালা, 'আমার গরু-বাছুর ঘরে আনা হয়েছে, সুন্দর আগুন জ্বলছে, আমার স্ত্রী নিরাপদে আছে, শিশুরা শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, হে মেঘ, তুমি আজ যত খুশি বর্ষাও সারা রাত।' বাইরে থেকে বুদ্ধদেব বললেন, 'আমার চিত্ত সংযত হয়েছে, আমার ইন্দ্রিয়সকল কুড়িয়ে এনেছি, হৃদয় আমার দৃঢ়, হে সংসার-মেঘ, যত পারো বর্ষণ করো সারা জীবন।'

এই হচ্ছে নিশ্চিন্তপুরুষ।

একটি আসনে বসো ও ধ্যান করো।

যে অবস্থায় সুখে অজস্র ব্রহ্মচিন্তা হয় তাই আসন। এ ছাড়া অন্য আসন সুখাসন নয়, সুখনাশন। শুধু স্তব্ধতাই মৌন নয়। বাক্য ও মন যাকে না পেয়ে নিবর্তিত হয় তাই মৌন। সমরস ব্রহ্মে লীন হওয়াই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমতা। নইলে শুধু শারীরিক ঋজুতাই সমতা নয়। নাসাগ্রনিবদ্ধ দৃষ্টিই যোগদৃষ্টি নয়। জ্ঞানময় দৃষ্টিতে সকলই ব্রহ্মময় দেখাই যোগদৃষ্টি। ব্রহ্মই আমি, এই জ্ঞানে যে নিরালম্বন স্থিতিলাভ হয় তাই ধ্যান। নির্বিকার ব্রহ্মরূপে অবস্থানে চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তিই সমাধি।

বিষয় আর কিছুই নয়, দুটি মাত্র অক্ষর : হ আর রি।
কি খুঁজছ? সুখ? হায়, হায়, সুখ কি খোঁজবার বস্তু?
এমন একটা জিনিস চাই যাকে ধরে বাঁচতে পারি। যে আমাকে অন্তহীন আশা দেবে অতলগভীর আশ্বাস দেবে, অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ দেবে। নিজের মধ্যে এত আমি অনিশ্চিত, সে আমাকে অকম্পিত নিশ্চয়তা দেবে। কে সে? ঐ দুটি মাত্র অক্ষর।
রাখাল ঠাকুরকে বললে, 'মাকে বলুন, যাতে শরীরটা আর কিছুদিন থাকে।'
নরেনেরও সেই কথা : 'আপনি ইচ্ছে করলেই মা'র ইচ্ছে হবে।'
'না রে না, এখন আর মাকে বলে কিছু হবে না।' বললেন ঠাকুর, 'এখন আর মা'র আর আমার ইচ্ছার মধ্যে ভেদ খুঁজে পাচ্ছি না।' পরে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এর মধ্যে দুটো। একটা মা—পূর্ণ ও আর একটা ছেলে—অবতীর্ণ। ছেলেরই হাত ভেঙেছিল, ছেলেরই এখন অসুখ। পূর্ণই অবতীর্ণ হয়, মানুষ হয়ে ভক্তসঙ্গে আসে, তার সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তরাও চলে যায়। বাউলের দল এল, নাচল, চলে গেল, কেউ চিনলে কেউ চিনলে না। জীবের জন্যেই এই শরীরধারণ, আর শরীর থাকলেই কষ্ট।'
ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে। জিগগেস করলেন, 'আমাকে কি বলে বোধ হয়?'
নরেন বললে, 'আপনি সত্যদর্শী সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনিই স্বয়ং শ্রীমতী রাধারানী।'
ঠাকুর নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন, 'দেখছি যা কিছু আছে, সব এখান থেকেই।'
তুমিই সব। তুমিই সমস্ত ঘর-ঘোরা পরিপক্ক ঘুঁটি। তুমি সব ঘরে সব ঘাটে সব পথে সব স্তরে। সব দৃষ্টিকোণে। তুমি আস্তিকের অস্তি, নাস্তিকের নাস্তি, শূন্য-বাদীর শূন্য, অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত। তুমি অভেদবাদীর এক, প্রভেদবাদীর বহু, দ্বৈতবাদীর দুই।
তুমি কি নও? তুমি সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, সংসারী, ব্রহ্মচারী। তুমি কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত।
তুমিই আমার একমাত্র।
সার তুমি বস্তু তুমি প্রয়োজন তুমি। তুমিই আমার ঘর-বাড়ি মাঠ-আকাশ সাগর-পর্বত। আমার সমস্ত ভালোবাসা স্তবস্তুতি কথনকীর্তন—সব তোমার। তুমি দুর্বলের বল, দুঃখীর দরদী, দরিদ্রের ধনরত্ন। তুমি নিরাকুল শান্তি, নিরাময় ক্ষমা, নিরঞ্জনা সান্ত্বনা।
তুমি মধুর, সর্বতোমধুর।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাতিপতেরখিলং মধুরং॥

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরো
পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥

॥ সমাপ্ত ॥